একবিংশ বর্ষ। আশ্বিন, ১৩২৪। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল।

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী]

আলোচনা-কার্য্যালয়,
১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১৷৹ টাকা।

হাওড়া, ৪ নং তেলকল ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগল কৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আম্মাদের বিলাসিতা।

দিন দিন আমাদের জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, তথাপি আমাদের বিলাসিতা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। আমরা যে বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি! বাহ্য চাকচিক্য যে আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতীচ্যের 'ফ্যাসান' মোহে অন্ধ হইয়া আমরা প্রাচ্যের যা' কিছু সবই বর্ব্বরোচিত মনে করিতেছি। হায়! জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা কে আমাদের এই মোহান্ধকার ঘুচাইবে?

কোন্ বিষয়ে না আমরা বিলাসী হইয়াছি? কি আহার-বিহার, কি পোষাক-পরিচ্ছদ, কি পূজা-পার্ব্বণ, কি লোকলৌকিকতা, সকল বিষয়েই আমরা অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। মিহি কাপড় না হইলে আমাদের (কি স্ত্রী, কি পুরুষ) লজ্জা নিবারণ হয় না! আমরা মুখেই কেবল বলিতে শিখিয়াছি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!" কার্য্যতঃ, নিজের বেলায় একথার বিপরীত আচরণই করিয়া থাকি। আমরা সকল বিষয়েই পরস্মৈপদী। আমাদের motto—'আমরা যা' বলি তাই কর, আমরা যা' করি, তা' করিও না।' আমরা মুখে খুব দড়। বক্তৃতা দিবার সময় অপরকে বলি, 'দেশী কাপড় পর, বিদেশী বস্ত্র খরিদ করিও না, করিলে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠাগুলি টিকিবে কি করিয়া, ইত্যাদি আরও কত কি বলিয়া থাকি। কিন্তু সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে আমরা বিদেশী বস্ত্র কিনিতে ছাড়ি না! অধুনা এ দেশের নানাস্থানে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পাবনার উইভিং স্কুলে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জামার ছিট, গামছা ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে তাহার মূল্যও সুলভ। কিন্তু দেশের লোক তাহার যথোচিত আদর করিতেছে কি? সেগুলি নাকি এত কর্কশ যে তাহাতে আমাদের কোমল অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়! তাই আমরা তাহা পরিহার পূর্ব্বক বৈদেশিক স্ত্রী-জনোচিত পাত্‌লা ফিন্ ফিনে, কাপড়ের জামা পরিয়া দেহ আচ্ছাদন করি। সেদিন একজন বাঙ্গালী বাবুর গায়ে একটী পঞ্জাবি দেখিলাম উহার পৃষ্ঠদেশে বড় অক্ষরে লেখা আছে 'Manufactured in U. S. of America.' জামাটি এত পাতলা যে দূর হইতে বোধ হইতেছিল বাবুটী নগ্নগাত্র। নিকটে আসিলে ভ্রম দূর হইল। দেশীয় গামছাগুলির 'ছিলা' অনেকস্থলে তেমন 'ফ্যাসান'-যুক্ত নয়,

এই কারণে আমরা তৎপরিবর্ত্তে বিদেশী 'তোয়ালে' ব্যবহার করি। তবুও মুখে মুখে আমরা এক একজন মস্ত মস্ত 'স্বদেশভক্ত'।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের রকমারি পারিপাট্য ও বাহুল্য কত। সার্ট, কোট, ওয়েষ্ট কোট, গেঞ্জী, পঞ্জাব, একটু বেশী সভ্য হইলে হ্যাট, কোট, প্যাণ্টালুন, নেকটাই, চাই। এই সমস্ত জামাজোড়া যেমন-তেমন ভাবে তৈয়ার হইলে চলিবে না। ছাঁট ভাল হওয়া চাই এবং ময়লা হইতে না হইতে সেগুলি রজকালয়ে প্রেরণ, অতঃপর তাহার চরণে তৈল-সেক! বিলাতী ডসন, জ্যাকসন বা অন্য কোন নামজাদা মুচীর জুতা না হইলে আমাদের শ্রীচরণযুগলের অবমাননা হয়। দেশের মথুর, সুজন, গোবর্দ্ধন মুচীর ভাত নাই। (যদিও তাহারা উৎকৃষ্ট মজবুত জুতা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে) কারণ তাহারা তাহাদের প্রস্তুত জুতার অঙ্গে সোণালী কালীতে ছাপা বিজ্ঞাপন আঁটিয়া 'First quality' ইত্যাদি ছাপ মারিয়া কাগজের বাক্সে পুরিয়া, আলমারিতে রাখিয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক মাসিকপত্রাদিতে প্রাণ মন-হরণ-কারী ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে জানে না। আমরা চাকচিক্য ও 'ফ্যাসানের' এমনই দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন জিনিষের স্থায়িত্বের দিকে দৃক্‌পাত করি না। জিনিষটী চক্‌ চকে, ঝক্‌ ঝকে হইলেই হইল। আর কিছু দেখিবার যেন দরকার নাই। আমরা এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন জিনিষই আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যশোহরে অতি উৎকৃষ্ট অথচ মজবুত চিরুণী তৈযারি হইতেছে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ফেলিয়া দেশবাসী বৈদেশিক চিরুণী কিনিতে তৎপর। কারণ কি জানেন? ঐ 'ফ্যাসান।' যশোরে চিরুণী চারি বৎসর ব্যবহারে দেখা গিয়াছে—উহার একটী 'খিল'ও নষ্ট হয় না। কিন্তু জার্ম্মেণী ও জাপানী চিরুণী উহার তুলনায় কিছুই নয়, ছ'মাসেই নষ্ট হইয়া যায়, অথচ দাম দ্বিগুণ, ত্রিগুণ। মহিষ-শিঙ্গের একখানা দেশী খোঁপার চিরুণী এখনো দশ পয়সায় পাওয়া যায়; উহা খুব মজবুতও বটে। জার্ম্মনীর প্রস্তুত উক্ত চিরুণীর মূল্য এখন পাঁচ আনা। আমাদের মেয়েরা একটু 'ফ্যাসানের' লোভে ঘরের মজবুত সুলভ জিনিষ ফেলিয়া শেষোক্ত প্রকারের চিরুণীই ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশীয় চিরুণীগুলি অপেক্ষাকৃত কম মসৃণ ও চাকচিক্যবিহীন; তাই আধুনিক রুচিবিকার-গ্রস্তা বঙ্গরমণীদের পছন্দ হয় না। পছন্দ না হইবার আর একটী গৌণ কারণ তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন;—দেশীয় চিরুণীর উপর 'পতি পরম গুরু' এই কথাটী লেখা থাকে না। এটা একটা অছিলা মাত্র বলিয়া মনে হয়। আসল কারণ ঐ মসৃণতার অভাব। মেয়েদের স্থায়িত্বের দিকে মোটেই নজর নাই। যাহা হউক, দেশীয় চিরুণী নির্ম্মাতা-গণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখন হইতে তাঁহারা যেন মেয়েদের চিরুণীর উপর 'পতি পরম গুরু' এই কথাটী লিখিয়া দেন।

পূর্ব্বে যখন আমাদের জীবন সংগ্রাম এত কঠোর ভাব ধারণ করে নাই, তখন আমাদের দেশে রৌপ্যের গহনাই সমধিক প্রচলিত ছিল। তখন প্রধানতঃ রাজা-জমিদার-গৃহিণীরাই স্বর্ণালঙ্কার সমধিক ব্যবহার করিতেন। মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের বধূরা আজিকালিকার ন্যায় এত সোণা দানা পরিতে পাইতেন না। সে কালে এক-পুরুষে গহনা প্রস্তুত করাইলে সাত-পুরুষে ব্যবহার করিত। এখন আর সে দিন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্য, পরিধেয় ও অপরাপর আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের বঙ্গরমণীদের বিলাসের মাত্রা কমিবে, না দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহিণীদের অসঙ্গত অলঙ্কার-প্রিয়তার কথা লিখিতে লজ্জা হয়। সর্ব্বদা স্বীয় স্বীয় বরাঙ্গ স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার একটা প্রবল প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। স্বামীর আয-ব্যয়ের দিকে ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। স্বামী জীবন-সংগ্রামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কোথা হইতে ললনাগণের বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করিবেন, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা চিন্তা করা প্রয়োজন বোধ করেন না। গহনা দিতেই হইবে, নহিলে অন্ন-জল বন্ধ। মধ্যবিত্ত 'পতিদেবতাকে' এ আব্দার রক্ষার জন্য ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হয় না কি?

কষ্টে-সৃষ্টে একবার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াই হতভাগ্য স্বামিগণের নিস্তার নাই। সম্প্রতি আবার এক নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। নিত্য নূতন ধরণ বা 'ফ্যাসান' বাহির হইতেছে, কাল স্যাকরার দোকান হইতে যে 'নূতন ফ্যাসানের' গহনা প্রস্তুত করান হইয়াছে, আজ তাহা 'পুরাতন ফ্যাসান' হইয়া গিয়াছে। আজ পুনরায় সে সকল গহনা ভাঙ্গিয়া 'নূতন ফ্যাসান' অনুযায়ী অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত স্যাকরার বাড়ী দৌড়াইতে হইবে। নতুবা পরিত্রাণ নাই। কলিকাতা এই 'ফ্যাসানের' রাজধানী। মফঃস্বলের অধি-বাসিগণ লাভ-ক্ষতি বিচার না করিয়া কলি-কাতার অন্ধ অনুকরণে দিন দিন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে এবং অপর দশজন নিরীহ গরীব বেচারাকে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পথ প্রদর্শন করি-তেছে। আর ফ্যাসানের এমনতর বাড়াবাড়ি বা দৌরাত্ম্যের জ্বালায় গরীবের পক্ষে 'মনোদুঃখে বন গমন ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ৮০০।১০০০৲ টাকার স্বর্ণালঙ্কার যৌতুক স্বরূপ দিতে না পারিলে এ উৎকট সভ্যতার যুগে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পান না। নিম্নশ্রেণীর নিতান্ত দরিদ্রের পক্ষে অন্ততঃ কুড়ি ভরি সোণার গহনা ব্যতীত একটী কন্যা 'পার' করা দুষ্কর। এখন সহরের পান-বিড়িওয়ালীর কাণেও সোণার দুল, গলায় নেক্‌লেস, হাতে অনন্ত ও বালা, সোণার চুড়ী ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। আরও মজার কথা, এক শ্রেণীর ধনি-নন্দনগণের মধ্যে এই রমণীসুলভ স্বর্ণা-ভরণ ব্যবহারের প্রবৃত্তি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

শ্রীরাধাচরণ দাস।

চিন্তা।

হে চিন্তা! হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
দেবী তুমি, পুনঃ কিন্তু তুমিই দানবী॥
তুমিই নন্দন-বন,
তুমি প্রেম-প্রস্রবণ,
তুমিই মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী।
আবার তুমিই সেই অশান্তিরূপিনী॥
তুমি স্বরগের রথ,
তুমিই মুক্তির পথ,
তুমি হৃদি-মরুভূমে শান্তি-প্রস্রবণ।
আবার তুমিই সেই অশান্তি-অনল॥
তুমি ভয়ঙ্করী 'চিন্তা',
তব কাছে তুচ্ছ চিতা,
পলে পলে দহে নাক তোমার মতন।
ভস্ম করে মুহূর্ত্তেকে চিতার অনল॥
তুমি শান্তিময়ী দেবী,
'চিন্তা', কে বলে দানবী?
সত্য, তুমি পাপ-চিত্তে অশান্তিরূপিণী।
কিন্তু, সাধু-চিত্তে দেবী, শান্তি-প্রদায়িনী॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কাব্যনিধি।

কুটিল সরল।

(সংস্কৃত হইতে)

কুটিল সরলে জমাটি পিরীতি
বাঁধে কভু ভাই কি রে!
যুগল মিলন রয় কি কখনো
বাঁকা ধনুকে ও তীরে?

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

আহেরিয়া।

আহেরিয়াগণ শিকারী ও তস্কর। মধ্য-দোয়াবে ইহাদিগের বাসস্থান। সার, এইচ, এম, ইল্লিয়ট (Sir H. M. Elliot) বলেন যে, ইহারা ধানুক জাতির এক শাখা মাত্র। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহারা ধানুকদিগের ন্যায় মৃত জীবদেহ ভক্ষণ করে না। গোরক্ষপুরে আহেরিয়া নামে এক জাতি বাস করে; তাহারা কহে যে, তাহারা ধানুকবংশীয়। পঞ্জাবের আহেরী জাতি অনেকটা আহেরিয়া জাতির ন্যায়। তাহারা কহে যে, তাহাদিগের আদি বাসস্থান রাজপুতনা। যোধপুর ও বিকানীর মরুস্থলে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিত। ইহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। যে কোন গ্রামে কার্য্য পাইতে পারে—এইরূপ স্থানে বাস করে না। ইহারা সকল প্রকার বন্য পশু ধৃত ও ভক্ষণ করে। নল্‌খাগড়া ও ঘাসের দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। কেহ কেহ শস্য-ক্ষেত্রে কার্য্য করে এবং ফসল কাটিবার সময়ে কার্য্য করিবার জন্য অনেকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে কাষ্ঠ ছেদন, ঘাস বিক্রয়, রাস্তা বাঁধার কার্য্য ও মাটী কাটার কার্য্য করিয়া থাকে। মিষ্টার ফেগান (Mr. Fagan) বলেন যে, হিসার জেলায় ইহারা ঝুড়ি ও কুলা প্রস্তুত ও পসমের কার্য্য করে। ফেগান সাহেবের মতে, যোধপুরীয়াগণ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি; সম্ভবতঃ ইহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল। অন্ত

আহেরিয়াগণ নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যোধপুরীয়াগণের সহিত ইহাদিগের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আহেরিয়াগণ ভীল বা আহেলিয়া হইবে। আহেলিয়াগণও শিকারী এবং পক্ষী ধৃত করিয়া থাকে।

আলিগড়ের আহেরিয়াগণ কহে যে, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প হওয়ায় তাহারা অন্য জাতীয় স্ত্রীলোক আনয়নপূর্ব্বক আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা এই প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছে। ক্রুক সাহেব (Mr W. Crooke B. A. BSc) বলেন যে,ইহা হইতে এইরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদিগের মধ্যে শিশু-কন্যা হত্যা প্রচলিত ছিল। (১) ইহাদিগের প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত, দুস্থ ও অসন্তুষ্ট। আলিগড়ে ইহাদিগের নাম আহেরিয়া, ভীল ও বাধরোল। আহেরিয়াগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার অবতারণা করেঃ—

"রাজা প্রিয়ব্রত ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। সূর্য্য-কিরণে কেবল পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আলোকিত হয় বলিয়া রাজা প্রিয়ব্রত অসন্তুষ্ট হন এবং স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। নিশাকে দিবায় পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন কিন্তু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আপন অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। তাঁহার রথচক্রের চিহ্ন হইতে সপ্ত সাগর ও সপ্ত মহাদেশ উৎপন্ন হইয়াছে। (২)

ঐ সৌর বীরের পুত্র (নাম অজ্ঞাত) মৃগয়ার নিমিত্ত চিত্রকূট (বান্দা জেলায়) পর্ব্বতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। এই হেতু তিনি 'আহেরিয়া' বা শিকারী নাম প্রাপ্ত হন। এই মৃগয়া ব্যসনাসক্ত বীর পুরুষ আহেরিয়াগণের পূর্ব্ব পুরুষ। আহেরিয়াগণ চিত্রকূট হইতে অযোধ্যায় আগমন করে। অযোধ্যার অবনতি হইলে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রায় সাত শত বৎসর গত হইল আহেরিয়াগণ কাণপুর হইতে আলিগড আইসে। এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রবাদে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সময় সময় চিত্রকূট ও অযোধ্যায় তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে।

পঞ্চায়েৎ।—নির্ব্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তিবর্গ লইয়া ইহাদিগের পঞ্চায়েৎ বা জাতীয় সভা। পঞ্চায়েৎ জাতীয় সকল বিষয়ের মীমাংসা করে। পঞ্চায়েতের প্রধানপদ ব্যক্তিগত নহে—বংশগত। যদি কর্ত্তার (মীর পঞ্চ) মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র নাবালক থাকে, তাহা হইলে যতদিন সে নাবালক না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি নাবালকের প্রতি-

(১) The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh Vol. I.

(২) তিনি অন্ধকার নষ্ট করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন; তিনি বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংস্থান করিয়াছেন।

[শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।]

নিধি স্বরূপ 'শীর পঞ্চে'র কার্য্য করে। কর্ত্তার নাম 'সরপঞ্চ' (শীর পঞ্চ ?)। যদি নূতন 'সরপঞ্চ' অকর্ম্মণ্য হয় তবে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার পদে অপর একজন 'সরপঞ্চ' নিযুক্ত করে। 'সরপঞ্চ' পদের জন্য অনেকে উমেদার হয় বটে কিন্তু যাহার পক্ষে অধিক লোকের মত থাকে সেই 'সরপঞ্চ' মনোনীত হয়।

বিবাহ।—যে পরিবার হইতে একবার কোন বধূ আসিয়াছে, সে পরিবারে বিবাহ করিবে না। তবে যদি এই ঘটনা স্মরণাতীত হয়, তবে বিবাহ হইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে বিবাহ বন্ধ হয় না, তবে মুসলমান বা খৃষ্টান না হইলেই হইল। এক এক জনের চারি পত্নী পর্য্যন্ত দেখা যায়। এক সঙ্গে দুই ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে। বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহের পর বর-কন্যাকে পুষ্করিণী-তীরে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় বধূ, বরকে বাবলার কোমল পল্লব দ্বারা আঘাত করে। তৎপরে বর ও বধূ গৃহে আগমন করে। বরের আত্মীয় স্বজনেরা বধূকে উপহার প্রদান করে; ইহার নাম 'মুখ দেখাই'। প্রথমা পত্নী গৃহকর্ত্রী ও অপর পত্নীগণ কর্ত্রীর আদেশানুবর্ত্তিনী। সকল পত্নীর মধ্যে বেশ সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সপত্নীর প্রতি দ্বেষ বা ঈর্ষার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। কদাচ পত্নীগণের স্বতন্ত্র গৃহ থাকে। বিবাহের বয়স ৭ হইতে ২০ বৎসর। বর বা কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণের ইচ্ছানুসারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু পঞ্চায়েতের সম্মতি চাই। ব্রাহ্মণ ও নাপিতের সহায়তায় আত্মীয় দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। বর-কন্যা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে উভয়ের অভিপ্রায় বিবেচিত হইয়া থাকে কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাত্র বা পাত্রীসম্বন্ধে তাহাদিগের অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়া থাকে। বিবাহে রীতিমত কন্যাপণ নাই। কন্যার পিতা অক্ষম হইলে বরের আত্মীয়গণ কন্যাকর্ত্তাকে বিবাহ-ভোজে সাহায্য করিয়া থাকে। অন্যথা কন্যার পিতা বিবাহে বরকে যৌতুক প্রদান করে। ইহার নাম 'জাহেজ'। এই যৌতুকের অধিকারী সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই; তবে 'মুখদেখাই' বধূর নিজস্ব। বিবাহের পর বুদ্ধিহীনতা, অক্ষমতা ও কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পাইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার বেশ কারণ উপস্থিত হয়, নতুবা শারীরিক কোন দোষ (অঙ্গহীনতা) বিবাহের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও সম্বন্ধ ভঙ্গ হয় না। পঞ্চায়তের নিকট রমণীর ব্যভিচার-দোষ প্রমাণিত হইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী 'করাত' প্রথায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম আছে বটে কিন্তু একবার পরিত্যক্তা নারী কদাচ জাতি-মধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সক্ষম হয়। যে শিশুর পিতা কিম্বা মাতা অন্য জাতীয়, তাহাকে 'লেণ্ডু' কহে। এই শিশু জাতীয় শিশুর ন্যায় সমাজে কোন অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

বিধবা-বিবাহ।—কোন ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এক সুট বস্ত্র, এক সেট চুড়ী ও এক

জোড়া আঙ্গুঠা (বিছুয়া) প্রদান করিবে। পঞ্চায়েৎ বিধবাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এ বিবাহে তাহার সম্মতি আছে কিনা? বিধবা আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ব্রাহ্মণ শুভদিন দেখিয়া দেন এবং নব-পতি বিধবাকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া আপন গৃহে লইয়া যায়। পরে জ্ঞাতিগণকে একটি 'ভোজ' দেয়। এই প্রকার বিবাহের নাম 'করাত' বা 'ধরেজা'। এই বিবাহে শোভাযাত্রা (বরাত) বা অগ্নি প্রদক্ষিণ (ভঁওরা) নাই। যদি স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দেবর) অবিবাহিত থাকে ও বিবাহোপলক্ষে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করে অন্যথা বিধবা পুরুষান্তরের সহিত বিবাহিত হয়। বিধবা অপর পুরুষকে বিবাহ করিলে মৃত স্বামীর বিষয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণের অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত হয়।

জন্ম।—গর্ভ হইয়াছে জানিতে পারিলে জাতীয় লোকসকল একত্রিত হয়। গুড়ের সহিত গম ও ছোলা পাক করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। গর্ভিনী পদদ্বয় গঙ্গার অভিমুখে রাখিয়া প্রসব করে। মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ধাত্রী নিযুক্তা হয়। প্রসবের পর নাপিতপত্নী প্রসূতির সেবা করে। সন্তান প্রসূত হইলে বন্ধুগণের মধ্যে গুড় বিতরিত হয়। রমণীগণ থালা (থালি) বাজাইয়া গান করে। ছয় দিনে ষষ্ঠীর (ছঠী) পূজা হয় এবং অগ্নিতে ধূনা ও ২।১ টুকরা রুটী নিক্ষেপ করিয়া 'ছঠীর' সম্মান রক্ষা করে। দ্বাদশ দিনে মাতা স্নান করে। ব্রাহ্মণ অঙ্গনে আটা (গোধূম চূর্ণ) চতুষ্কোণাকৃতি (চৌক) স্থান অঙ্কিত করেন, প্রসূতি তাহার উপর উপবেশন করে। তৎপরে ব্রাহ্মণ সন্তানের 'নামকরণ' করেন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ জল-সিঞ্চন করিয়া অশৌচান্ত করেন। জাতীয় ভোজ হয়; নারীগণ নৃত্য করে এবং গান গায়। ইহার নাম 'দস্তাউন'। যদি শিশু মূলা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে 'দস্তাউন' ১৯ কিম্বা ২১ দিনে সম্পন্ন হয়। ২১টী গাছের পাতা (আম, জাম, নেবু, নিম ইত্যাদি) সংগ্রহ করিয়া ২১ কূপ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক এবং ২১ খানি গ্রাম হইতে চূণা পাথর (ঘুটিম) লইয়া আনিয়া একটি জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলস পূর্ণ করে; সেই কলসস্থ জলে মাতা স্নান করে। শস্য ও দক্ষিণা ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। যদি যমজ সন্তান জন্মে, তাহা হইলে 'দস্তাউন' দিনে পিতা ও মাতা উভয়কেই পূর্ব্বোক্ত 'চৌকে' বসাইয়া ব্রাহ্মণ সূত্র দ্বারা উভয়ের হস্তে রক্ষাবন্ধন (রাখী) করিয়া দেন; ইহাদ্বারা দুর্ভাগ্য নিবারিত হয়।

দত্তকপুত্র-গ্রহণ।—পণ্ডিত ভাল দিন দেখিয়া দিলে পুত্রের জনক দত্তক-গ্রহীতাকে পুত্র প্রদান করে। দত্তক-গ্রাহক বালককে নব-বস্ত্র পরিধান করাইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দেয়। তৎপরে জাতীয় ভোজ হয়। নিয়মানুসারে বালকের বয়স দশ বৎসরের অনধিক হইবে।

বিবাহ-সংস্কার।—বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে নরসুন্দর পাত্রীর আলয় হইতে পান

আনয়নপূর্ব্বক পাত্রকে খাইতে দেয়; পাত্র পান খাইলে সম্বন্ধ দৃঢ় (পাকা) হইল বুঝিতে হইবে। তৎপরে লগ্ন—পাত্রার পিতা কিছু নগদ টাকা, কাপড়, একটি নারিকেল, মিষ্টান্ন ও বিবাহের দিন স্থির করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করে; পত্রমধ্যে কিছু 'দুব' (দূর্ব্বা) থাকে। পাত্র অঙ্গনস্থ পবিত্র চৌকে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য পাত্রকে প্রদান করেন; এদিকে রমণীগণ ঢোলক বাজাইয়া গীত গাহিতে আরম্ভ করে। গীত ও বাদ্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হয়। ইহার নাম 'রাত জাগ্‌না'। পরে 'উব্‌টান' অর্থাৎ পাত্র ও পাত্রীকে হরিদ্রা মাখান হইয়া থাকে। এই সময়, পাছে 'নজর' লাগে বা উপদেবতার দৃষ্টি সঞ্চার হয়, এই জন্য পাত্র ও পাত্রীকে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিতে দেওয়া হয় না। লগনের (লগ্নের') দিন ধার্য্য হইলে পাত্রীর কোন আত্মীয় অথবা পুরোহিত অঙ্গনের মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া তাহাতে আমের পাতা, হলুদ ও দুইটি পয়সা বাঁধিয়া দেয়। পুরোহিতকে টাকা, কাপড় ও কিছু আমান্ন প্রদত্ত হয়। ইহার নাম 'নেগ'। তৎপরে 'মারহোয়া' অর্থাৎ আত্মীয় ও স্বজনদিগকে খাদ্য প্রদান; এই খাদ্য ঘৃতসংস্পর্শশূন্য। বরের পোষাক হরিদ্রা রঙ্গের অঙ্গরক্ষা ও মস্তকে মুকুট (মউর)। এই মুকুট বা 'মউর' খেজুর পাতায় নির্ম্মিত। বরযাত্রগণ বর লইয়া পাত্রীর গ্রামে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে আবাহন করিয়া একখানি খড়ের ঘরে বসিতে দেওয়া হয়। এই ঘরের নাম 'জনবাস'। এই প্রদেশের সকল গ্রামেই এইরূপ এক এক খানি গৃহ থাকে। গ্রামের যে কোন লোকের বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে বা 'গাওনা' উপলক্ষে বর আসিলে এই গৃহেই প্রথমে অভ্যর্থিত হয়। বরকর্ত্তা কোন আত্মীয়ের দ্বারা (মান) কন্যার নিকট সরবৎ প্রেরণ করে এবং তৎপরিবর্ত্তে পাত্রার বাটী হইতে খাদ্য সামগ্রী আসিয়া থাকে। এই প্রথার নাম 'রারৌনিয়া'। তৎপরে বর বধূর বাটীতে আগমন করিলে বর-বধূ উভয়ে মিলিত হইয়া সাতবার অঙ্গনস্থ পবিত্র অগ্নি প্রদক্ষিণ করে। অনন্তর কন্যাদান। বর ও বধূকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক উভয়কে এক সঙ্গে ভাত ও মিষ্টান্ন খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ একত্র ভোজনের নাম 'সহকউর'। একখানি খিনামা বস্ত্রাবৃত করিয়া রক্ষা করে এবং সমবেত রমণীগণ, স্থানীয় দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বরকে অনুরোধ করে; বর তাহাদের কথামত বস্ত্রাবৃত পাদুকাকে পূজা করিলে নারীগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে এবং অতিশয় অপ্রতিভ হয়। বর-কন্যা বস্ত্র-গ্রন্থী ও বরের শীরোভূষণ মোচন করিলে বর 'জনবাসে' প্রত্যাগমন করে। বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত হয় না; কেবল অঙ্গনে অগ্নি জ্বালিয়া বর-বধূকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে। কন্যাকে চুরি করিয়া বা প্রতারণা করিয়া অথবা প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া আসিয়া বিবাহ করার নাম 'দোলা' প্রথা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সঙ্গতিপন্ন লোকে মৃত-দেহ দাহ করে; দরিদ্রগণ হয় সমাহিত, নতুবা

নদী-স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। প্রেতাত্মা ফিরিয়া আসিবার ভয়ে শব প্রোথিত করিবার সময় শবের সম্মুখভাগ ভূমির উপর এবং পশ্চাদ্ভাগ উপরিভাগে রাখে। শবের পদদ্বয় উত্তর দিকে থাকে। কেহ কেহ অনাবৃত শব সমাহিত করিয়া থাকে। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই রীতি, কিন্তু অনেক শবের চিতাভস্ম চিতাতেই পড়িয়া থাকে। শবদাহের অগ্নি মেথরে লইয়া আইসে; তজ্জন্য মেথর শবদাহের বাঁশ ও কিছু পয়সা প্রাপ্ত হয়। সৎকার শেষ হইলে দাহকারিগণ স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে কুশ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে পথে শব বাহিত হইয়াছিল, সেই পথে নিক্ষেপ করে। তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড চিতাভিমুখে নিক্ষেপ করে। ইহার কারণ এই যে, মৃতের সহিত প্রণয় এই স্থানেই শেষ হইল ('ছুট যাওই')। তৃতীয় কিম্বা সপ্তম দিবসে মুখাগ্নিপ্রদানকারী ক্ষৌর-কর্ম্ম সমাধা করিয়া একটি বড় পিণ্ড (টিকিয়া) পলাশ (ঢাক) পত্রে স্থাপন করিয়া প্রেতাত্মার আহারের নিমিত্ত যবের ক্ষেত্রে রাখিয়া দেয়। ত্রয়োদশ দিনে জাতি-ভোজ হয়। ১৩টা সুপারী ও ১৩টা পয়সা ১৩টা পাত্রে রাখিয়া তৎসহ কিয়ৎপরিমাণে শস্য দিয়া ১৩ জন ব্রাহ্মণকে প্রদান করে। তৎপরে হোম হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত শ্রাদ্ধ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পিতৃপক্ষের পঞ্চদশ দিবস তর্পণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে প্রেতের আত্মা জ্ঞানে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে।

অশৌচ।—মৃতাশৌচ ১৩ দিন, জন্মাশৌচ ১০ দিন এবং রমণীগণ ঋতুমতী হইলে ৩ দিন অশৌচ হয়। পূর্ব্ব দুই অশৌচে রীতিমত শুদ্ধ হইতে হয়। রজঃস্বলাশৌচে বস্ত্রাদি ধৌত ও মস্তকের কেশ মার্জ্জিত করিয়া শুদ্ধ হয়।

ধর্ম্ম।—দেবী বিশেষ উপাস্য। মৈষাসুর (মহিষাসুর?) জাতীয় দেবতা। মৈষাসুর সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। মৈষাসুরের মন্দির আৎরৌলী তহশিলের গাঙ্গেরী গ্রামে আছে। বৈশাখ মাসের অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মিষ্টান্ন ও কখনও কখনও ছাগ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। একজন আহীর পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। জাহির পীর বিখ্যাত "গোগা"। পূজার দিন, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথি। পূজার উপকরণ—বস্ত্র, লবঙ্গ, ঘৃত ও কিঞ্চিৎ নগদ। এক জন মুসলমান খাদিম এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে। মুরদাবাদ জেলার আমরোহায় ফকির মিঞা সাহেবের পূজার জন্য পাঁচটি পয়সা, লবঙ্গ, ধুনা ও রুটি লইয়া গমন করে। মিঞা সাহেবের কবরস্থ ফকিরগণ (মুজাউইর) ঐ সকল পূজার উপহার গ্রহণ করে। ছাগ বলি দিয়া আপনারাই তাহার মাংস ভক্ষণ করে। ইহার নাম 'কন্দোরি'। যখিরার চতুষ্কোণ বেদী ইগ্‌লাম তহশিলের কারাস নামক গ্রামে এক মেথরের দ্বারদেশে অবস্থিত। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে পূজা প্রদত্ত হয়। এই পূজায় দুইটি পয়সা, কতকগুলি পান ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদান করে এবং মেথর এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে। কখনও

কখনও শূকর বলি দিয়া তাহার রক্ত লইয়া মেথর বালক বালিকাগণের ললাটে লাগাইয়া দেয়। ইহার দ্বারা সন্তান দুষ্ট প্রেতাত্মা হইতে নিরাপদ হয়। বারাই সাধারণ গ্রাম্য দেবতা। ইহার কোন মূর্ত্তি নাই; কেবল কয়েকখানা প্রস্তর গাছতলায় পড়িয়া আছে। ইহার পাণ্ডা ব্রাহ্মণ। পূজায় ছক্কা (ছয় কৌড়ি), কতকগুলি পান ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইলে পাণ্ডা গ্রহণ করে। এই দেবতা স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তানগণকে রক্ষা করেন। আশ্বিন ও চৈত্র মাসের শুক্ল সপ্তমীতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। "চামারে"র স্থান বৃক্ষমূলে। প্রতি মাসের প্রথম সোমবারে রুটি দিয়া পূজা করে। এবং বিপদে আপদে মেষবলি প্রদান করিয়া থাকে। পূজাদাতাগণ বলি প্রদত্ত মাংসে আপনাদিগের উদর পূর্ণ করে। পশুগণের মধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে কিংবা গাভী দুগ্ধ প্রদান না করিলে সেই স্থানের উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। মাতা (বসন্ত রোগের দেবী) ও মশানী (শ্মশান-দেবী) বৃক্ষমূলে কতকগুলি প্রস্তর সংগ্রহ মাত্র। বারাই দেবীর ন্যায় বালক বালিকার হিতের জন্য স্ত্রীলোকগণ ইহার পূজা প্রদান করে। একজন ব্রাহ্মণ পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বুঢা বাবার স্থান, খৈইর তহশিলের চন্দৌসি নামক স্থানে। বৈশাখ মাসের সিতপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে বস্ত্র, পান ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা প্রদান করে। এক জন ব্রাহ্মণ ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হন। শা জামাল পাঁচপীরের অন্যতম। আলিগড় সহরের নিকট ইহার স্থান। এই স্থানে প্রদত্ত দ্রব্যাদি এক জন মুসলমান ফকির লাভ করে।

বাল্মিকী।—আহেরিয়াগণ কহে যে, বাল্মিকী এক জন বিখ্যাত শিকারী ও দস্যু ছিলেন। তিনি অনেক জীব-হত্যা করিয়াছিলেন। একদা অরণ্যে নারদ মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বভাবানুসারে ধনুকে তীর যোজনা পূর্ব্বক ঋষির প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইলে, নারদ তাঁহাকে কহিলেন যে, তিনি কি জ্ঞাত আছেন যে, তিনি কি মহাপাপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যাহা হউক, তাঁহার প্রতি নারদ ঋষির দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাঁহাকে 'রামা, রামা' উচ্চারণ করিতে কহিলেন। তিনি বহুকাল 'রামা, রামা' উচ্চারণের পরিবর্ত্তে 'মারা, মারা' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নারদের কৃপায় ভক্তির উদয় হইলে কৃতকার্য্য হন। ইনি অবশেষে মহাজ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হন। এই বাল্মিকী আহেরিয়াগণের রক্ষাকর্ত্তা যোগী।

আহেরিয়াগণের আলয়ে একটী পৃথক গৃহে মৈষাসুরের পূজা হয়। এই পূজায় কেবল বিবাহিতা রমণীগণের অধিকার। কুমারী বা 'করাও' প্রথায় বিবাহিতা নারীগণ এই অধিকারে বঞ্চিতা। পরিবারস্থ লোকেই পূজা করে, পূজার জন্য পুরোহিত আহুত হন না।

মিঞা সাহেব ও যখিয়ার সম্মুখে বলির পশুর প্রাণ হনন করা হয় না, কেবলমাত্র পশুর কর্ণমাত্র কর্ত্তন করিয়া পশুকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্য দেবতার পূজায় পশু-বলি দিয়া

সেই পশু-মাংস আপনারাই ভক্ষণ করে। অন্যান্য পর্ব্ব হিন্দুদিগের ন্যায়। শকট চৌথ পর্ব্বে চাউল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা এক নরাকৃতি পুত্তলিকা প্রস্তুত করে এবং নিশাকালে সেই পুত্তলিকাকে কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করে। ক্রুক সাহেব বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, ইহারা পূর্ব্বে নববলি প্রদান করিত। (১) আহেরিয়াগণ অশ্বত্থ বৃক্ষকে ভক্তি করে ও আমলকী বৃক্ষকে পূজা করে। ফাল্গুন মাসের শুক্ল একাদশীতে আমলকী বৃক্ষের পূজা হয়; স্ত্রীলোকেরা দিবা দ্বিপ্রহরে আটখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুরী (আটার লুচী) ও একটু জল দিয়া বৃক্ষকে নমস্কার করে। নাগপঞ্চমীতে গৃহ-ভিত্তিতে সর্প অঙ্কিত করিয়া তদুপরি দুগ্ধ ঢালিয়া দেয় এবং পুরুষেরা জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া সর্প-বিবর অনুসন্ধান করে; দৃষ্টিপথে পতিত হইলে সেই বিবর মধ্যে দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়।

উল্কী।—ইহাদিগের সাধারণ উল্কীর নাম 'সীতা কি রশুই' (সীতাদেবীর রন্ধন গৃহ) অদ্যাবধি চিত্রকূট পর্ব্বতে এই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

শপথ।—গঙ্গার নামে শপথ করে। যদি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা অশ্বত্থ-পত্র হস্তে লইয়া শপথ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য অথবা কদাচ শপথের অন্যথা করিবে না।

(১) The Tribes and Castes N. W. P. & Oudh Vol I.

ইহারা অন্য জাতির সহিত পান ও ভোজন করে না। কচ্চি (দাল ভাত ও রুটী) আহারীয় দ্রব্য; বারহাই (সূত্রধর), জাঠ. কাহারের হস্তে খাইবে না; পাক্কী (লুচি, মিঠাই ইত্যাদি) নাই (নাপিত) প্রস্তুত করিয়া দিলে অনায়াসে ভক্ষণ করিবে কিন্তু সজাতীয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলে ভোজন করিবে না।

ইহারা মুষাহরদিগের ন্যায় 'পাতল' পলাশ-পাতা জুড়িয়া পদ্ম-পত্রের ন্যায় গোলাকৃতি করে ও ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে এবং পলাশ বৃক্ষের নির্য্যাস ও মধু সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করে। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান কার্য্য দস্যুবৃত্তি। দস্যুবৃত্তিতে ইহারা সবিশেষ পরিপক্ব।

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

ভবিতব্যের জয়।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

প্রভা হরিহর বাবুর বড় আদরের কন্যা। একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর অনেকদিন আর কোন সন্তানাদি না হইয়া প্রভার জন্ম হইল। পুত্রের জন্মের বহুদিন পরে কন্যামুখ দেখিয়া সপত্নী হরিহর বাবু বড়ই আনন্দিত হইলেন; কন্যা সুন্দরী হওয়ায় তিনি আদর করিয়া নাম রাখিলেন—"প্রভা।" কন্যাকে এত ভালবাসিবার আর একটি কারণ ছিল। হরিহর বাবু একটি সদাগরী আফিসে কুড়িটী টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু প্রভা ভূমিষ্ঠ হইবার পর

হইতে বেতন ক্রমাবয়ে বৃদ্ধি হইয়া এখন চল্লিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পিতা মাতার ধারণা কন্যার পয়ে তাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। সে জন্য তাঁহারা প্রভাকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রভাও বড় গুণবতী ছিল। অল্প বয়সেই সংসারের কার্য্য সে অনেক শিখিয়াছিল, তা' ছাড়া মাতার নিকট হইতে সূচের ও বুননের কার্য্যও অনেক আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাতেই সে ক্ষান্ত হয় নাই। লেখাপড়ায় তার যথেষ্ট অনুরাগ থাকায় হরিহর বাবু আফিস হইতে আসিয়া যখন পুত্রকে পড়াইতে বসিতেন, প্রভাও তখন আপন পুস্তক লইয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। এইরূপে বালিকা একে একে অনেকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে সর্ব্বগুণে গুণবতী হইতে দেখিয়া পিতামাতার আনন্দের আর সীমা ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাবিতেন—"এরূপ গুণবতী কন্যার বিবাহে তাঁহাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। যে কেহ কন্যার গুণের কথা শুনিবে সেই আদর করিয়া তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবে।" সরল স্বভাব সংসারানভিজ্ঞ দম্পতি একথা একবারও চিন্তা করেন নাই যে, এই হৃদয়হীনের দেশে, এই পুত্র-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতার বাজারে গুণের আদর নাই, রূপেরও যে বড় আদর আছে—তাহাও নয়, আদর কেবল অর্থের। যে যত অধিক অর্থ ঢালিতে পারিবে, তাহার কন্যা তত অধিক রূপসী ও গুণবতী প্রতিপন্ন হইবে, হইলেই বা সে কুরূপা ও নিরক্ষরা। অর্থে যখন লাভী হয় তখন রূপ গুণ হইবে এ আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক প্রভার জনক-জননী কিন্তু সে কথা একবারও চিন্তা করেন নাই; তাঁহারা কন্যার ভবিষ্যৎ কাল্পনিক সুখেই বিভোর হইয়াছিলেন, তাহার বিবাহের জন্য এ কাল পর্য্যন্ত কিছুই সঞ্চয় করেন নাই।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়। যতই দিন যাইতে লাগিল, প্রভার বয়সও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার প্রতিবেসিনী সঙ্গিনাগণের একে একে বিবাহ হইয়া গেল, বাকী কেবল সে। হরিহর বাবুর ইচ্ছা কন্যাকে একটি সৎপাত্রে অর্পণ করেন; কোন্ পিতামাতারই বা সেরূপ ইচ্ছা না হয়? কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পাত্র আজকাল পাওয়া দুরূহ। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেরূপ একটি পাত্রও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ধনী হয় ত বিদ্যাহীন—বর্ণবোধশূন্য, বিদ্বান হয় ত বাস-ভবন পর্য্যন্ত নাই; আর যদি উভয়েরই সমাবেশ থাকে, তবে সে পাত্রের দাম ঢের, অন্ততঃ চারি সহস্র টাকার ন্যূন নহে। এতদিনে হরিহর বাবুর চক্ষু ফুটিল, বুঝিলেন তিনি মনোমধ্যে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছিলেন, কেবল লেখাপড়া, বুনন বা গৃহ-কার্য্যে এদেশে কন্যার বিবাহ হয় না, রুধিরহীন বাঙ্গালীর ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, প্রচুর রুধির ঢালিয়া দিতে হইবে। হরিহর বাবু মনে মনে বঙ্গ-সমাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

গালিই দিন আর যাহাই করুন, কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আর বিবাহ না দিলে চলে না। হরিহর বাবু ও

তাঁহার পত্নী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল। একদিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন,—"দেখ, আর ভেবে কি হবে, রতনপুরের ছেলেটীর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে ফেল; যা বরাতে আছে হবে।" হরিহর বাবু একথায় কোন উত্তর দিলেন না। গৃহিণী আবার বলিলেন,—"কথা কইছ না যে? তার চেয়ে কনে আর কোথায় পাবে, দেখা ত ঢের হয়েছে? আগে ত একথা ভাবনি, যা উপায় ক'রেছ, সবই খরচ ক'রেছ, সুতরাং এখন তার ফলভোগ ক'রতেই হবে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিহর বাবু বলিলেন,—"ফলভোগ করিতে হয় আমাদেরই করা উচিত, কন্যা ত সে দোষের জন্য দায়ী নয়। একটা মেয়ে, জেনে শুনে একটা বিশ্ববখাট ছেলের হাতে দিই কি বলে? মেয়ে ত আজীবন জ্বল্‌বেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও জ্বলে পুড়ে খাক্ হতে হবে। শোন গিন্নি! আমি যে মতলব ঠাউরেছি। তোমায় সাহস ক'রে এতদিন বল্‌তে পারিনি, কিন্তু আর না বল্‌লে চলে না। মেয়ে ত ডাগর হ'য়ে উঠেছে, আমি বলি কি—এদিকে যখন এত চেষ্টাতেও পাত্র মিল্‌লো না—এইবার বরং একটী ভাল দেখে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র সন্ধান করা যাক্, ইতিমধ্যে কোথাও জুটে উঠে ভালই।"

গৃহিণী। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র কি খারাপ হয় না?

হরিহর। হয় না একথা ব'ল্‌তে পারি না, তবে খুব কমের ভাগ। কারণ যে একবার সংসারে ঢুকেছে সে তার হাড়হদ্দ বুঝে নিয়েছে; তাকে আর বড় একটা পথ ভুল্‌তে হয় না।

গৃহিণী। তুমি যা ভাল বুঝ কর; আমি মেয়ে মানুষ অতশত বুঝি না। তবে আমার সাধ—যেমন একটা মেয়ে—একটি ছেলে মানুষ জামাই হয়—দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল পাঁচজনের সাম্‌নে দাঁড় করান যায়, তবেই সুখ। তা' বিধাতার ভবিতব্য—যা বরাতে আছে হবে।" এই বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। হরিহর বাবুও কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

(২)

আরও ছয় মাস গত হইল; হরিহর বাবু এ সময়ের মধ্যেও কন্যার বিবাহের জন্য কোন পাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সম্মুখে চৈত্র মাস, এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে বিবাহ না দিলে সে বৎসরও কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিবেন, তিনি দরিদ্র; দরিদ্রের কন্যাদায় অপেক্ষা গুরুতর দায় আর নাই। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধও গঙ্গাতীরে স্বল্প খরচে হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজের বিধানানুসারে একটা তীরস্থ ব্যক্তিকে কন্যাদান করিতে হইলে, অভাব পক্ষে পাঁচশত টাকা চাই-ই, শাদাধুতি ও আতপ তণ্ডুল ত সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেই হইবে। যাহা হউক, হরিহর বাবু কিন্তু পূর্ব্বে যতটা উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এখন আর ততটা নাই; তিনি কতকটা ঈশ্বরের তথা ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছেন।

ছয় মাস পূর্ব্বে পত্নীর সহিত যখন তাঁহার ঐ সম্বন্ধে কথাবর্ত্তা হয় প্রভা অন্তরালে থাকিয়া সকল কথা শুনিয়াছিল। বালিকা স্বভাবতঃ বড়ই সুশীলা ছিল এবং পিতার অবস্থাও সম্যক উপলব্ধি করিয়া লইয়াছিল। সে ভাবিল,—"একটা অপরিণত বয়স্ক বর্ণ-জ্ঞানহীন মাতালের সহিত বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চরিত্রবান্ দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। ভাবিল তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হবে। চরিত্রবান্ প্রৌঢ় স্বামী বরং ভাল, তথাপি তাহার সই অনীলার ন্যায় যুবক স্বামীতে প্রয়োজন নাই। অনীলার পিতার ত পয়সার অভাব নাই এবং কন্যার বিবাহে ব্যয়-সঙ্কোচ করেন নাই, অথাপ অনীলার অদৃষ্টে একি হইল? তাহার চোখের জল ত থামিল না? এই সব চিন্তা কারয়া প্রভা নিজের মনকে এক প্রকার দৃঢ় করিয়া লইয়াছিল।

ফাল্গুন মাসও কাটিয়া যায়—আর আট দিন মাত্র অবশিষ্ট, হরিহর বাবু হঠাৎ একদিন এক বন্ধুর মুখে সংবাদ পাইলেন যে অনীলার শ্বশুর বাড়ী দেবদীঘি গ্রামে একটি দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র আছে। প্রথম পক্ষের ৩।৪টি পুত্র-কন্যা থাকিলেও বয়স অধিক নহে, অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। পাত্রটী সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত। পাত্রের পৈত্রিক লাখরাজ জমিজমা কিছু আছে এবং সে নিজেও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী করে। সংসারে দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক না থাকায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে, নতুবা শিশু পুত্রকন্যাগণকে দেখাশুনা করে কে? মোটের উপর যোগাড় করিতে পারিলে কন্যা ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাইবে না। সংবাদ-দাতা অনীলার স্বামী বীরেন।

সংবাদ পাইয়াই হরিহর বাবু পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন—পাত্রের চরিত্রে কোন দোষ নাই; তিনি যেমনটী খুঁজিতেছিলেন, ঈশ্বর ঠিক তেমনটীই জুটাইয়া দিয়াছেন। তবে প্রথম পক্ষের ৩।৪টী পুত্র-কন্যা আছে, তা কি করিবেন, সকল বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ মিলে কই? তিনি আর কোন দ্বিধা না করিয়া সেই পাত্রেই কন্যাদান করিতে মনস্থ করিলেন এবং সেই দিনই কথা-বার্ত্তা একপ্রকার মীমাংসা করতঃ বাটী আসিয়া গৃহিণীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেম। প্রথম পক্ষের সন্তান আছে শুনিয়া গৃহিণী প্রথমে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু পাত্রের অবস্থা, বিদ্যা ও চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আর কোন আপত্তি করিলেন না। প্রভাও সে কথা শুনিল, শুনিয়া একজন সঙ্গিনীর নিকট বলিল—"দেবদীঘির লোক সইএর বরের মতন না হয়?" হরিহর বাবুর কর্ণে সে কথা পৌছিলে তিনি যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, পাত্রের দেহে কোন দোষ নাই দেখিয়াই তিনি এই পাত্রই স্থির করিয়াছেন, তখন তাহার আর ক্ষোভ রহিল না; পিতা-মাতার আনন্দে সে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তারপর বৈশাখ মাসের একদিন একটা শুভলগ্নে সেই দ্বিতীয় পক্ষের বরের সহিত প্রভার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। ভবিতব্যেরই জয় হইল। হরিহর বাবু শত চেষ্টা করিয়াও

তার বিরুদ্ধে অন্য পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল, জামতা মগুপ বা চরিত্রহীন হইল না। প্রভাও বোধ হয় নিতান্ত অসুখী হয় নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন।

ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত।

হে বিরাট! হে ভূমা! হে অনন্ত! তুমি কি চিরদিনই মানবের নিকট অব্যক্ত থাকিবে? যে মনুজ-কুল-তিলকের নিকট আপনাকে ব্যক্ত করিবে অর্থাৎ যাহাকে আপনার স্বরূপ অবগত করাইয়া মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহের চরম অভীষ্ট প্রদান করিবে, তাহাকে স্বীয় অপূর্ব্বভাবে এরূপ অভিভূত করিবে যে, তাহার বর্ণনাশক্তি একেবারে অপহৃত হইবে, কারণ, তখন সে আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিবে না। সে সচ্চিদানন্দময় হইবে। যে তোমার বর্ণনা করিবে, সে যে তখন তোমাময় হইবে! তোমার এই যে পরিদৃশ্যমান স্থূল জগত--অবশ্য যাহা কেবলমাত্র আমাদের চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হয়—তাহাও মাত্র দৃশ্যে পর্য্যবসিত হইবে,—তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপভাব কি আমাদের কোনরূপ বোধগম্য হইবে না? তাহা কি অনন্তকাল ধরিয়া অপরিজ্ঞাত থাকিবে? আমরা কি কেবল বিমোহিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিব?

তোমার দিবা ও রাত্রি কি অপরূপ সৃষ্টি। দিবার পর রাত্রি আসে, আবার রাত্রির পর দিবা আসে। ধীরে, অতি ধীরে, আরও ধীরে কেমন অন্ধকার অপসৃত হয় ও আলোক আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে; আবার সেইরূপভাবেই আলোককে নিঃসারিত করিয়া অন্ধকার আসিয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসে। সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ ব্যাপারই অবিকৃত থাকিবে, প্রলয়েই বোধ হয় এই চিরন্তন প্রথার বিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে। এই যে দিবা ও রাত্রি, আলোক ও অন্ধকারের বিভাগ, ইহাতে প্রভূত পরিমাণে সুবিচারের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। একের অপেক্ষা অপরকে অধিক পরিমাণে অধিকার ভোগের সময় প্রদান করা হয় নাই, দুয়েরই প্রভাব সমান কাল স্থায়ী।

আবার, প্রাতঃকালে যখন প্রাচী-ললাট প্রচুর রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হন, তখন কত মহিমাই না তাহাতে প্রকাশ পায়! আমরা আপনহারা হইয়া চাহিয়া থাকি। মধ্যাহ্নে যখন ময়ূখমালী প্রখর কিরণমালা বিস্তার করিয়া বিশ্বদহন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন আবার তাঁহার কি রুদ্রভাবেরই প্রকট হইয়া থাকে। সায়াহ্নে সেই তপনদেব রশ্মিজালের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করিয়া ও স্বীয় রুদ্রভাব সম্বরণ করিয়া কি বিচিত্রভাবে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হন। সে মুহূর্ত্ত কি পবিত্র মুহূর্ত্ত! একদিকে দিনের আলো দিগন্তে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, অপরদিক হইতে অন্ধকার ধীরপদবিক্ষেপে আসিয়া আলোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন তাহাকে অবস্থান করিবার নিমিত্ত

কত সাধ্য-সাধনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। আলো কিন্তু অবস্থান করাত দূরের কথা, বরং আরও দ্রুতগতিতে পৃথিবী ও আকাশ যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইতেছে; অন্ধকার ইত্যবসরে সমগ্র জগতকে পরিব্যাপ্ত করিতেছে। এই দিবা ও রাত্রির সংমিশ্রণকালে হৃদয়ে যুগপৎ অতুলনীয় আনন্দ ও ভক্তির উদ্রেক হয়—প্রাণ যেন স্বতঃই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণে ঢলিয়া পড়িতে চায়।

দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে জগৎপাতার মহিমা যেন অধিকতররূপে উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হয়। এই কোলাহলময় বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র এক গম্ভীর নীরব ভাব অবলম্বন করে। সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী, বিমল শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রাদেবী আসিয়া প্রায় যাবতীয় জীবকুলকেই আশ্রয় করেন; তিনি আপন কার্য্যে কোনরূপ :পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন না, সকলকে আপনার অযাচিত দান মুক্তহস্তে প্রদান করেন—অতিমাত্র ঘৃণ্য, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, সকল প্রকার স্নেহ হইতে একান্ত বঞ্চিত যে, সেও তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও নিজ প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হয়; মূর্ত্তিমান রিপুগণ স্বরূপ মনুর বংশধরেরাও অল্পকালের নিমিত্ত স্ব স্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যায়। জীবের হিতার্থে নিদ্রা যাঁহার দান, তাঁহার অদেয় আর কি থাকিতে পারে? এ সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা কত অক্ষম।

রজনীতে আকাশে যে মনোলোভা শোভার আবির্ভাব হয়, তাহা কবি-জন-সুলভ মানসকে সহজেই আকৃষ্ট করে; কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কয়জন সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া চর্ম্ম-চক্ষু ধারণের সার্থকতা লাভ করে? নিশাকর যখন নক্ষত্রনিকর পরিবেষ্টিত হইয়া নিরভ্র গগন হইতে স্নিগ্ধ অথচ শুভ্র রশ্মিজাল পাতিত করিয়া ভূলোকে রজতময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া প্রাণিরাজ্যে বিষম বিভ্রম উপস্থাপিত করে তখন সেই জ্যোৎস্নার সহিত বিগলিত হইয়া তাহার স্বরূপ অবগত হইবার অভিলাষ কি অনেক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না? ইহা ত একটী ভাবের অভিব্যঞ্জনা; পুনশ্চ যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে স্বীয় অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় এবং যখন তান্ত্রিক সাধকপ্রবর আপন অভীষ্টলাভের অবসর বুঝিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে মহাশ্মশানে শব সাধনে ব্যাপৃত হন তখন যে কি ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তাহা কে বলিবে? নিশায় প্রকৃতির এই পক্ষ ক্রমে স্নিগ্ধ ও ভীষণ ভাব অবলোকন করিলে পাছে সাধারণ জনসমূহ সৃষ্টির গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হয়, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় বিশ্বস্রষ্টা জীবকুলকে নিদ্রাঘোরে অচেতন করিয়া রাখেন। সে সময়ে স্বভাবের বিপুল সম্পদ দর্শন করিলে অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ও পুলকে শিহরিয়া উঠে, এবং প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়।

দিবা ও রাত্রির কথা ত্যাগ করিয়া এইবারে ষড়্ঋতুর বিষয় আলোচনা করা যাউক। কালের অবিরাম গতি নিরূপণ সৌকর্য্যার্থে মনুষ্য তাহাকে মাস, বৎসর প্রভৃতিতে বিভাগ

করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু, মনে হয়, সৃষ্টি-কর্ত্তা যে ষড়ঋতুর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতেই বৎসর গণনার সূচনা হইয়াছে। কালের কঠোর শাসনে পার্থিব সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল ; এখানকার কোন বস্তুই চিরদিন সমভাবেই অবস্থান করিতে পারে না। সেই নিমিত্তই ষড়ঋতুর প্রচলন। গ্রীষ্ম পৃথিবীকে দগ্ধ করিবার প্রয়াস পায় ; বর্ষার বারিধারা আসিয়া তাহাকে সিক্ত করতঃ তাহার উত্তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া দেয় ; শরৎ আসিয়া তাহাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করে। তৎপরে হেমন্ত আসিয়া শীতের প্রকোপের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলে। শীত আসিয়া তাহাকে বলে তুমি কিছুদিন অবিচলিত হইয়া আমার প্রভাব সহ্য কর, কারণ চিরমধুর বসন্ত আসিয়া তোমাকে নব-জীবন দান করিবে ও প্রভূত সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিবে। বসন্তের মলয় মারুতে, তাহার পুষ্পসম্ভারে ও মনোন্মাদ কর-দৃশ্যে কে না মোহিত হয় ও আপনভোলা হইয়া চাহিয়া থাকে ? জগতে যদি কেবলমাত্র একটী ঋতু বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রাচীনত্ব সকলের বোধগম্য হইত ; কিন্তু বিভিন্ন ঋতুর প্রবর্ত্তন থাকায় এই প্রাচীনত্বের মধ্যে নবীনত্বের সঞ্চার হইয়াছে ; সেই জন্য মানব বুঝিতে পারে না যে, সে বয়োবৃদ্ধ হইতেছে,যত সময় অতিবাহিত হইতেছে—ততই এ সংসারে তাহার অবধারিত দিনগুলি নিঃশেষিত হইতেছে ; সেইজন্য সে পূর্ণ উদ্যমে তাহার বাসাধারে অবস্থান আরও ঘনীভূত করিতেছে ; এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতেছে না যে, এ নিত্য নূতনের মধ্যে তাহার জীবনের প্রবাহ মহাকালের উদ্দেশে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই ত সৃষ্টি-কৌশল, এই নিমিত্তই ত আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি এবং প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে অবসর পাই না।

স্বভাবতঃ শান্তিময়ী প্রকৃতি-দেবীর শান্তি-ভঙ্গকর কোন ঘটনা দর্শন করিলে আমরা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়ি। প্রকৃতি-দেবীর ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ সদৃশ ঐ নীলাকাশ শোভা পাইতেছে। কিন্তু ঐ আকাশ হইতে যখন অশনিসম্পাত হয়, তখন উহার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় ! তখন ভীম ভীমসেন সম বলী মানবেরও অন্তরাত্মা ভয়ে শিহরিয়া উঠে। সে সময়ে কি বুঝিতে পারা যায় না যে, আমাদের বল, আমাদের দর্প, আমাদের অহঙ্কার কি তুচ্ছ বস্তু ? আমরা এই সমস্ত অসার বস্তু লইয়াই উন্মত্ত, সার বস্তুর সত্তা বুঝিতে আমরা ভুলিয়াছি।

আমরা সর্ব্বদা অনন্ত বায়ু-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি ; ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার প্রবাহের অভাব ঘটিলে এই সতত সঞ্চরণশীল দেহ স্পন্দ-হীন হইবে, জীবনীশক্তি ইহার নিকট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে কিন্তু এই জীবন-সুহৃদের আবার জীবন নাশকারী রূপ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই বায়ুই তখন প্রবল বাত্যা-রূপে প্রবাহিত হইয়া উচ্চশির বনস্পতিগণকে নতশির ও ভগ্নশির করে, সুরম্য সৌধাবলিকে ভূমিসাৎ করে এবং প্রাণিগণের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে। কি সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। কি

মহান্ ভাব !!

দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবী নীরবে সকল সহ্য করেন। তাহার উপর দিয়া যতই ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া যাউক না কেন, যতই লোমহর্ষণকর পাপের নাটক অভিনীত হউক না কেন, তিনি ধীর, প্রশান্ত, নিশ্চল। এই নিমিত্তই তাঁহাকে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী এই আখ্যা প্রদান করা হয়। কিন্তু তাঁহারও ধৈর্য্যের একটী সীমা আছে। সেই জন্য তিনি মাঝে মাঝে কম্পান্বিত হন। তাঁহার এ অবস্থা অত্যল্পকাল স্থায়ী হইলেও নিমেষ মধ্যে যে কত সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়, কত নিগূঢ় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ সে সকল বিষয় বুঝিয়াও অজ্ঞ।

কোন কোন প্রদেশে পর্ব্বত-শিখরে গহ্বর-মুখ হইতে প্রচুর অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মনুষ্য ভয়ে ও বিস্ময়ে পলায়নপর হয় এবং দূরস্থ প্রদেশে গিয়া স্থির-নেত্রে চাহিয়া থাকে। কত শোভনদর্শন নগর দগ্ধীভূত হইয়া গলিত ধাতুর দ্বারা প্রোথিত হইয়া যায়, কত তৃণসমাচ্ছাদিত ক্ষেত্র মরু-ভূমিতে পরিণত হয়। এ ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি দর্শনে সকলে 'ত্রাহি ত্রাহি' ও 'সম্বর সম্বর' রবে চীৎকার করিতে থাকে। ইহার দ্বারা সেই অচিন্ত্য অব্যক্তের আত্মরূপ কত পরিমাণে প্রকাশ পায়, মানব তাহা বুঝিতে পারে না।

মরুভূমি দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোথায় শস্য-শ্যামল, কমকান্তি প্রদেশসমূহ আর কোথায় মরুপ্রদেশ—কি অভাবনীয় পার্থক্য। জলন্ত হুতাশনসম মরুর রূপ দেখিলে মনে হয় ধ্বংসই বুঝি প্রাকৃতিক নিয়ম, সংহারের নিমিত্তই বুঝি জগতের সৃষ্টি। এই স্থানে সামান্য বালুকণার কি প্রতিপত্তি—ইহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে অতীব শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিও ইতস্ততঃ করে ও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। দুস্তর জলধি উত্তীর্ণ হইতে মানব যেমন অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই মরু-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতেও সেই পরম কারুণ্য-নিদান পরমেশ্বর সেইরূপ উষ্ট্ররূপ পোত সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদ্রে দ্বীপের ন্যায় এই স্থানেও মরুদ্বীপের সৃষ্টি করিয়া নিরাশার মধ্যে আশার বিধান করিয়াছেন। যাহার দর্শনে এ বিপুল বিশ্বে বুঝি জল নাই—এইরূপ মনে হয়, তাহাতেই তিনি আবার মধ্যে মধ্যে জলাধারসমূহের সন্ধান দান করিয়াছেন। এরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দ্রব্যের একত্র সমন্বয় কেবল তাঁহারই সৃষ্টিতে সম্ভবপর হয়। মানবগণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা অনেক অসাধ্য-সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু এরূপ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের এক স্থানে অবস্থিতি কোথাও সম্ভব করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

হিম-প্রধান দেশ সমূহে শীত-ঋতুর আগমনে তুষার-সম্পাত হইয়া থাকে। প্রজ্জলিতাগ্নি রুদ্ধদ্বার গবাক্ষ সমন্বিত গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কাচের মধ্য দিয়া বহিঃপ্রকৃতির তুষারপাতরূপ ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষ সহ্য করা তত ক্লেশদায়ক নহে বরং কতক পরিমাণে আনন্দদায়ক। কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত বক্ষে বিচরণশীল প্রাণি-নিচয়ের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ে যথার্থই ক্লেশ

অনুভূত হয়। চিরতুষারের আগার মেরু-প্রদেশে আবার এই সময়ে নদী, সমুদ্র প্রভৃতির জল বরফরূপ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তাহার উপর দিয়া তখন অবলীলাক্রমে গমনাগমন করা যায়। স্থানে স্থানে ঐ সমস্ত বরফরাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করে এবং জলপথে বাহির হইয়া বহিঃসমুদ্রে গিয়া পড়ে। তখন উহা পোতসমূহের পক্ষে কালসম হয়; কোন প্রকারে একবার পোতের সংস্পর্শে আসিলে, পোতের নাশ অবশ্যম্ভাবী। মানবের বিদ্যা-বুদ্ধির দর্প, তাহার সমুদ্রের উপর প্রভুত্বের অহঙ্কার নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়। সৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণে তখন মানব অপারগ।

সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আমরা স্রষ্টার বিরাট ভাবের সন্ধান পাই, কিন্তু সমুদ্র ও আকাশ এ বিষয়ে আমাদের যত অধিক পরিমাণে পরিচয় দিয়া থাকে, বোধ হয় অপর কোন বস্তু সেরূপ পারে না। উপরে অনন্ত আকাশ শোভা পাইতেছে, নিম্নে মহাসিন্ধু তাণ্ডব-নর্ত্তন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। কি অপূর্ব্ব শোভা! আবার যেখানে সমুদ্র ও আকাশ মিলিয়াছে, যেখানে অনন্তের সহিত অনন্তের আলিঙ্গন হইয়াছে, সে স্থানের শোভার, সে স্থানের মাধুর্য্যের ধারণা করিতে মানব-মস্তিষ্ক অক্ষম। সেই ধারণা যেদিন করিতে পারিবে সেদিন সকল বন্ধন ছিন্ন হইবে, সেদিন আর ভিন্নভাবে অবস্থান করিতে হইবে না, সে দিন ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। যত বড়ই সংস্কারক্লিষ্ট জন হউক না কেন, একবার যদি সমুদ্রের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হয় ও তাহার কল্লোলস্বর শ্রবণ করে, একবার যদি দিগন্তবিস্তারী আকাশের প্রতি চাহিয়া ঐ মহাশূন্যের সহিত আপনার হৃদয়কে ক্ষণেকের জন্য মিশ্রিত করিতে পারে, তাহা হইলে সে সমস্ত বিস্মৃত হইবে, তাহার আপন অবস্থিতি অবধি সে অনুভব করিতে পারিবে না। দ্বিপ্রহর রজনীতে সুনীল নভোমণ্ডলের দিকে কর্ণ স্থির করিয়া পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিলে, বোধ হয় যেন কাহার অতি অস্ফুট অথচ গম্ভীরস্বর প্রাণের মধ্যে শুনা যায়। সে স্বরের ভাষা সম্পূর্ণ বোধগম্য হইলে, সৃষ্টি বিষয়ে বহু সন্ধান লাভ হইত এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানও অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইত। সাগরতীরে উপস্থিত হইলে যেন কাহার কাতর আহ্বান আমাদিগকে দুস্তর ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলে। সে কাতর আহ্বান যাহার সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীকে ঝঙ্কারের দ্বারা জাগাইয়া দেয় সেই ধন্য হয়, কারণ তাহার পরম বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইতে আর অধিক বিলম্ব থাকে না। আকাশ ও সাগরের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই পরম পুরুষের সন্ধান লাভ সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

ধরাপৃষ্ঠে পর্ব্বতরাজি যে কতকাল ধরিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। হিমাচল শীর্ষে সামুদ্রিক শম্বুকাদি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে উহা এককালে সমুদ্রগর্ভে লীন ছিল অথবা উহার অগ্রভাগ সমুদ্র বক্ষ হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত ছিল; কতকাল ধরিয়া যে উহা বর্ত্তমান অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যাইতে

পারে। যাহা হউক সে সম্বন্ধে আমাদের বিচারের প্রয়োজন নাই। পর্ব্বতসমূহের সহিত যে প্রাচীনত্ব, মহত্ব এবং বিরাটত্বের ভাব বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তাহা হইতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের বিরাট রূপের সামান্য পরিমাণে পরিকল্পনা করিবার নিমিত্তই এত অবান্তর কথার অবতারণা। পর্ব্বতপাদমূলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে আপনাকে কত ক্ষুদ্র মনে হয় এবং আমার আমিত্ব কোথায় বিদূরিত হয়। মহাজনগণ পর্ব্বতের বন্ধুর উপলখণ্ড রোপিত এবং কণ্টকাকীর্ণ পথের সহিত ধর্ম্মপথের উপমা দিয়াছেন। সে পথ এরূপভাবে অবস্থিত যে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের সম্ভাবনা। সেইজন্য ধর্ম্মপথে সতর্কতা সহকারে আরোহণ করিতে হয়। সে যাহাই হউক, পর্ব্বত কঠিন পদার্থে গঠিত; তাহার মধ্য হইতে জল নিঃসরণ করা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু জগন্নির্ম্মাতা কেবলমাত্র এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করেন নাই, পরন্তু তিনি পর্ব্বতের অন্তর হইতেই যাবতীয় নির্ঝর উদ্ভূত করিয়াছেন। এত অচিন্ত্যনীয় কার্য্যাবলী হইতেও আমরা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারি না।

উদ্ভিদ ধরাকে সুশীতল রাখিয়াছে। আমরা নিজ দোষে পীড়া আনয়ন করি। দয়ার নিধান পরম কারণ তজ্জন্য উদ্ভিদ সকলকে ও কোন কোন খনিজ দ্রব্যকে পীড়া নাশকারিণী শক্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অনেক উদ্ভিদের ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি অধিকন্তু ইহাদিগকে জীবগণের ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন; অবশ্য এ নিয়ম সকল প্রাণীর পক্ষে নহে। কিন্তু তিনিই যে ইহাদিগকে এরূপ করিয়াছেন, অথবা প্রাণিগণ ক্ষুধার উত্তেজনায় ইহাদিগকে খাদ্যের মধ্যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবহমানকাল এরূপ চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক আমরা দেখিতে পাই যে উদ্ভিদ হইতেই প্রাণিগণের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে।

পশুদিগের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, এমন কি অনেক পশু-জনক-জননী স্বীয় সন্তানকেও উদরসাৎ করে। ইহার মধ্যেও সৃষ্টির গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। আমরা যদি মোহান্ধ না হইতাম তাহা হইলে ইহা হইতে অনায়াসেই বহু সত্য আবিষ্কার করিতে পারিতাম। জগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যাহাদিগকে আমাদের চর্ম্ম চক্ষের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তাহাদেরও আবশ্যকতা আছে, কারণ সকল বস্তুই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট এবং পশুকে নিকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক বিষয়ে পশুকে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তিনি পশুকে তীক্ষ্ণ অনুভূতির ক্ষমতা দান করিয়াছেন। আমরা যাহাকে পশুবুদ্ধি নামে অভিহিত করি, তাহার কার্য্যাবলী অবলোকন করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। কোন কোন স্থলে ঐ সমস্ত কার্য্যাবলী মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা বুঝিয়াও বুঝি না।

অথবা অনেক ক্ষেত্রে আদৌ বুঝিতে চেষ্টা করি না যে, জগদীশ্বরের মহিমা তাঁহার পশু-জগত-সৃষ্টিতে কতটুকু প্রকাশ পায়।

হিতাহিত বিবেচনা আছে বলিয়া মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। জগৎপিতা মনুষ্যের মধ্যে আপন সত্ত্বা দান করিয়াছেন। তাঁহার মনোমধ্যে ক্রীড়া করিবার এবং আপনাকে আরও বিশেষভাবে দর্শন করিবার অভিলাষ হইল; তিনি আপন অংশের কতক ভাগ দ্বারা মনুষ্য দেহ গঠিত করিলেন, কিন্তু তাহাকে মায়া-পাশে আবদ্ধ করিলেন। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে কেহ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে। কেহ সুখসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, কাহারও হৃদয় প্রিয়জনবিয়োগজনিত শোকে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে; কেহ বা জরাজীর্ণ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; কেহ গর্ব্বস্ফীত হইয়া আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করিতেছে; কেহ পয়ঃপ্রণালী হইতে অন্ন কুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে; কেহ মুক্তহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেছে, কেহ রাজা হইয়াছে, কেহ তাহার প্রজারূপে বাস করিতেছে; কেহ পিতা সাজিয়াছে, কেহ তাহার পুত্র হইয়াছে; কেহ উত্তমর্ণরূপে অধমর্ণের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; কেহ বিকলাঙ্গ হইয়া দর্শকের মনে ঘৃণা আনয়ন করিতেছে, কেহ কন্দর্পকে বিজিত করিয়া রূপের স্নিগ্ধ দীপ্তিতে নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে ও দ্রষ্টার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিতেছে, এ সমস্তই মায়ার লীলা, মায়াই জগতকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে। সেইজন্য জাগতিক জীব এত অভিভূত ও আপন আপন স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম। তাহাকে তাহার আপন মুখ দেখিবার অবসর দেওয়া হয় নাই; নিজ মুখ ভিন্ন সে সমস্ত দ্রব্য দেখিবার অধিকারী। সে কেবল পরের সাহায্যেই উহা দেখিতে সমর্থ। যখন এই সামান্য সত্য আমরা বুঝিতে পারি না—তখন অন্য বিষয় ত অতি জটীল। আমরা বুঝিতে পারি না কোথা হইতে আসিয়াছি, কি উদ্দেশ্যেই বা আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পর কোন স্থানে অবস্থান করিব। অনেকে অনেক প্রকারে এ প্রশ্নত্রয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যেদিন আমরা যথার্থ ইহার সমাধান করিতে পারিব, সেইদিনই অব্যক্তকে ব্যক্তভাবে দেখিয়া জীবন সার্থক করিব।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিদায়।

[একদা বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আমি ঘাটশীলা গিয়াছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে সুবর্ণরেখাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।]

যাও বহে' কল্লোলিনী সাগরের পানে,
তোমার তরঙ্গ হার,　　দিতে প্রেম-উপহার,
অনন্ত প্রেমের নিধি বারিধি চরণে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
নাচিবে সহস্র রবি তোমার জীবনে,
কোটি রম্য শশধর,　　কাঁপিবে উরস 'পর,
তরঙ্গের শিরে শিরে—চঞ্চল পবনে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

অগণ্য তারকা-বালা বসিয়া বিমানে,
হেরিবে তোমার জলে, মুখ ফুল্ল শতদলে,
যুবতী বদন হেরে যেমতি দর্পণে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
প্রভাতে মাখিয়া অঙ্গে অরুণ কিরণে,
ধরিবে মোহনশোভা, জগজন মনোলোভা,
মুগ্ধনেত্রে রবে চেয়ে আকাশের পানে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
হেমোজ্জ্বল মেঘ ভাসে সন্ধ্যার গগনে,
তোমার নির্ম্মল জলে, তার প্রতিচ্ছবি দুলে,
তরঙ্গের তালে তালে—মৃদুল কম্পনে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
প্রাবৃটে আবার তুমি উদ্দাম যৌবনে,
ভাসাইয়া দুই কুল, প্রক্ষালিয়া শৈলমূল,
বহে' যাবে কত রঙ্গে চঞ্চল চরণে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
সুগন্ধ সুস্নিগ্ধ মন্দ মলয় পবনে,
অধীর আবেগে চুমি', শিহরি' উঠিবে তুমি,
মূর্চ্ছিয়া পড়িবে তার স্নিগ্ধ-আলিঙ্গনে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
থাক শু'য়ে বত্নগর্ভা পাষাণ-শয়নে,
তোমার মধুর জলে, পাল জীব ফল ফুলে,
জননীর সম স্নেহ বারি ধারা দানে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
চলিল মা! এ অভাগা—পরে কতদিনে
পাবে কি না দরশন, তব পুণ্য ও চরণ,
এ জীবনে পাবে কি না কেবা তাহা জানে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়।

'পতি-দেবতা।'

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে 'পতি-দেবতা' নামে এক বিকট চিত্র বাহির হইয়াছে—উদ্দেশ্য হিন্দু-সমাজকে বিদ্রূপ করা। এমন ভয়াবহ ছবি ইতঃপূর্ব্বে কোন মাসিকের অঙ্কে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। এক বিরাটাকার লম্পট পতি রক্তচক্ষু, মুখে সিগারেট, বাম হস্তে মদের বোতল, দক্ষিণ করে সুরাপূর্ণ গেলাস লইয়া ভার্য্যাকে তাহা পান করিতে বলিতেছে, তাহাতে সেই রমণী অসম্মত হওয়ায় স্বামী তাহার মস্তকে সবুট পদাঘাত করিয়াছে, আঘাতের ফলে হতভাগিনীর শিরোদেশ হইতে দরবিগলিত ধারায় রক্ত পাত হইয়া ভূমি ও সেই চর্ম্ম-পাদুকা সিক্ত করিতেছে! নিরপরাধা পতি-*ব্রতা সাধ্বী পত্নী তদবস্থায় স্বামীর চরণ-প্রান্তে* বসিয়া পড়িয়াছে। এই ত ছবি! হিন্দু-সমাজে আমরা এরূপ ঘটনা দেখি নাই বা শুনিও নাই। স্বামীর মাতলামী গৃহের বাহিরেই সাধারণতঃ দেখা যায়। আর গৃহের ভিতর করিলেও স্ত্রীর সম্মুখে সুরা-পাত্র ধারণ ও তাহা পানের নিমিত্ত প্রহার ও রক্ত-কাণ্ড অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। হিন্দু-সমাজের এমন ঘোর অধঃপতন এখনও হয় নাই! সেজন্য চিত্রকর মহাশয়ের মস্তিষ্ক-আলোড়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মস্তক হীনের শিরঃ-পীড়া দেখিয়া হাস্য-সম্বরণ করা দুষ্কর।

আর এরূপ ঘটনা যদিও কদাচিৎ

কোথাও এক আধটা হইয়াও থাকে, তাহা হইলে সে জন্য "হিন্দু-সমাজকে" গালি দেওয়া সঙ্গত কি? চিত্রকর যেন এই প্রহৃত ও লাঞ্ছিত রমণীকে পতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই অন্যায়ের প্রতিবিধান (পত্যান্তর গ্রহণ?) করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দু-রমণীর কর্ত্তব্য কি? সে কি তথাকথিত স্বধর্ম্মত্যাগী বা পাশ্চাত্য মহিলার মত পতির বিরুদ্ধে মাথা তুলিবে?—অন্য পতি নির্ব্বাচন করিবে?

ইহাই কি হিন্দু-রমণীর আদর্শ? ইহাই কি হিন্দুর দাম্পত্য চিত্র? আমরা জোর গলায় বলিব—কখনই না। এরূপ স্থলে হিন্দুনারীর অধোমুখিনী ও নির্ব্বাক হওয়াই উচিত। কারণ, সতী হিন্দুনারীর পতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। হাঁ, পতি কুক্রিয়াসক্ত হইলেও হিন্দু-রমণীর কাছে সে দেবতা। ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। পতি যে পায়ে পদাঘাত করে, সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে তাহাই জড়াইয়া ধরে। পতি রমণীর কোন অবস্থাতেই অশ্রদ্ধার পাত্র নহে। অনেক রমণী স্বকীয়া সতীত্ব প্রভাবে পাপাসক্ত পতিকে কুপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

দোষে গুণে মানুষ, দোষ গুণ সব সমাজেই আছে। তাহার সংশোধন হওয়া আবশ্যক আমরা অস্বীকার করি না।

হিন্দুর অর্থে পুষ্ট হইয়া হিন্দুকে গালি দিয়া "প্রবাসী" যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

রবি বাবুর "গোরা"।

সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দাদা! রবিবাবু এই গ্রন্থে কোন্ কোন্ তত্ত্বের আলোচনা করেচেন?

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ভ্রাতৃ-প্রীতি, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম প্রভৃতি এই সকল বিষয়েরই আলোচনা করেচেন। কোন্ বিষয়ে তাঁর কি মত, একটী একটী করে বলনা, শুনি।

বলি শোন।

১। রাজনীতি সম্বন্ধে রবি বাবু এই কথা বলেচেন। "প্রজার প্রতি অবিচারে রাজার অধর্ম্ম ঘটে। প্রত্যেক ইংরেজটিই রাজা" ইত্যাদি। উপন্যাসের ২১৫ থেকে ২১৮র পাত আবার ২৪৪, ২৪৫শের পাতা পড়ে দেখো।

২। সমাজনীতি সম্বন্ধে এই কথা লেখা আছে,—আমাদের সমাজ একটা সিঁড়ি। এর একটা উদ্দেশ্য হচ্চে নীচে থেকে উঁচুতে উঠিয়ে দেওয়া। সমাজকে আমরা ছোট করে ও তুচ্ছ করে দেখি বলেই আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। সমাজকে আঘাত করিলে তার বেদনা অনেক দূর গিয়ে পৌঁছায়। জাতি-ভেদের ফলটা অবস্থার ফল। শুধু জাতি-ভেদের নয়। নড়া দাঁত দিয়ে চিবুতে গেলে ব্যথা লাগে, সেটা দাঁতের অপরাধ, না নড়া দাঁতের অপরাধ। জাতিভেদের কথাও রবিবাবু বলেছেন,—"একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে

ভাত খেলে, কোন দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন ঘৃণা! এটা অধর্ম্ম ভিন্ন আর কি? যে জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা ও অবজ্ঞা সে জাতি পৃথিবীতে কখন বড় হতে পারে না। সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নাই, ঘৃণাও নাই। সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের অতীত। এদেশে সাম্য থাকিলেও নীচ জাতিকে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রে সেই সাম্য না থাকে তা' হলে শাস্ত্রমধ্যে সে সাম্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি?"

রবিবাবু ব্রাহ্ম সুতরাং জাতিভেদ মানেন না। হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ আছে তার নিন্দা করেছেন। আবার ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরেও যে যে দোষ আছে জনসাধারণে তাহাও প্রকাশ করেছেন। ইহা উদারতা।

৩। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে রবিবাবুর কি মত তাহা নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পড়িলেই বেশ বোঝা যায়।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে মর্ব্বে, তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না—সেটা কি ভাল? ব্রাহ্মণকে যদি যথার্থ ভাবে ব্রাহ্মণ করে গড়ে তুলতে পারা যায় তা হ'লে কি সমাজের সামান্য লাভ? আমরা চাই নর-দেবতা ব্রাহ্মণ—যার ভয় নাই, লোভ নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই। যার পরম ব্রহ্মণি-নিয়োজিতচিত্ত; যে অটল, শান্ত, মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়। ধর্ম্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা—এই দুটো অঙ্গকেই ভারত পূর্ণভাবে স্বীকার করিতে চায় বলে, তারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না; তারা স্থূলই নেয়। যিনি রূপেতে সত্য, অরূপেতে সত্য, স্থূলে সত্য, সূক্ষ্মে সত্য, ধ্যানেও সত্য, প্রত্যক্ষেও সত্য,তাকে ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেচে। আমি ঈশ্বরের কাছে সদা প্রার্থনা করি যে, ব্রাহ্মণদের সভাতেই হোক আর হিন্দুদের চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন নতশিরে তাঁকে প্রণাম করিতে পারি। ঈশ্বর দূরের জিনিষকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাট করে দিয়েচেন। হিন্দুরা যে ধর্ম্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে সে লোকের কার্য্য নয়। হিন্দু-শাস্ত্র বড় গভীর জিনিষ। হিন্দু-সমাজের সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের সম্বন্ধ কাটাতে প্যারনি বলেই ত এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি। রবিবাবু উদারভাবে ভেবেচেন। প্রাচীনের অমর্য্যাদা না করে, নবীনের গৌরব বাড়াইয়াছেন।

৪। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম এই উপন্যাসে কেমন সুন্দর ফুটেছে দেখ। মা আনন্দময়ীর মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমার স্বরূপ হউক। আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক। পূর্ণ স্বরূপ ভারতবর্ষ—ধনে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে পূর্ণ। সাধে আমি ভারতের সত্য-পূর্ণ মূর্ত্তি ভুলতে পারি নে? আমরা ভারতকে আধখানা দেখি। আমাদের স্বদেশ-প্রেমের একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা। দেশকে ভালবাস যদি, তবে দেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে এক হতে

পার না। ছোট বড় সকলকে বল দেখি 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার।" আমার এইখানকার কম্পাসটী দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে, সেইখানে আমার ভারতবর্ষ।'

৫। বিবাহ সম্বন্ধে রবিবাবুর মত—"বিবাহই নারী-জীবনে সাধনার পথ, গৃহ-ধর্ম্মই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। এই বিবাহ ইচ্ছা পূরণের জন্য নহে, কল্যাণ সাধনের জন্য। সুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, একমনে সংসারকে বরণ করিয়া, সতী-সাধ্বী রমণী পবিত্র হইয়া ধর্ম্মকেই গৃহের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিবেন, এই তাঁদের ব্রত।"

৬। বিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—"জীবনের এ কি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! বিনয় যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থটীকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে, তা' কি সকলে পায়? ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? এমনটি যদি সচরাচর ঘটিত, তবে বসন্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে, যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি আছে,তাহা স্বভাবতঃই নানাবর্ণে, নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিবার উপায়—এই প্রেম। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল।"

৭। গুরুভক্তি লইয়া রবিবাবু এইকথা বলিয়াছেন—এর মধ্যে একটু শ্লেষ আছে। "আমার গুরু অত্যুচ্চ ভাব-লোকেই বিহার করেন; এ সমস্ত পৃথিবীর কথা কিছুই বোঝেন না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী নারদের মত বীণা বাজাইয়া, বিষ্ণুকে বিগলিত করিয়া গঙ্গার সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু সেই গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে প্রবাহিত করিয়া সগর-সন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত করিবার কাজ পৃথিবীতে ভগীরথের; সে কাজ স্বর্গের লোকের কর্ম্ম নয়।"

৮। রবিবাবুর Cosmopolitanism—"আমি আজ ভারতবর্ষীয়, আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নাই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাদা! গোরা উপন্যাসে রবিবাবু স্ত্রী-চরিত্রই বা কেমন এঁকেচেন, আর পুরুষ-চরিত্রই বা কেমন এঁকেচেন? চিত্রগুলি বেশ ফুটেচে ত?

চরিত্র অঙ্কনে রবিবাবু সিদ্ধহস্ত বলিলেই হয়। তাঁর প্রায় সকল ছবিই বেশ ফুটেচে। পদ্মফুল শুধু সুন্দর নয়, সৌগন্ধযুক্তও বটে। রবিবাবুর চিত্রগুলি এক একটী পদ্মফুল—চিত্রে সুষমাও আছে, আবার সৌরভও আছে।

গোরা উপন্যাসে প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলি এই—গোরা ও বিনয়, কৃষ্ণদয়ালবাবু ও পরেশ বাবু, মহিম ও হারাণ (পানুবাবু), মাধব চাটুয্যে ও দারগা, সতীশ ও সুরেশ।

উপন্যাসের স্ত্রী-চরিত্রগুলি এই—আনন্দময়ী,

বরদাসুন্দরী ও হরিমোহিনী, লাবণ্য ও লীলা, সুচরিতা (রাধারাণী) ও ললিতা।

পুরুষচরিত্র।

গোরা।

গোরার চরিত্রই প্রধান; নাটক হইলে বলিতাম—গোরা প্রধান নায়ক। হরিমোহিনী গোরার রূপে মোহিত হয়ে, গোরাকে শচী-নন্দন গৌরাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবিবাবু খুঁটিয়ে দেখে গোরার রূপ এইভাবে বর্ণনা করেছেন। গোরা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, তার কপালখানা খুব চওড়া, নাকটা খাঁড়ার মত, রংটা কটা,হাত-পা লম্বা লম্বা, গায়ে বেশ জোর আছে। গোরা খট্‌মট্ করে চলে, তার পদ-ভরে মেদিনী কাঁপতে থাকে; তার গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর, কথা কহিলে আকাশ কাঁপে। গোরা শিক্ষিত যুবক, এম-এ পাশ করেচে, সে ঘোর তার্কিক, সকল জটীল বিষয়ের এক একটা সুন্দর মীমাংসা করে রেখেচে, নিজে যা' বোঝে পরকেও ঠিক বোঝাতে পারে। গোরা স্বদেশানুরাগী ও স্বদেশ-হিতৈষী; দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার হইতেছে দেখিলে বরদাস্ত করিতে পারে না,তদ্দণ্ডে অগ্নি-শর্ম্মা ও একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে; বড় নির্ভীক হৃদয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এম-এ পাশ করেও গোরা হিন্দু, সুলেখক, সুবক্তা; আবার স্পষ্টবক্তা, মনের ভিতর কোরকাপ নেই। গরীব-দুঃখীর মা-বাপ; অসভ্য চাষা-ভুষোদের দলে মেশে, ঠেকার-অহঙ্কার নেই। মাতৃভক্ত ও স্বদেশভক্ত। দেশের জন্য প্রাণ-পাত করিতে প্রস্তুত। কিছু উদ্ধত স্বভাব, উদ্যমশীল যুবাপুরুষ। আপন কর্ম্মবিপাকে গোরা জেলে গিয়াছিল। হেসে প্রারব্ধ ভোগ করে জেল থেকে খালাস হয়ে এসে গোরা হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে স্থির করিল। তাহাতে বিঘ্ন ঘটায় প্রায়শ্চিত্ত করা ঘটিল না। কৃষ্ণদয়াল বাবু মৃত্যুকালে গোরার সম্বন্ধে একটী গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। গোরা এতদিন পরে জানিতে পারিল সে হিন্দুর ছেলে নয়, ইংরে-জের ছেলে। তখন হইতে গোরার জীবনের স্রোত আর একদিকে ফিরিয়া গেল। এ বড় সোজা পরিবর্ত্তন নয়। শেষকালে সুচরিতার সঙ্গে গোরার বিবাহ হয়েছিল। গোরার অসা-ধারণ স্বদেশানুরাগের কথা পড়িলে প্রাণ আনন্দে পরিপ্লুত হয়। গোরা বলিতেছে-- "আমার মা আছেন। আমাকে সকলের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন বলিয়া তিনি আমাকে ডাকি-তেছেন। এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। তাহার আসমুদ্র বিস্তৃত নদী, পর্ব্বত, লোকালয় গোরার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। অনন্তের দিক্ হইতে একটী মুক্ত নির্ম্মল আলোক আসিয়া এই ভারতকে সর্ব্বত্র যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দেখাইল। গোরার বক্ষ ভরিয়া উঠিল; তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল; তাহার মনের কোথাও লেশমাত্র নৈরাশ্য রহিল না। সে মনে মনে বার বার বলিতে লাগিল—মা আমাকে ডাকিতেছেন। যেখানে অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী বসিয়া আছেন, আমি সেথায় চলিলাম।" আর একস্থলে আছে-গোরার অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির কথা—গোরা

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন। গোরা আসিয়াই তাঁর দুই পা টানিয়া লইল এবং তার উপরে আপনার মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। গোরা কহিল—মা! তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম্, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নাই, বিচার নাই, ঘৃণা নাই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমি আমার ভারতবর্ষ।"

আর একস্থলে গোরা বলিতেছে—"আমি যখন আমার মাকে দেখচি, মাকে জেনেছি, তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখচি ও জেনেচি।"

গোরার বীর চরিত্র গোরার কথায় প্রকাশ পাইত। গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং—সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে; তাহা বিশ্বাসের বলে ও স্বদেশ-প্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা ত মত নয়, তাহা সম্পূর্ণ মানুষ এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নয়।"

দাদা! গোরার চরিত্রে রবিবাবুর নিজের চরিত্রের ছায়া পড়েনি কি?

সম্পূর্ণ ছায়া পড়েনি, তবে স্থানে স্থানে আব্ছায়া পড়েচে বটে।

বিনয়।

বিনয় গোরার পরম বন্ধু। ইনিও এম, এ পাশ, কৃতবিদ্য, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, নম্র, বিনয়-সম্পন্ন, মিষ্টভাষী। বিনয় গোরাকে ভক্তি করে, আবার ভয় করেও চলে। শুধু গোরাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সময়ে সময়ে নিজের মতের বিরুদ্ধেও কাজ করে। বিনয় গোরার মাকে মা বলে ডাকে, খাওয়া দাওয়ার বিচার করে না, তাহার কারণ বিনয় কুসংস্কারাপন্ন নহে। সকলকে খুসী রাখব, কাহারও অপ্রীতিভাজন হব না, বিনয়ের জীবনের এই মূলমন্ত্র। পরের উপকার করা তার জীবনের একটী ব্রত। পরেশ বাবুর কন্যা ললিতার বিবাহ হয়,—সে বিবাহ ব্রাহ্মমতে নয়, হিন্দুমতে। ললিতা ব্রাহ্মিকা, বিনয় হিন্দু, তবে গোঁড়া হিন্দু নয়। বিনয়ের হৃদয় পবিত্র প্রেমের আধার। সেই স্বর্গীয় প্রেমের কথা রবিবাবু বর্ণনা করিতেছেন "বিনয় যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ টীকে হৃদয়ে পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে—একি সকলে পায়? ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? এমন যদি সচরাচর ঘটিতে পারিত তবে বসন্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি আছে, স্বভাবতঃই নানা বর্ণে, নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত।"

বিনয়ের সঙ্গে গোরার মতভেদ হয়েচে। ঘণ্টা দুই উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হল, পরে বিনয় আপনার বাসায় চলিয়া গেল। তখন গোরার মনের অবস্থাটা কেমন তাই গ্রন্থকার বর্ণনা করিতেছেন—

"বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের

দিনে গোরার হৃদয়ের পরে কে যেন একটী অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। বিনয় চলিয়া গেল কিন্তু সে সঙ্গীত কোনমতেই থামিতে চাহিল না। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল।"

দাদা, বিনয়ের চরিত্রটী কি ঠিক আঁকা হয়েছে?

যার মতের ঠিক নাই, যার কোন principle নাই সে আবার মানুষ? সংসারে বৈচিত্র্য আছে ত। তাই মনে কর না কেন? এই কথা মনে করিলেও সংশয় কেটে যাবে, বিরোধভাব আসবে না।

পরেশবাবু।

পরেশবাবু ব্রাহ্ম, প্রবীণ, ধীর, বিবেচক, মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, শিক্ষিত, ক্ষমাশীল, দয়ামায়ায় ভূষিত; শরীরে রাগের লেশমাত্র নাই, সমদর্শী, ঈশ্বরপরায়ণ; তাঁর মন বড় উচুদরের উদারভাবে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্ম হলেও হিন্দুর প্রতি বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ নাই। এক কথায় যাকে মাটির মানুষ বলে পরেশবাবু তাই—নির্লিপ্তভাবে সংসারে আছেন, যেন জনক ঋষিটী। হারাণবাবু পরেশবাবুকে দোষ দিয়ে বলেন উনি বড় দুর্ব্বলমতি। পরেশবাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী। তাঁর তিনটি কন্যা—লাবণ্য, ললিতা ও লীলা। সুচরিতা নামে তাঁহার একটী পালিতা কন্যা ছিল। গোরার সহিত সুচরিতার বিবাহ হয় আর ললিতার সহিত বিনয়ের বিবাহ হয়।

কৃষ্ণদয়ালবাবু।

ইতিপূর্ব্বে যখন কমিসেরিয়েটের গোমস্তা ছিলেন, তখন হিন্দুর আচার-বিচার কিছুই মানিতেন না। পরে ইনি গোড়া-হিন্দু হন। তপ, জপ, পূজা, আহ্নিকে দিন কাটান। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই বাড়ীতে ডেকে এনে সেবা নিতেন। বাড়ীর একধারের একটী ঘরে আলাহিদা বাস করিতেন; স্বপাকে আহার করিতেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস ছিল। বাড়ীতে পণ্ডিত রেখে শাস্ত্রপাঠ করিতেন। আচারভ্রষ্ট লোককে বড় ঘৃণা করিতেন। এঁর স্ত্রীর নাম আনন্দময়ী। আনন্দময়ী গোরাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। গোরা এঁদের দুই জনকে পিতামাতা বলেই জানিত। বহুকাল গোরার জন্মকথা গোপন ছিল। কৃষ্ণদয়ালবাবু মৃত্যু সময়ে গোরাকে বলে যান যে, সে তার ঔরসজাত পুত্র নয়, তার পালিত পুত্র।

মহিম।

মহিম কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র! আনন্দময়ী তার সৎমা। মহিম কলিকাতার একটী আফিসে কায করে। মুখে সর্ব্বদাই পান চিবুচ্চে আর তামাক টান্‌ছে। মহিম বড় স্বার্থপর লোক—নিজের কথা একবারও ভোলে না। মহিমের বড় সাধ বিনয়কে তার জামাই করে। এই বিবাহের জন্য মহিম আনন্দময়ী ও গোরার কতই খোসামোদ করেচে। শশিমুখীর বিবাহ বিনয়ের সঙ্গে হ'ল না, হ'ল অন্য বরের সঙ্গে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ।

একবিংশ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৪। [৭ম সংখ্যা।

হিন্দু সমাজের মুখপত্র।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্।

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১॥০ টাকা।

হাওড়া, ৫ নং বেলকম্ব ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাকার-মূর্ত্তি পূজা।

আবার সম্বৎসর পরে এই শুভ দিনে, সাধের শরৎ সমাগমে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দময়ী বিশ্বজননী সর্ব্বশক্তিশ্বরী শ্রীশ্রীদুর্গার সাকার-মূর্ত্তির পূজা হইবে, সে আনন্দের দিনের আর বেশী বাকী নাই বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার আয়োজন করিতেছে। বাঙ্গালায় এই মূর্ত্তিপূজা যেরূপে এবং যতপ্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, ভারতের আর কোনও দেশে তেমন হয় না। আধুনিক সভ্য সমাজ এরূপ ভাবে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করার পক্ষপাতী নহেন, বিশেষতঃ যাঁহারা নানা প্রকার সম্প্রদায়ে যোগদান করেন—তাঁহারা ত আদৌ ইহাতে মত প্রদান করিতে স্বীকৃত নহেন। যাহা হউক, আমরা এই মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে, ইহার ভাল মন্দ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্যই অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক, মূর্ত্তিপূজা কি এবং কতদিন ইহা চলিতেছে। ধ্যান-ধারণ করিয়া বহু কষ্টে মনকে স্থির করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হইলেই কোন-প্রকার একটা মূর্ত্তির আবশ্যক, নতুবা সদা-বিচঞ্চল মন কাহাকে দেখিয়া স্থির হইবে—কাহার উপর সে আপনার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিয়া আপনার চঞ্চলত্ব হারাইবে? সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা হইল মন, সে ইচ্ছা না করিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম হয় না। রাজা অনুমতি করিলেই যেমন প্রজাগণ তাহার অভীষ্ট পূরণে যত্নবান হয়—সেইরূপ মন ইঙ্গিত করিবামাত্র সকল ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে থাকে। মন সুন্দর বস্তু দেখিবার নিমিত্ত চক্ষুকে হুকুম করিলে—সে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। মন ইঙ্গিত না করিলে চক্ষু কেবল চাহিয়া থাকে মাত্র, দেখিবার যে একটা সাফল্য তাহা সে প্রাপ্ত হয় না। কেবল ফেল্ ফেল্ করিয়া এক দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। মনের সহিত দেখিলে তাহার দেখা সার্থক হয়। আবার দেখিবার ইচ্ছা হইলে, যা তা জিনিস দেখিয়া কি মনের তৃপ্তি হয়? দর্শন সাধ মিটাইতে হইলে ভাল জিনিস দেখিলেই তবে তৃপ্তি হয়, দেখিবার সাধ মিটে। এইজন্যই মনের তৃপ্তি-সাধন ও স্থিরতা-সম্পাদন-অভিপ্রায়ে সাজান-গুছান একটী সাকারমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ধরিতে হয়। এখন দেখা যাক্—মূর্ত্তিপূজা কতদিনের,

ও তাহার অস্তিত্ব কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ধ্যান-মন্ত্র হইতেই মূর্ত্তি-কল্পনা হইয়া থাকে; নতুবা হিন্দু যা তা একটা মূর্ত্তি গড়ে না, তাহার পূজাও করে না। এই ধ্যান-মন্ত্র আমরা বেদ হইতেই পাইয়া থাকি; দেবদেবীর ধ্যান-মন্ত্র বেদ-গর্ভ-সম্ভূত—অতএব শাশ্বত সনাতন, মানবের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় নাই। বেদে যখন ধ্যান-মন্ত্র পাওয়া যায়, তখন মূর্ত্তি-কল্পনা বেদ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৈদিক যুগেও মূর্ত্তি-কল্পনা ছিল—তবে তখনকার মানুষ আমাদের মত ধর্ম্মহীন, সাধনাক্ষম ছিলেন না। তাহারা ধ্যান-মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা রাখিতেন বলিয়া এখনকার মত কাট, মাটি, খড়, দড়ি দিয়া মূর্ত্তি গড়িবার আবশ্যক হইত না। ধ্যান করিলেই সাধন-বলে, প্রভূত ধর্ম্মতেজে তাঁহারা সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে খাড়া করিয়া মনোময়-পুষ্পে, ভক্তি-চন্দন মাখাইয়া পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এখন আমরা পারি না বলিয়া খড়, মাটি, কাট, দড়ির আবশ্যক হয়। চণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই—ব্যষ্টি-শক্তির একত্র সমন্বয়ে ভগবতী দুর্গার উদ্ভব হইয়াছিল, সকল দেবতার সমষ্টি-শক্তিতে এই দুর্গামূর্ত্তি, এই তেজ-ময়ী মূর্ত্তি উদ্ভুত হইয়াছিলেন—কিন্তু আজগুবী হইলেন না। দেবতাগণ ঐ দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার ধ্যানেই ঐ শক্তি সমন্বয় করিয়াছিলেন বলিয়া অভীষ্ট-ফলদায়িনী মা আমার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে, তাঁহাদের নিকট মনোময়-রূপে, ধ্যানানুষ্ঠিত মূর্ত্তির অনুরূপে আবির্ভূতা হইয়া দানব সংহার করিয়াছিলেন। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগের কথা—তখন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পরিমিত ছিল। মানুষ তখন ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিত না—তাই তাহাদের ধ্যান করিবার শক্তি প্রদান করিলেই মা মূর্ত্তিময়ী হইয়া আপনি উদয় হইতেন। স্বারোচিস মন্বন্তরে—সত্যযুগে রাজা সুরথ ধ্যান-প্রভাব-বিশিষ্ট হইয়া, মনোময়ী মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াও সাকার-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, অসংখ্য বলি প্রদান করতঃ সকাম-ভাবে দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তারপর যখন যখন ক্রমশঃ ধর্ম্ম কম হইতে লাগিল, আমাদের মস্তিষ্কও তখন বিগড়াইয়া গেল—মনের চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্ম্মের দৃঢ়তা থাকিলে মন চঞ্চল হইতে পারে না—সে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় চিরস্থির ধীর-ভাবাপন্ন থাকে। যখন আমাদের এ ভাব নষ্ট হইল—ধর্ম্ম যখন একপাদ কমিয়া গেল, ঠিক সেই ত্রেতাযুগ হইতে এই মূর্ত্তিপূজা ভিন্ন প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ভগবান রামচন্দ্র তাই সে সময় রাবণ-বধের জন্য বিভীষণের পরামর্শে ঘটস্থাপন করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তার পর ধর্ম্মভাব আরও কমিয়া যাইলে, পট এবং খড়, মাটী, কাট, দড়ী লইয়া মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাকে নয়ন-মনোহর করিয়া সাজাইয়া পূজার ব্যবস্থা হইল। বাস্তবিক ইহা ছিল—বেদে ইহার ধ্যান-ধারণ ছিল—এক্ষণে তাহা নানাবিধ পদার্থের সাহায্যে মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে।

এই মূর্ত্তি-পূজাই বা প্রচলিত করিল কাহারা ? সাধকই সাধকের সাধনা-পথ সহজ-সাধ্য করিবার জন্য ইহার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নস্তরের সাধক ইষ্টদেবীর ধ্যান করিয়া জপে নিবিষ্টচিত্ত হইলে ক্রমশঃ হৃদয় মধ্যে কতকগুলি তেজ বা আলোক বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। সাধক গভীর তন্ময়তা-সহকারে যখন ক্রমে ক্রমে ঐ সকল তেজ একত্রিত করিতে পারেন—তখন ঐ তেজের বা আলোর মধ্যে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি আপনি ফুটিয়া উঠে ; তখন তাহার আর অন্য ইচ্ছা বা কামনা কিছু থাকে না ; মন সমাধীস্থ হইয়া অনন্যশরণ হইয়া ঐ মূর্ত্তির পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে। যোগ-বিশারদ যোগীর এ সমাধি বহুদিন থাকে—তাঁহারা ইহাকে ধারণা করিয়া বহুদিন রাখিতে পারেন। গৃহী বা অল্পশিক্ষিত সাধক তাহা বেশীক্ষণ পারে না বলিয়া সমাধিভঙ্গেই মনমরা, দিশেহারা হইয়া পড়ে। তাহাদের এই মনমরা অভাবের অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য হৃদয়স্থিত মূর্ত্তি বাহিরে প্রস্তুত করিয়া পূজা করে—ইহা কল্পিত মূর্ত্তি নহে। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া—স্বরূপের সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া তবে তাহারা খড়-মাটী দিয়া ঠিক ধ্যান-মন্ত্রের অনুরূপ রূপ গড়িয়া, মূর্ত্তি-পূজা করে ; পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ হইলে আবার হৃদয়ের মূর্ত্তি— হৃদয-সমুদ্রে ভক্তির অতল-জলে ডুবাইয়া রাখে--ইহাই বিসর্জ্জন। যাঁহারা স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছে, তাঁহাদের দ্বারাই এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদের ঠিক ঠিক মন্ত্র অনুসারেই ইহা নির্দ্দিষ্ট। অতএব বাঙ্গালীর এ মূর্ত্তি-পূজায় দোষ কি ? এই মূর্ত্তি-পূজাই ত বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ; আর ইহার জন্যই ত তাহারা জগতীতলে ধন্য ও বরেণ্য। মানুষ যখন বালক থাকে, জ্ঞান-বুদ্ধি যতক্ষণ তাহার সম্যক্ পরিস্ফুট না হয়, ততক্ষণ সে মা বই আর কিছু জানে না, মা ছাড়া থাকে না—তাহার মাকে অন্য কেহ মা বলিলে, তাহার কোলে বসিলে, তাহার সহ্য হয় না—মায়ের অংশ কাহাকেও দিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাহার মা আর কাহার মা হইবে—এ ভাব তাহার প্রাণে সহ্য হয় না—ইহাই সাধকের প্রারম্ভাবস্থা কিন্তু যখন সে এই পার্থিব মাকে জগতের মা বিশ্বেশ্বরী বলিয়া ভাবিতে শিখে, যখন সে সমস্ত দ্রব্য মা-ময় দেখিয়া তাহার মাকে অণু হইতে অণু এবং মহৎ হইতেও মহান্‌ভাবে ভাবিতে পারে—তখন আর তাহার সে সঙ্কীর্ণতা, সে দুর্ব্বলতা, সে পক্ষপাতিতা থাকে না, তখন সে একার ক্ষীণকণ্ঠে আর মাতৃআহ্বান শুনিতে ভালবাসে না—সে শ্রবণ-বিঘ্নকর, ক্ষীণ অস্ফুটধ্বনী যেন তাহার কর্ণে আর প্রবেশ করে না—তখন সে কোটীকণ্ঠে মাতৃনামধ্বনী শুনিতে ভালবাসে, সেই বিশ্ববিকম্পনকারী ধ্বনী যেন তখন তাহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করে, হৃদয়-তন্ত্রী যেন তাহার গুরুগম্ভীর শব্দে সঘনে বাজিয়া উঠে ; এই সিদ্ধ অবস্থাতেই সাধক তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকান মাতৃমূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া তাহার ধ্যান-ধারণা অনুসারে সকলে মিশিয়া পূজা করিতে থাকে, সকলেই মিলিয়া সেই ভবারাধ্য চরণে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলী প্রদান

করে। ইহাই সাধকের সাধকত্বের পূর্ণ পরিচায়ক—এ সময় আর লুকোচুরী নাই; নানা বিঘ্ন ঘটিবার ভয়ে এখন আর তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু করিতে হয় না—তখন বিঘ্ন-বিনাশিনী মায়ের কৃপাবলে সে সকল বাধাবিঘ্ন এড়াইয়াছে। তাই সে হৃদয়ের গুপ্তধন বাহির করিয়া সকলকে দুই হাত তুলিয়া বিলাইয়া দেয়—আপনি পবিত্র হয়—সকলকে পবিত্র করে—ইহাই হিন্দুর সাকার মূর্ত্তির কল্পনা। যে মাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে—সম্যক্‌ভাবে তাহার হইতে পারিয়াছে, সেই এই সাকার-মূর্ত্তির কল্পনাকারক—অন্যে নহে; অন্যে বা অজানা লোকে করিলে—ইহা কি আবহমানকাল এরূপ দৃঢ়তার সহিত জগতে প্রচলিত থাকিত। এই জন্য বলি—এই মূর্ত্তি কল্পনাই বাঙ্গালীর সার সত্য, ইহাতেই তাহাদের মহত্ত্ব। কাষ্ঠের মধ্যে যেন প্রচ্ছন্নভাবে অগ্নি নিহিত থাকে—এই মূর্ত্তির ভিতরও মা আমার তেমনিভাবে বিরাজিত, শক্তিবলে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলেই তাহাতে যেমন অগ্নির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—শক্তি থাকিলে এই মূর্ত্তির মধ্যেও ঠিক তেমনিভাবে তুমি মাকে পাইতে পার, তাহার অমিয়মধুর করুণারাশি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পার। মনের সহিত মন্ত্রের ভাব উপলব্ধি করিয়া তুমি মূর্ত্তিতে নিজ প্রাণ-সংযোগ কর দেখি—তোমার প্রাণ দিয়া মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে এই মূর্ত্তি তোমার অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তুমি নিজে যখন প্রাণহীন হইয়া পূজা কর, তখন মূর্ত্তি প্রাণময়ী হইবে কিসে? তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কর্ত্তা ত তুমি, তুমি কোথায়—আর তোমার শক্তি কোথায়? তবে কেমন করিয়া তোমার শক্তি জাগিবে? মা তোমার সহিত কথা কহিবে? মা নির্গুণ বা নিরাকারা নহেন—তাহার রূপগুণ নাই—ইহা অসম্ভব, যাহা তাঁহার নাই—জগত তাহা পাইল কোথা হইতে; তিনি সমস্ত রূপ এবং গুণের আধার—তাহার এত রূপগুণ যে আমাদের সামান্য মস্তিষ্কে তাহা ধারণা হয় না—তাই অর্জ্জুন হেন সাধক ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি দর্শনে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রূপগুণ ভিন্ন পূজা-উপাসনা হয় না। জন্ম জন্ম ধরিয়া এইরূপ রূপ-গুণের উপাসনা, সাকার ও সগুণ-মূর্ত্তির সাধনা, সকামভাবে বিশ্বকর্ত্রীর নিকট তোমার আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বস্তুর প্রার্থনা কর। দিবার কর্ত্তা তিনি, প্রার্থিত বস্তুদানে তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার কর্ত্তা তিনি, সময় হইলে আবার নিবৃত্তি দানও তিনি করিবেন। বৃক্ষস্থিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সময় হইলেই আপনাপনি তোমার মনোবৃক্ষ হইতে সকাম-সাকার প্রবৃত্তি আপনি ঝরিয়া পড়িবে—তখন টানিয়া বুনিয়া কোন কাজ করিতে হইবে না—কোন প্রতিমা গড়িতে হইবে না। মন স্থির হইলেই বেদোক্ত মন্ত্র-মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে আপনিই প্রতিফলিত হইবে। যতদিন না তাহা পারিতেছ,যতদিন না তোমাদের সেই পূর্ব্ব শক্তি আবার ফিরিয়া পাইতেছ—ততদিন সাধকের এই নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া ধন্য হও। সম্মুখে শুভ কার্ত্তিকের সপ্তমী তিথি, বিশ্বজননীর আগমন সূচিত করিয়া তোমাকে কহিতেছে—বাঙ্গালি! মায়ের নামে প্রাণের প্রত্যেক পরতে পরতে—

ভক্তি-অর্ঘ্য স্থাপনা কর, মঙ্গলময়ীর মঙ্গল আবাহন-গীতি গাহিয়া হৃদয়-মন পবিত্র কর. দাও বাঙ্গালি! অঙ্গনে আলিপনা, বিশ্বধাত্রী, বিশ্বকর্ত্রী মা তোমাব ত্রিতাপতপ্ত মন-প্রাণ সুশীতল কবিবেন বলিয়া মর্ত্তো আসিতেছেন। হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট খুলো, মন-প্রাণ মা-ময় করিয়া মায়ের চরণতলে অগ্রসর হইয়া বলঃ—

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বাস্বার্থী হরেদে'বি নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

মা! সর্ব্বস্বরূপে তোমার সর্ব্বস্বার্থী হরণের জন্য আসিযাছেন। ত্রিভূবনের আরাধ্যা দেবী আজ তোমার পর্ণ-কুটীরে আসিয়া স্বর্গের মণি-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন,ঢাল বাঙ্গালি! ভক্তি-গঙ্গাজল,নয়নাশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে বলঃ—

"গুণাত্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

বাঙ্গালি! তোমার অদৃষ্টের কি আর তুলনা আছে? এইরূপ শুভাদৃষ্ট লাভ করিয়াই যে তুমি চারিযুগ অমর হইয়া রহিয়াছ।

সম্পাদক।

আত্মজ্ঞানের উপায়।

এই অসার অপার দুস্তর সাগর-স্রোতে ভাসমান ও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক নামক তাপত্রয়ে নিরন্তর প্রপীড়িত হইয়াও দেখিতে পাওয়া যায়, জীবের সংসারাসক্তির কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। পশু-গণ শস্যক্ষেত্রে যাইয়া শস্য ভক্ষণ করিলে ক্ষেত্র-স্বামী কর্ত্তৃক প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াও যেমন আবার সেই শস্যক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়, শস্য ভক্ষণের লোভ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না. মানব প্রকৃতিও ঠিক তদনুরূপ। প্রতি মুহুর্ত্তে লোক তাপের তীব্র যন্ত্রণায় মূহ্যমান হইয়াও নশ্বর পুত্র মিত্রাদি ও নিজের দেহের প্রতি মমতার কিছুমাত্র হ্রাস করিতে পারে না বরং উত্তরোত্তর মমতা বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও অর্থাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্বাপহরণেও পরাঙ্মুখ নহে। ভোগ-বিলাসের বিষময় ফল উপভোগ করিয়াও ভোগের বিরাম কিছুতেই হয় না। কেন এমন হয়? হে মানব! ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ! তোমাকে ভগবান সকলই দিয়াছেন, কোনই অভাব তোমার রাখেন নাই, তত্রাচ তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"যদধাতু মতো ব্রহ্মণ্‌ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে তথা॥"

[২য় স্কন্ধ, ৮ম অঃ ৬]

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জীব ভূতাদি জড় পদার্থের অতীত, অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ ঘটে, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে কি না, তাহা সবিশেষ আমাকে বলুন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ কোনও সময়ে ব্রহ্মার নিকটে আগমন করতঃ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"গুণেষ্বা বিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যং সংত্যাগো মুমুক্ষোরতি তিতীর্ষোঃ॥"

[১২শ স্কন্ধ, ১৩শ অঃ ১৭]

হে প্রভো! রাগের বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত স্বভাবতঃ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় এবং বিষয়ও বাসনারূপে চিত্তমধ্যে প্রবেশ করে, ইহা সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্য হইতেছে; অতএব যাহারা এই সংসার-জলধিকে অতিক্রম করিতে বাসনা করেন, তাদৃশ মুমুর্ষুগণের এই চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর বিশ্লেষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে—তাহাই বর্ণনা করুন।

ভগবান কপিলদেবের জননী দেবহূতি, পুত্র কপিলদেবকেও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা ঃ—

দেবহূতি উবাচ।

"নির্ব্বিণ্ণা নিরতাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ।
যেন সংভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥"

হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভো পরমেশ্বর! বিষয় সম্ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিসাধন করিলে, নরকাদি দুঃখের দ্বার প্রশস্ত হয় মাত্র, আমি এতাবৎ ভোগ লালসায় নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছি, আর যদি নিরন্তর এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের চরিতার্থতার জন্য অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমি ঘোর অন্ধকারপূর্ণ অজ্ঞান নরকেই নিমগ্ন হইব।

"অথমে দেব সম্মোহমপাক্রোষ্টুং ত্বমর্হসি।
যোঽবগ্র হোঽহং মমে তিত্যো তস্মিন্
যোজিতস্ত্বথা ॥
তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্য
সংসারতরোকুঠারং।
জিজ্ঞাসয়া প্রকৃতেঃ পুরুষস্য নমামি
সদ্ধর্ম্মাবিদাং বরিষ্ঠং ॥"

অতএব হে ভগবান! আপনি আমার এই ঘোর অজ্ঞানকে অপনোদন করুন। দেখুন! জীবের দেহাদিতে "আমি" ও "আমার" বলিয়া যে আসক্তি জন্মে তাহা আপনারই মায়া প্রভাব মাত্র! প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দ্বারা ভক্তগণের সংসার-তরুর মূলোচ্ছেদক মোক্ষ লাভের উপায়াভিজ্ঞ সর্ব্ব শরণ্য, শ্রেষ্ঠ পরম কারুণিকের শরণ গ্রহণে আমি প্রণাম করিতেছি।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিপরবশ হইয়া কেবল মাত্র এ সংসারে আত্ম সুখ সাধনই মানব-জন্মের উদ্দেশ্য নহে। মানব প্রবৃত্তিপরায়ণ বটে, কিন্তু ভগবান সেই প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিবার শক্তিও মানবকে দিয়াছেন। সেই ভগবদ্দত্ত শক্তির যদি যথোপযুক্ত ব্যবহার না হয়, মানব যদি নিরন্তর প্রবৃত্তি-মার্গে বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া সংসারাসক্তি এত প্রবল হয়, যে পরার্থপরতা বৃত্তি আর আদৌ থাকে না; ঘোর স্বার্থপর হইয়া মানব পশুতুল্য হইয়া দাঁড়ায় এবং এই সংসার তাহার পক্ষে অসীম দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির সংযমই "মানবধর্ম্ম"। আর্য্য জাতির যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই প্রবৃত্তি সংযমের উপায় বিধান করিয়া কিরূপে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানব স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া যদি আত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব অনুশীলন করে, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তি সংযত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এ সংসার মানবের কার্য্যভূমি, জন্মগ্রহণ করিয়া মানব কার্য্য না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না,

অথচ কার্য্যই মানবের ইহ ও পরকালের সুখ দুঃখের হেতু স্বরূপ। কার্য্যই মানবকে দেবতা তুল্য করে, কার্য্য প্রভাবেই আবার মানব পশু-তুল্যও হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু স্বভাবতঃ মানব পশুধর্ম্মপরায়ণ, স্বার্থপর, সুখলিপ্সু। মানবের এই পাশব-প্রবৃত্তির নিবৃত্তিসাধন, শাস্ত্রশাসন ভিন্ন আর কিছুতেই হইবার নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া মানব পরকালে বিশ্বাসী হয়. পরকালে বিশ্বাস হইলে, মানবের পাপকার্য্য করিতে ভয় হয়; সুতরাং ভগবৎ কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে "মানুষ" করে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীব নিস্তারের জন্য মহাজনগণ যুগে যুগে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়া ধর্ম্মের জটিল বিষয় সমস্ত মীমাংসা করতঃ শাস্ত্র-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ জনগণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উন্মেষের পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া পরম-শান্তি সুখেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতাই তাহার একমাত্র কারণ। আজ সেই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র হতাদৃত, মানব কার্য্যভ্রষ্ট, নাস্তিকতা-পাপের প্রবল স্রোত আমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের শক্তি হরণ করিতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আর্য্য-শাস্ত্রকার মহাজনগণের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার দুই একটী প্রশ্ন মাত্র উল্লেখ করিয়া, প্রশ্নগুলি যেরূপে মীমাংসিত হইয়াছিল—তাহাই উল্লেখ করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রশ্নগুলি আমরা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার যেরূপ মীমাংসা হইয়াছিল, তাহাই উল্লেখ করিব। প্রায়োপবেশনোপবিষ্ট মহাভাগবৎ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান শুকদেব কহিলেনঃ—

শ্রীশুক উবাচ।

"আত্মামায়ামৃতে পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টু বিরাঞ্জসা ॥
বহুরূপ-ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রসমানো গুণেষ্টস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥"

[২য় ৯ম অঃ, ১ | ২]

শুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ। জীব, প্রকৃতি প্রভৃতি যাবতীয় জড়তত্ত্বের অতীত, জ্ঞানময় ও অনুভব-স্বরূপ। সুতরাং যেমন অজ্ঞান ব্যতীত স্বপ্ন দর্শন বা স্বপ্নদৃশ্য পদার্থকে সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, সেইরূপ জগৎ রচয়িতার অজ্ঞানরূপা অচিন্ত্য মায়া ব্যতীত জীবের দেহ সম্বন্ধ ঘটে না। জীব একরূপ হইয়াও বিচিত্র মায়ার বশে দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেবতীর্থ আদি বিবিধরূপে এবং বাল্য-যৌবনাদি বিবিধভাবে পরিণত হইয়া আত্মাভি-মান (আমি জ্ঞান) ও বিষয়াভিমান (আমার জ্ঞান) করিয়া থাকে।

"শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃনাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং ॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবাচার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্ব ভরণেনবা ॥
দেহাপত্য কলত্রাদি ষাত্মসৈন্যেষ্ব সৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্ত নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতে ॥"

লোকেরা গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। সুতরাং হে

রাজেন্দ্র, তাহাদিগের ন্যায় মনুষ্যের সহস্র সহস্র বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার আছে। গৃহস্থ রাত্রি-কালে নিদ্রা এবং স্ত্রীসহবাসে, দিবাভাগে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা এবং পরিবার-প্রতিপালনে বৃথা জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। আত্ম-সৈন্য স্বরূপ স্বীয় শরীর, পুত্র ও স্ত্রী কিছুই চিরস্থায়ী নহে; কিন্তু অনার্য্য লোকেরা এই সকল বিষয়ে এত আসক্ত হয় যে, পিত্রাদির মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও নিজের ও প্রিয়-বস্তুর নিধন সম্যক্ দেখিতে পায় না।

তাহার পর সনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নোত্তর কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই উল্লেখ করিব। পুত্র-গণের প্রশ্ন শুনিয়া ব্রহ্মা কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না, এবং মনে মনে বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। বিষ্ণু হংসরূপে তথায় আসিয়া ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন যথা :—

শ্রীহংস উবাচ।

"বস্তু নো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্ব্বা মেক আশ্রয়॥
পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভোহ্যনর্থকঃ॥
মনসা বচসা দৃষ্টা গৃহ্যতেহন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোহন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥
গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥
গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্ত প্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥
বিদ্বানির্বিদ্যা সংসার চিন্তাং তুর্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥
অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোহর্থবিপর্য্যয়ং॥"

হংস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! পরমার্থ-ভূত আত্মস্বরূপ জীবতত্ত্বের অবগতির জন্য যদি আপনারা "কে আপনি" বলিয়া প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে চৈতন্যাংশে আত্মার একত্ব বিধায়, আপনাদের এরূপ প্রশ্ন কখন সঙ্গত হয় না। এবং জীব মাত্রেরই আত্মার কোন ভেদ না থাকায়, কোন পার্থক্য অবলম্বনে যে আমি আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব, তাহারও নিরূপণ হয় না। দেব-মনুষ্যাদি শরীরেও যখন পঞ্চ মহাভূত সমানভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, তখন আপনাদিগের "কে, আপনি" বলিয়া প্রশ্ন কি নিরর্থক বাগাড়ম্বর নহে? মন বাক্য চক্ষু বা যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন বস্তুকেই গ্রহণ করা যায়, সে সমস্তই একমাত্র আমি; আমি ভিন্ন জগতে অন্য কোন বস্তুই নাই, ইহাই বিশেষ বিচার পূর্ব্বক অবধারণ করুন। হে পুত্রগণ! বিষয়ে চিত্ত আসক্ত হয় এবং চিত্তে বিষয়-রস প্রবেশ করে সত্য কিন্তু বিষয় ও চিত্ত এই উভয়ই একত্র মিলিত হইয়া মদীয় অংশসম্ভূত জীব-তত্ত্বের ভোগায়তন দেহ নির্ম্মিত হয়; কেবল দেহ কখন জীবের স্বরূপ নহে। অতএব বিষয় সম্ভোগ দ্বারা তৎসংস্কার নিবন্ধন চিত্ত বিষয়ের অভিমুখেই ধাবিত হয় এবং বিষয়রসও বাসনা-রূপে চিত্তকে আশ্রয় করে, সুতরাং মদীয় স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই এই উভয় চিত্ত এবং বিষয়ের হস্ত হইতে অব্যা-হতি লাভ করা যায়। দেহাদিকেই যে 'আমি' বলিয়া বোধ হয় এই অভিমানেই জীবের বন্ধন ঘটিয়া স্বকীয় পরমার্থ স্বরূপের অপ্রতীতি জন্মে, সুতরাং পরমানন্দ স্বরূপ হইলেও জীব আপ-

নাকে দুঃখ প্রভৃতি প্রকৃতির গুণে উপলব্ধি করে। কিন্তু স্বীয় বন্ধনের কারণ অবগত হইয়া বিষয় হইতে চিত্তকে বিনিবৃত্ত করতঃ তুরীয় স্বরূপ আমাতে জীব অবস্থান পূর্ব্বক যখন দেহাভিমান ও ভোগচিন্তায় বিরত হয়, তখনই তাহার কৃতার্থতা হয়—সন্দেহ নাই।

অতঃপর জননী দেবহূতীর প্রশ্নে ভগবান কপিলদেব যাহা উত্তর দিয়াছিলেন—তাহাই উদ্ধৃত করিলাম, যথা ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ।

"চেতঃ খলস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনোমতং।
গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥
অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখম্ সুখং সমং ॥"

অর্থাৎ দেখ! জীবের নিজ চিত্তই তাহার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। বিষয়-নিবিষ্ট চিত্তের দ্বারা বন্ধন এবং পুরুষোত্তমে আকৃষ্ট চিত্তের দ্বারায় জীবের মুক্তিলাভ হয়। দেহাদি ইন্দ্রিয়-বর্গে আত্মবোধ এবং স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে আমার-বোধ জন্মে তাহারই প্রভাবে জীবচিত্ত কাম-লোভাদি দ্বারা মলিন হইয়া যায়। মন যখন সেই মালিন্য-দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখা-দিতে অভিভূত না হয়, তখন তাহাকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল বলা যায়।

"প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষোনাজ্যতে প্রকৃতিগুণৈঃ।
অবিকারাদ কর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥
স এষ যর্হি প্রকৃতির্গুণেষ্বভিবিসর্জ্জতে।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
তেন সংসার পদবীমবশোঽভ্যেত্য নিবৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥
অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেন বিরক্ত্যাচ্য নয়েদ্বশং ॥

৩য় স্কন্ধ, ২৭ অঃ ১-৪।

হে জননি! নভোমণ্ডলবর্ত্তী দিবাকরের প্রতিবিম্ব ভূতলস্থ জলে নিপতিত হইয়া তথায় দ্বিতীয় সূর্য্যের ভাব হয় বটে, কিন্তু জলনিষ্ঠ চাঞ্চল্যে আকাশের সূর্য্য যেমন চঞ্চল হয় না, সেইরূপ জীবরূপী পুরুষ চৈতন্য প্রকৃতি কার্য্য দেব মনুষ্যাদি বিচিত্র দেহে উপলব্ধ হইলেও প্রকৃতির গুণ পুণ্য, পাপ বা সুখ দুঃখাদি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। কারণ পুরুষ রাগ লোভাদি গুণ বিকারের অতীত। প্রকৃতির অতীত এই পুরুষই আবার যখন অহঙ্কারোৎ-পন্ন দেহ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণাদিতে আপ-নার স্বরূপ চিন্তনে নিজের পরম ভাব বিস্মৃত হয়, তখনই প্রকৃতির গুণ শব্দাদি বিষয়ে ও দেহাদিতে আসক্ত হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি কৃতকর্ম্মে "আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা"রূপে অভি-ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং এক কর্ত্তৃত্বাভিমান নিবন্ধন প্রসঙ্গ ক্রমে উপনীত পাপ ও পুণ্যরূপ দেহাদি কৃত কর্ম্মদোষের অধীন হইয়া জীব পরমানন্দ লাভে অপারক হইয়াছে এবং উৎ-কৃষ্ট বা অপকৃষ্ট দেব-মনুষ্য-তীর্য্যগাদি যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার-ভোগ অনুভব করিয়া থাকে। একদিকে ইন্দ্রিয়গণ অপরিতৃপ্তের ন্যায় নিরন্তর বিষয় পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং চিত্তও সতত বিষয় পথে আকৃষ্ট হইতেছে। অতএব ভগবদ্ভক্তি ও তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তকে বশীকৃত করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নগুলির যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, সকল উত্তরগুলির মর্ম্ম একই প্রকার। সকলেই বলিলেন যে "এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্রই আছেন, কার্য্য-কারণাত্মক সমগ্র জগত তাঁহার শক্তি-বিকাশমাত্র। এই শক্তিকেই অবিদ্যা বা মায়া বলা যায়। এই অনাদি অবিদ্যা জনিত ভ্রান্তি-বশতঃ জীব, দেহাদি উপাধির সম্বন্ধ নিবন্ধন আপনাকে সুখী ও দুঃখী মনে করিয়া সংসার দশায় জন্ম, জরা ও মরণাদি মহাদুঃখের অধীন হইয়া আছে। অবিদ্যা-প্রভাবে জীবের এই মিথ্যা-জ্ঞান, এবং তন্নিবন্ধন জীবের যে সংসার-বন্ধন, একমাত্র বিদ্যা প্রভাবে জীবের এ ভ্রম জ্ঞান অপনোদিত হইলেই জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ। এখন কি উপায়ে এই অবিদ্যার ধ্বংস হইতে পারে? ভগবান কপিলদেব সে সম্বন্ধে নিজ জননী দেবহূতিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমরা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম! যথা ঃ—

শ্রীভগবান উবাচ।

যোগস্য লক্ষণং বক্ষে সবীজস্য নৃপাত্মজে।
মনো যে নৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথং॥

ভগবান কপিলদেব জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজনন্দিনি! যে উপায়ে মানব-মন কাম-ক্রোধাদি পরিহারে বিশুদ্ধ হইয়া ভগবানের স্বরূপ চিন্তনে নিশ্চিন্ত হয়, আমি তোমাকে সে সজীব সমাধির লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"স্বধর্ম্মচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনং।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চণং॥
গ্রাম্য ধর্ম্ম নিবৃত্তিশ্চ মোক্ষ ধর্ম্মরতিস্তথা।
মিত মেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্ত ক্ষেম সেবনং॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থ পরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায় পুরুষার্চ্চনং॥

* * * * * *

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভিমনো দুষ্টমসৎপথং।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জাত শনকৈর্জ্জিত প্রাণোহ্যতন্দ্রিত॥"

৮ম স্কন্ধ, ২৯ অঃ, ১-৭।

অর্থাৎ যথাশক্তি স্বায় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিরুদ্ধ ও বিজাতীয় ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, প্রারব্ধবলে প্রাপ্ত অন্নাদিতে সন্তোষ, আত্মজ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তিগণের যথোপযুক্ত সেবা ও আরাধনা, ত্রিবর্গ সাধক গ্রাম্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদাসীন থাকা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মোক্ষ ধর্ম্মে অনুরক্ত, পরিমিত পরিমাণে পবিত্র ভোজন, নিত্য নির্জ্জন ও নিরত্যয় স্থানে বাস, অহিংসা, সত্য, অবলম্বনে পরাস্বাপহরণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের অধ্যয়ন, মন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতার পূজা।

ভগবান কপিলদেব জ্ঞানী ও যোগীপুরুষদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বলিলেন। অতঃপর ভক্তি পথাবলম্বিদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বলিতেছেন।

"নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেন মহীয়সা।
ক্রিয়া যোগেন শস্তেন নাতি হিংস্রেন নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্য দর্শন স্পর্শ পূজাস্তুত্যভিবন্দনৌ।
ভূতেষু মদ্ভাবনা সত্ত্বেনাসঙ্গমেবচ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানমনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নাম সংকীর্ত্তনাচ্চমে।
আর্জ্জবেনার্য্য সঙ্গেন নিরহং ক্রিয়য়া তথা॥"

অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীর্য্যবান শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান, যথোপযুক্ত দানাদি,বৈধ হিংসা ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে অহিংসার অনুশীলন, মদীয় প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শ. স্তুতি ও বন্দনাদি দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য। জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সম্মান, গুণহীন জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, সমতুল্য ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্যস্থাপন, অহিংসা, যম, নিয়ম, ও শৌচাদি, নিত্যকর্ম্ম মোক্ষশাস্ত্রের অনুশীলন, আমার নামসংকীর্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ এবং অভিমানাদি পরিত্যাগ।

"মদ্ধর্ম্মনো গুণৈ রতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুত মাত্র গুণং হিমাং॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিত সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্তঃ কুরুতে হর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চং ভজতে মৌঢ়াদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষত পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্ন দর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তি মৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানমে।
নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরঃ মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেস্ববস্থিতং॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মানুরাগী পুরুষগণ এতাদৃশ গুণগ্রামের পরিশীলনে পবিত্রচিত্ত হইয়া মদীয় গুণ এবং মধুর লীলাবার্ত্তা শ্রবণে আকৃষ্ট হন এবং অনায়াসে আমাকে লাভ করেন। আমি অন্তর্যামী এবং অধিনায়করূপে জীব মাত্রেরই অন্তরে সদা অবস্থিত থাকি, কিন্তু অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ মৎস্বরূপ উপেক্ষা করিয়া যে সকল সংসারী মানব প্রতিমার পূজা করে, তাহাদের অর্চ্চনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সর্ব্বভূতের অন্তরে সর্ব্বান্তর্যামী প্রত্যাগাত্মভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে অবলোকন না করিয়া, মূর্খতাবশতঃ যাহারা প্রতিমাকেই পরম উপাস্যজ্ঞানে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের সে অর্চ্চনা কেবল ভস্মে আহুতিপ্রদান করা হয় মাত্র। দেহাদিতে অভিমানবশতঃ নষ্টদৃষ্টি নরগণ ভেদজ্ঞানে ভূতবর্গের প্রতি বৈরতানিবন্ধন পরকীয় শরীরের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা আমারই দ্বেষ করিয়া থাকে এবং এতাদৃশ আচরণে তাহারা কখনই চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারে না। হে সর্ব্বদোষ বর্জ্জিতে! মানবগণ উত্তম মধ্যম নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহে এবং বহু পরিশ্রমে প্রতিমাপূজার উপলক্ষে আমারই অর্চ্চনা করে বটে, কিন্তু যদি তাহাদিগের মনোমধ্যে জীবগণের প্রতি ওরূপ দ্বেষ-ভাব থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের উপর কখনই সন্তুষ্ট হই না। কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে যে পর্য্যন্ত মানব নিজ হৃদয়মন্দিরে নিরন্তর অবলোকন করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি অর্চ্চনা অবলম্বনে আমার পূজা করা তাহাদিগের পক্ষে বিধেয়।

"ততোবর্ণাশ্চ চত্বাবস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।

ব্রাহ্মণেম্বপি বেদজ্ঞো অর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান স্বধর্ম্মকৃত।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥" *

অর্থাৎ এই মানবকুলের মধ্যে যাহারা বর্ণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত তাহারা সাধারণ মনুষ্য জাতীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, বেদাধ্যায়ীর মধ্যে বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। সামান্য বেদার্থ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে যিনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন মীমাংসক তিনিই আদরণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সংশয়চ্ছেত্তা মীমাংসকও যদি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে সতত মনোযোগী থাকেন, তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক আদরণীয় এবং পূজ্য। এই সকল লোকের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ অন্যের প্রতি কোন প্রকার বিদ্রোহাচরণ না করিয়া কেবল নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনে ভগবানের অর্চ্চনা করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

ভগবান কপিলদেব ভক্তি-পথাবলম্বী জ্ঞানী এবং যোগী-জনগণের কার্য্য সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে,জ্ঞানী, যোগী অথবা ভক্ত সকলকেই বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে. বর্ণাশ্রমকে অতিক্রম করিয়া যে কোন সাধনা করা হউক না কেন সকলই পণ্ডশ্রম মাত্র। বর্ণাশ্রম বিধি-বোধিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারাই ক্রমশঃ বিষয়-বাসনা পরিহারপূর্ব্বক শান্ত গুণাবলম্বনে ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পন করিতে সক্ষম হওয়া যায়, এবং সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি হয়, এ সংসারে কাহাকেও মিত্র অথবা শত্রুজ্ঞান থাকে না, অতএব বর্ণাশ্রমই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্বর্গ বা মুক্তির একমাত্র উপায়।

এক্ষণে আর একটী বিষয় বিচার করা আবশ্যক। প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেব দুইবার দুই কথা বলিয়াছেন যে, "যাহারা মূর্খতাবশতঃ প্রতিমাকেই পরম উপাস্যজ্ঞানে অর্চ্চনা করে তাহাদিগের সে অর্চ্চনা ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয় মাত্র।" এই কথাতে যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে প্রতিমা-পূজা নিরর্থক, বা কল্পনা মাত্র। কারণ কপিলদেব আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে মদীয় প্রতিমার দর্শন, স্পর্শ, পূজা স্তুতি ও বন্দনাদি দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং ইহাই প্রতিমা-পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সূর্য্যদেবকে ধারণা করিতে হইলে, যেমন দর্পণ অথবা জল মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব দর্শন করা প্রয়োজন, চিরকালই যদি এইরূপ দর্পণ অথবা জল লইয়া অতিবাহিত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সূর্য্য-দর্শন হওয়া কদাচ সম্ভব নহে; সেইরূপ প্রতিমাকে, কেবলমাত্র প্রতিমা বলিয়া পূজা করিলে কোন ফলই হইবে না। পরম ভক্তিসহকারে, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে, প্রতিমাতে তৎস্বরূপে চিন্তনীয়, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অনুসন্ধান করিয়া, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে একমাত্র তিনিই অধিষ্ঠিত ইহাই চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহাই প্রতিমা-পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

* শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীকৃত অনুবাদ ও আভাস।

শরতে বঙ্গ।

(গল্প)

যে দিন অন্তিম-শয্যায়-শায়িত প্রিয়তমা ভার্য্যা সুরবালাকে মহেন্দ্রনাথ শ্মশানের চিতাভস্মে পরিণত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সেদিন তাঁহার আর সংসারের প্রতি কোন টান রহিল না, সংসার যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত-কন্দরে বিধাতা যে দৃঢ়-বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, সেটীর কথা তখন তাহার মনে উদয় নাই। কালের গতিপ্রভাবে যখন দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল এবং শোকের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন তাঁহার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা আনন্দময়ী তাঁহাকে যেন সংসারের সহিত আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

মহেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেন, এখন পেন্সন লইয়া শেষ জীবনের শান্তি উপভোগ করিবার মানসে বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু বিধাতা বাম, তাই তাঁহার ভাগ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত দুঃখের ভার চাপাইয়া দিলেন। মহেন্দ্রনাথ চাকরী করিয়া বেশ সঙ্গতি করিয়া লইয়াছিলেন। অনেক জায়গা, জমী, পুকুর, বাগান প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছিলেন। পাড়া প্রতিবেশীরা জানিত, মহেন্দ্রনাথ একজন ধনী লোক। শুনিয়াছি— ব্যাঙ্কেও না কি তাহার অনেক টাকা জমা আছে।

মহেন্দ্রনাথ যেমন কন্যা আনন্দময়ীকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন, আনন্দময়ীও সেইরূপ মাতৃহারা হইয়া পিতার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। আনন্দময়ীর বয়স ১০ বৎসর হইলেও সংসারের অনেক বিষয় সে এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কিসে তাহার পিতার মন প্রসন্ন থাকে, কিসে তাঁহার কোনরূপ অযত্ন না হয়,—এই সব বিষয়ে আনন্দময়ী সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। পিতা স্নান করিতে যাইবেন, আনন্দময়ী গামছা, তেল যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছে; স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িবেন, আনন্দময়ী শুষ্ক কাপড়খানি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিতা ভাত খাইবেন, আনন্দময়ী সম্মুখে বসিয়া পাখা হাতে করিয়া ব্যজন করিতেছে। পিতার পা টিপিয়া দেওয়া, স্বহস্তে তামাক সাজা—এ সমস্ত কায আনন্দময়ীর ছিল। মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেও আনন্দময়ী তাহা শুনিত না। সে বলিত,—"বাবা, আমার ত কোন কষ্টই হয় না, আপনি কেন বারণ করেন? মা ত চলে গেছেন, আমি কি আপনার সেবাও করতে পাব না?" বলিতে বলিতে যখন আনন্দময়ীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তখন মহেন্দ্রনাথ আর কোন কথা বলিতে পারিত না; কেবল এইরূপ কন্যা-রত্ন তাহার ভাগ্যে দেওয়াতে মহেন্দ্রনাথ মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতেন।

কিন্তু এক এক সময়ে যখন তাহার মনে হইত যে, এ সুখও বিধাতা তাহার ভাগ্যে বেশী দিন লেখেন নাই; আনন্দময়ীর বিবাহ

দিতে হইবে, সে ত তাহার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, তখন বৃদ্ধ যেন ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন, তাহার মাথা ঘুরিয়া পড়িত, সমস্ত যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হইত। মহেন্দ্রনাথের আর কোন সন্তান-সন্ততি নাই; শেষ বয়সে এই কন্যা-রত্ন লাভ করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিতব্যের গর্ভে এমন এক দিন নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট আছে, যেদিন তাহাকে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধ সেই দিনের কথাই মনে করিয়া যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিতেন। হায় ভাগ্য!

(২)

দিন ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না; সুখে হউক, দুঃখে হউক, যে রকমেই হউক, দিন কাটিয়া যাইবেই।

পত্নী-বিয়োগের পর মহেন্দ্রনাথের দিনও কোন রকমে কাটিতে লাগিল। আনন্দময়ী এখন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার বিবাহের জন্য বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় পাত্রের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মনোমত বর সহজে মিলিল না; ঘর ভাল হয় ত বর ভাল হয় না, আর বর ভাল হয় ত ঘর ভাল হয় না; আবার যেখানে দুইই ভাল পাওয়া যায়, সেখানে বাজার দর অত্যন্ত চড়া। এই রকম নানা প্রকার দেখিয়া শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, মেয়ের বয়স বেশী হইয়া যাইতেছে বলিয়া পাড়ার লোকের মাথা-ব্যাথা তাহার নিজের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে, তখন বৃদ্ধ স্থির করিল যে যেমন করিয়াই হউক, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিবেন; তবে আনন্দময়ী তাহার অতি স্নেহের অতি আদরের একমাত্র কন্যা, তাহাকে ত জলে ফেলিয়া দিতে পারেন না; এবং ঘর ও বর দুইই ভাল দেখিয়া দিবেন, তাহাতে তাহার যত টাকাই লাগুক।

রামপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্র জিতেনের সহিত আনন্দময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হইল; জিতেন্দ্রনাথ বি, এ পাস করিয়া এম্, এ পড়িতেছেন; বেশ শান্ত শিষ্ট নব্য প্রকৃতির যুবক।

লোকে বলিত, অনুকূল বাবু অতিশয় কৃপণ, প্রাতঃকালে তাহার নাম করিলে সেদিন একাদশী করার পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ কিংবদন্তী; কিন্তু লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করিয়া লইতে প্রস্তুত নই। এই দেখুন না, লোকে বলে, সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এখন অন্যরূপ প্রমাণ করিতেছেন। লোকে বলে, অন্ধকূপ-হত্যা হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কেহ প্রমাণ করিতেছেন, ওটা সবই ভুয়া; লোকে বলে, ঔরঙ্গজেব দুষ্ট ছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, না তিনি অতি সদাশয় ছিলেন। যাক্ সে সব কথা। লোকের কথার কোন মূল্য নাই।

আমাদের ত বিশ্বাস হয় না যে, অনুকূল বাবু কৃপণ। আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি। যে দিন অনুকূলের পুত্রের সহিত মহেন্দ্রনাথের কন্যার সম্বন্ধ স্থির হয়, সে দিন

ভাবী বৈবাহিকদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা হইতে বোধ হয় না যে, অনুকূল বাবু কৃপণ। পাঠক একটু শুনুন না :—

অনুকূল। তা হ'লে, মহেন্দ্র বাবু, এইবার বিবাহের দিন স্থির করা যা'ক।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, তবে কি না—

অনুকূল। তবে আর কি, আর ত কোন কথা নাই।

মহেন্দ্র। দেনা পাওনা ———

অনুকূল বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, মহেন্দ্র বাবুর কথায় বাধা দিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"মহেন্দ্র বাবু, বলেন কি? আমি কি ছেলে বিক্রী করতে বসেছি। ছেলের বিয়ে দিব, তাহাতে আবার দেনা পাওনার কথা কি! আপনার কন্যা, আপনার জামাতা, আপনি যা' পারবেন তাই দিবেন, এতে আমার কিছু বলবার নাই।"

মহেন্দ্রনাথ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। তিনি ত' অনেক জায়গায় মেয়ের বিবাহের জন্য ঘুরিয়াছেন, কিন্তু অনুকূল বাবুর ন্যায় সদাশয় লোক তিনি কাহাকেও দেখেন নাই। মহেন্দ্রনাথ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। অমন বর অমন ঘর আর এরূপ সুবিধা তিনি আর কোথায় পাইবেন?

যাহা হউক, স্থির হইয়া গেল, বৈশাখ মাসের ২৩শে তারিখে বিবাহ হইবে।

আচ্ছা, লোকের কি নিন্দা করাই স্বভাব? লোকে বলিল,—অনুকূল বাবু বিনা পণে বিবাহ দিবার পাত্রই নয়, ভিতরে ভিতরে কি একটা বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিয়াছেন। ছেলের প্রতিজ্ঞা যে, তাহার বিবাহে পণ গ্রহণ করিলে সে বিবাহ করিবে না; সেই জন্য ছেলেকে পণের সম্বন্ধে কিছু জানিতে না দিয়া প্রকাশ্যে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। আর এমনও হইতে পারে যে, মহেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা তাহার বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী দেখিয়া অনুকূল বাবু পণের কোন কথাই তুলেন নাই।

আমরা বলিতে পারি না, এ সব কথার মূলে কোন সত্য আছে কি না?

(৩)

বিবাহের আর চারিদিন বাকী আছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, মহেন্দ্রনাথের ব্যাঙ্কে যে সব টাকা ছিল, তাহা তিনি সমস্তই তুলিয়া আনিয়াছেন।

বিবাহের ঠিক তিন দিন পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথের বাটীতে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া তাঁহার নগদ ও অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল সমস্তই লইয়া গিয়াছিল। হায়, হায়, বিধাতা তাঁহার কপালে এমন হরিষে-বিষাদ ঘটাইয়া দিলেন! মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

যথাসময়ে অনুকূল বাবুর নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। তিনিও প্রমাদ গণিলেন। বড় আশায় মহেন্দ্রনাথের কন্যার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহ দিতেছিলেন; সে আশা এখন তাঁহার নির্ম্মূল হইল।

মহেন্দ্রনাথ ভাবী বৈবাহিকের নিকট আসিয়া তাহার বিপদ জানাইলেন। অনুকূল

বাবু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"তাই ত, মহেন্দ্র বাবু, কি করিয়াই বা কন্যার বিবাহ দিবেন. আমার বিবেচনায়, বিবাহ এখন স্থগিত রাখুন, পরে সুবিধা মত দিবেন।"

মহেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, অনুকূল বাবু কোন রকমে সম্বন্ধটী ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না, চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল, অনুকূল বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অনুকূল বাবু, রক্ষা করুন, এ বিপদে আপনি আমায় না রক্ষা করিলে আমার মান-সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।"

অনুকূল বাবু। কি জানেন বিয়ের কথা, একি সহজে হয়; কথায় বলে, লক্ষ কথায় বিয়ে হয়।

"আপনি যা' চান, আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি।" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ যোড়করে প্রার্থনা জানাইল। হায় মহেন্দ্রনাথ, কেন কন্যার পিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এ যে বাঙ্গালা দেশ, এখানে তোমার কন্যার বিবাহ এত সহজে হইবে,এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিও না। অনুকূল বাবু তখন নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন মহেন্দ্র বাবু, আমি ছেলে বিক্রয় করিতে বসি নাই। তবে কি জানেন, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, আর যা' দিবেন তা' আপনার কন্যা ও আপনার জামাতারই থাকবে। ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই। উহারাই সুখী হবে। আজকাল জানেন ত, ভাল পাস করা বরকে কন্যা দিতে হ'লে কত টাকা লাগে। আপনি সেই রকমই দিবেন, তার এক পয়সা বেশী আমি চাই না। সালঙ্কারা কন্যা আর নগদ চার হাজার টাকা, পারবেন ত।"

মহেন্দ্রনাথ কাতরস্বরে বলিলেন,—"নগদ টাকা, চা—র হা—জা—র টাকা, আপনি ত সবই জানেন, কোথায় পাই বলুন, ডাকাতে সব নিয়ে গেছে।"

অনুকূল বাবু। "কেন জায়গা জমী ত আছে?" নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নু অনুকূল বাবু নিঃসঙ্কোচে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি ভাবিলেন, তাহার আর কি আছে? কন্যাই তাহার একমাত্র সংসারের বন্ধন, সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি কন্যাটী ভাল যায়গায় পড়ে, তাহা হইলেও এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার মনে কিছু শান্তি আসিবে।

অবশেষে স্থির হইল যে, মহেন্দ্রনাথের বাস্তুভিটা ছাড়া যে সব জায়গা জমী আছে, তাহা কল্যই অনুকূল বাবুর নিকট বন্ধক রাখিবেন। তবে এ কথা কেহ ঘুণাক্ষরেও না জানিতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুকূল বাবু মহেন্দ্রনাথকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন; বিশেষতঃ, তাহার পুত্র শুনিলে বিবাহ নাও হইতে পারে। আরও কথাবার্ত্তা রহিল যে, আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যেই এই বন্ধক উদ্ধার করিতে হইবে।

(৪)

বৈশাখ মাসের ২৩শে তারিখে বিবাহ

হইয়া গেল। বিবাহের সময় টাকা কড়ি কিছু আদান-প্রদান হইল না, বরং অনুকূলবাবুই ঘর হইতে অলঙ্কারাদি আনিয়া কনেকে দিলেন। সংবাদপত্র মহলে অনুকূল বাবুর জয়জয়কার পড়িয়া গেল। এরূপ বিনাপণে বিবাহের দৃষ্টান্ত কয়টা লোক দেখাইতে পারে?—বটেই ত, সাধু! সাধু!!

লোক বন্ধক দেয় শুধিবার আশায়; মনে করে,এমন দিনই কি আমার চিরকাল থাকিবে, দুঃখের পর সুখ কি আসিবে না? কিন্তু হায়, আশামরীচিকা! মহেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন, যদি ডাকাতির কোন কিনারা হয়, যদি জিনিসগুলি ফিরাইয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসের মধ্যে তিনি সমস্ত শুধিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, ডাকাতির কোন কিনারা আর হইল না; অবশেষে, আশ্বিন মাস আসিল। অনুকূল বাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনাথ আত্মীয়ের নিকট অপমানিত হইবার ভয়ে যে সব জমী বন্ধক রাখিয়াছিলেন, তাহা অনুকূল বাবুরই নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, কেহ জানিল না; বন্ধক পরিশোধ করিয়া যে টাকা রহিল, তদ্দ্বারা নিজের শেষ জীবনটা কোন রকমে কাটাইয়া দিবার মনস্থ করিলেন।

শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি, শরতে কি মোহন মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে! মাঠের সেই নয়নাভিরাম মধুর ছবি, সেই ঢেউ খেলান ধান্য-ক্ষেত্র, বায়ু-হিল্লোলের সেই শ্রুতিসুখকর সর্-সর্ শব্দ, আকাশের সেই মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল স্নিগ্ধোজ্জ্বল বক্ষঃস্থল, প্রকৃতির সুন্দর নীরবতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রফুল্লতা, শ্যামল বিটপী-রাজির অন্তরালে বিহগকুলের মধুর কূজন বাস্তবিকই হৃদয়ে এক স্বর্গীয় শান্তি আনিয়া দেয়। আনন্দময়ীর আগমনে আজ সকলেই যেন আনন্দিত হইয়াছেন, সকলেই যেন শান্তি-সুধা উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু মা! ঐ যে সব ধান্যক্ষেত্র,উহারই মধ্যে যে বাঙ্গালীর কত দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে! ঐ শ্যামল ধান্য-ছায়ার মধ্যে কত বিষাদের উষ্ণ শ্বাস যে বহিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাঠ, বাঙ্গালার ঘাটের সহিত যে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের অনেক দুঃখের কাহিনীর ছাপ লাগিয়া আছে! মহেন্দ্রনাথের ধান্যক্ষেত্রে আজ আর মহেন্দ্র-নাথের নহে; শরতে তাহা শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কন্যার বরপণজনিত এক বিষাদের ইতিহাস অঙ্কিত হইয়াছে।

মহেন্দ্রনাথের মনে আর সুখ নাই, তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। শেষ জীবনে একে একে তাঁহার যেন সমস্ত চলিয়া যাইতেছে। বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পরিজন প্রভৃতি সমস্তই গিয়াছে। আছে কেবল আনন্দময়ী; পিতার এরূপ ভাব দেখিয়া আনন্দময়ী একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন,—"কেন বাবা, আপনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকেন?"

পিতা। "না মা, বিমর্ষ আর কি? তোমাদিগকে সুখী দেখে মরতে পারলেই আমার সুখ।"

কন্যা। "বাবা আপনি আমার কাছে

লুকোচ্ছেন কেন? আপনার কিসের জন্য মনে কষ্ট হয়েছে বলুন। ঘরে সর্ব্বদা বসে থাকা অপেক্ষা মাঠে এক একবার ধান দেখ্‌তে গেলে আপনার মন প্রফুল্ল হ'তে পারে।"

পিতা। আনন্দময়ী! মা আমার! তুই আমার যথার্থ মা। মা না হ'লে কি সন্তানের কষ্ট বুঝ্‌তে পারে? মাঠে আর কি যা'ব, মা, তোর কাছে লুকিয়ে আর কি হ'বে; মাঠে যে আমার জমী নাই — " বলিতে বলিতে *মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।* টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া আনন্দময়ীর হাতে পড়িতে লাগিল; আনন্দময়ীও কাঁদিতে লাগিল। পিতা এবং কন্যা এইরূপ ভাবে কিয়ৎকাল শোকবিহ্বল হইবার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, মহেন্দ্রনাথ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। এতদিনে তাঁহার দুঃখের ভারগ্রহণ করিবার একজন অংশীদার পাইয়া মহেন্দ্রনাথের নিজের হৃদয়ের দুঃখও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

অগ্রহায়ণ মাসে আনন্দময়ীর দ্বিরাগমনের দিন স্থির করিয়া অনুকূলবাবু পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সে পত্রের উত্তর দিতে মহেন্দ্রনাথের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; প্রথম যে পত্রখানা লিখিয়াছিলেন, তাহা অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল, সমস্ত কথাও তাহাতে ঠিক লেখা হইল না। সে পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর অর্দ্ধঘণ্টা উপাধানে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রহিলেন। অবশেষে অতিকষ্টে চারিছত্রে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। আনন্দময়ীও পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে জানিয়া বিষাদে মগ্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করিবে? নারী-জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য ত তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

তারপর সেই বিদায়ের দিন;—কেমন করিয়া সে দুঃখেরকাহিনী লিখিব? বৃদ্ধের শেষ আশা-ভরসা, শেষ আশ্রয়স্থল—সেই স্নেহময়ী কন্যাকে যে দিন তিনি বিদায় করিলেন, তাঁহার সে দিনের দুঃখের ভার নিরূপণ করিবার *শক্তি আমাদের নাই। আহা হা! আনন্দময়ী* যখন অশ্রুপূর্ণলোচনে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ফিরিয়া আসিয়া আপনার হাসিমুখ দেখিতে পাই।" তখন "এসো মা" বলিবার পর পিতা ও কন্যার যে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহাতে সে স্থলের ভূমি আর শুষ্ক রহিল না।

(৫)

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, মানুষের যখন দুঃখের মাত্রা অধিক হয়, তখন মানুষ অনেকটা শান্ত-প্রকৃতি ধারণ করে। দুঃখের প্রথম আঘাত কিংবা স্বল্পাঘাতে লোক বিহ্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু এইরূপ আঘাত যদি উপর্য্যুপরি হইতে থাকে, কিংবা আঘাত গভীর হইতে গভীরতম হইতে থাকিলে, সে বিহ্বলভাব আর থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যভাব আসিয়া পড়ে; তখন তাহা নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ সরসী-বক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া মহেন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা হইল।

যে সকল জমী মহেন্দ্রনাথ অনুকূলবাবুকে

বিক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে সে বৎসর খুব সরু ধান হইয়াছিল। অনুকূলবাবু তাহা ঝাড়াই করিয়া একটী পৃথক গোলায় রাখিলেন। আনন্দময়ী তাহার পিতার জমীর ধান দেখিয়া পিতার বিষণ্ণ-বদনের কথা মনে করিতে লাগিল. বুকটা তাহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

একদিন ঐ ধানের চালে অনুকূলবাবুর বাড়ীতে পায়সান্ন প্রস্তুত হইল। সকলে আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন। আনন্দময়ী কিন্তু তাহা স্পর্শও করে নাই। রাত্রে তাহার স্বামী জিতেন্দ্রনাথ তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"তুমি পায়স খাইলে না কেন? আমাদের জমীতে এ বছর ভাল ধান হয়েছে, তারই চালের পায়স, খাইলে না কেন?" তখন আনন্দময়ী বলিয়াছিল,—"আমি উহা ভালবাসি না।" এই কথা কয়টী বলিতে তাহার চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিয়াছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক দেখিতে না পাইলেও অনুমান করিতে পারি যে, নিশ্চয়ই এরূপ হইয়াছিল।

তারপর বৈশাখ মাসে আনন্দময়ীর বাপের বাড়ী আসিবার কথা, কিন্তু আসিতে পারিল না। তাহার শ্বশুরের ভয়ানক অসুখ। জ্বর-অতিসারে ৩।৪ মাস ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি শ্রাবণ মাসের শেষে ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

জিতেন্দ্রনাথের ঘাড়ে সংসারের সমস্ত ভার পড়িল। এতদিন জিতেন্দ্রনাথ বিষয়-কার্য্য কিছুই দেখিতেন না, নিজের বিদ্যানুশীলন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাহাকে সমস্ত দেখিতে হইল।

একদিন পিতার সিন্দুক খুলিয়া জিতেন্দ্রনাথ তাহার শ্বশুরের লিখিয়া দেওয়া তাহার পিতার নাম বরাবর বিক্রয় কবালাখানি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আগ্রহের সহিত দলিলের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া জিতেন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল,—তাহাতে লেখা আছে,—"আমার কন্যার বিবাহ আপনার পুত্রের সহিত হইয়াছে, কিন্তু বরপণের টাকা যোগাড় করিতে না পারায় উক্ত পণের দরুণ ৪০০০৲ টাকা ও অলঙ্কারাদি বাবদ ২০০০৲ টাকা একুনে ৬০০০৲ টাকার জন্য আমি আপনার নিকট তপসীল বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা পরিশোধ করিবার অন্য কোন উপায় না থাকায় আপনার নিকট উক্ত সমুদয় সম্পত্তি ৮০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া।" ইত্যাদি। জিতেন্দ্রনাথ দেখিলেন,—তিনি যে বরপণের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, তাহার পিতা তাহাকে সেই পণের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাহার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তিও এ জন্য বিক্রীত হইয়াছে। জিতেন্দ্রনাথ আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিলেন। সে দুঃখের কাহিনী আনন্দময়ী স্বামীর নিকট বিবৃত করিতে করিতে সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। কেন সে এতদিন তাহার নিকট ইহা প্রকাশ করে নাই, কেন সে পায়স ভালবাসে নাই বলিয়াছিল, প্রভৃতি হৃদয়ের সমস্ত কথাই মনের আবেগে স্বামীর নিকট জানাইল।

নিজেকে বিক্রীত করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য কায আর নাই—এইরূপ ধারণা জিতেন্দ্র-

নাথ বরাবর হৃদয়ে পোষণ করিতেন; তাই, সেইদিনই আমলাদের দ্বারা একখানি দলিল লিখাইয়া ফেলিলেন; ইহার দ্বারা শ্বশুরের সমস্ত বিষয় তিনি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অভিলাষে লেখা-পড়া পাকা করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিন মাসে আনন্দময়ীর বাপের বাড়ী আসিবার দিন স্থির হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথের আর আনন্দের সীমা নাই। আজ এই শুভ শরতে আনন্দময়ীর আগমনে মহেন্দ্রনাথের গৃহ সত্য সত্যই আলোকিত হইয়া উঠিবে। তাঁহার হৃদয়-কন্দর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

নির্দ্ধারিত দিনে মহেন্দ্রনাথ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া পথপানে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে দুইখানি পাল্‌কী আসিয়া সদর দরজায় থামিল। জিতেন্দ্রনাথ ও আনন্দময়ী নামিলেন; দুইজনে মহেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। জিতেন্দ্রনাথ শ্বশুরের পদতলে সেই দলিলখানি রাখিয়া বলিলেন—"এই নিন্, আমি আমার বিবাহের সময় আপনার নিকট বিক্রীত হইয়াছিলাম, আজ আমার দেনা পরিশোধ হইল। গত বৎসর আপনার জমীতে যে সব ধান হ'য়েছিল, তাহাও গরুর গাড়ী বোঝাই খাইয়া আসিতেছে। আপনি কোন দ্বিধা করিবেন না, এ সব আপনার, আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।" মহেন্দ্রনাথ যেন থতমত হইয়া গেলেন, দলিল পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপারখানা কি? তারপর জামাতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি আজ ধন্য, তোমার ন্যায় যুবক যদি বাঙ্গালা দেশে থাকৃত, তা' হ'লে আজ কনের বাপেদের এ দুর্দ্দশা ভোগ কর্ত্তে হ'ত না, তুমিই আজ আমার হৃদয়ে শরতে-বঙ্গের পূর্ণ আনন্দ প্রদান করলে; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও।" কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, ধান্য বোঝাই সারি সারি গরুর গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সব ধান্য মহেন্দ্রনাথের গোলায় তোলা হইল।

ওদিকে আনন্দময়ী বাড়ীর ভিতর যাইয়া প্রথমে বাড়ীর সংলগ্ন ধানের ক্ষেত দেখিতে গেলেন। সেই নবীন শ্যামল ধান্য ক্ষেত্র, সেই শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, সেই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য—আর তাহারই মাঝে সেই পূর্ণানন্দময়ী, দেবী-স্বরূপা, অনিন্দ্যসুন্দরী আনন্দময়ীর মূর্ত্তি প্রকৃতই শরতে বঙ্গের কি যেন একটা মন-মাতান, মোহন-ছবি জাগাইয়া তুলিতেছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল্।

উত্থান ও পতন।

(১)

কাল যারে হেরেছিনু সহাস্য-বদনে,
ক্রোড়ে লয়ে শিশু সুতে খেলিছে কৌতুকে
বারে বারে মাতা তার যে অমূল্য ধনে
কুক্ দিয়ে চাঁদ মামা আয় আয় ডাকে!

(২)

তার সে আনন্দধ্বনি দিগন্ত বাতাসে,
তুলেছিল প্রতিধ্বনি গগন ভেদিয়া,
মুখপানে চেয়ে তার হৃদিভরা আশে
কতই আশার ঢেউ গিয়াছে বহিয়া!

(৩)

আজ সেই শোকাকুলা একাকিনী হ'য়ে,
কাঁদিছে এলায়ে বেণী হ'য়ে উন্মাদিনী।
আজ তার ভাঙ্গা হৃদে শোকাশ্রু বহিয়ে,
চারিদিক্ হ'তে উঠে বিষাদের বাণী।

(৪)

হা বিধাতঃ! একি তব জগতের রীতি?
কেন এ নিঠুর প্রথা ও শিশুর প্রতি?
তার সে স্বরগ-জ্যোতিঃ পুণ্য সে প্রভায়
কোন্ পাপরেণু আসি কলঙ্কিল তায়?

(৫)

কেমনে বুঝিবে প্রভো! মোহমুগ্ধ নর
কেমনে বুঝিবে সে গো "উত্থান-পতন"!
সেও যে গো সৃষ্ট জীব ধরায় তোমার
কেমনে বুঝিবে সে গো অনন্ত বিধান।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

বাঁধনের দায়।

বিচিত্র সংসার কারা, বাঁধা পড়ি' আছি তায়।
পলাইতে পথ নাই, মায়া-বেড়ী পায়-পায়॥
মিনতি করিলে শত, নাহি তার পরিত্রাণ।
কাঁদিতে এসেছি শুধু, কাঁদিয়া যাইবে প্রাণ॥
একি ঘোর অত্যাচার,—দেখি তোর রে সংসার!!
দু' দিনো জুড়াতে কভু, নাহি অবসর আর?
কেন মিছে কাঁদি-হাঁসি, তা'ও ত' বুঝি না ছাই।
ছাড়িলে ছাড়াতে নারি, হায়-হায় কি বালাই॥
কিছু ত' রবে না শেষ, মিছে ঘোর দুরাশায়।
বলিহারি এ কুহক! আসা-যাওয়া বার-বার॥
শুনিতে বাসনা নাই, গরবের গরজন।
অবসাদ জাগিয়াছে, ডুবিয়াছে প্রাণ-মন॥
মহা প্রলয়ের কোলে জগৎ ভাসিয়া যা'ক্।
অথবা নাহিক ক্ষতি, থাক্ আর নাহি থাক্॥
আসিয়াছি পথ ভুলি' পথ ভুলি' চলে' যা'ব।
বারণ করিলে শত, কারো কথা না শুনিব॥
কত দিন আঁখি-জলে ভেসে গেছে বুকখানি।
হেথা ত' সান্ত্বনা নাই মনে মনে অনুমানি॥
কিন্তু হায় নিদারুণ করমের এ কি ফল!
ছাতি ফেটে যায় তবু তৃষ্ণায় নাহিক জল;
এই ত' রে ভালবাসা! এই ত' রে প্রলোভন!
এরি তরে কি রে হায় জীবনের মরা-রণ?
না না, আজ বহু দিনে, বাজিয়াছে বাঁশী তা'র।
পিঞ্জর-দ্বারেতে পাখি, কাঁদে বসি অনিবার॥
দূর কুঞ্জবাসী ওই শুনাইছে কল গান।
জগৎ ছাপিয়া গেছে, সে মধুর মরা-তান॥
ডাকি'ছে কুকারি' শুধু পাপী-তাপী আয় আয়।
বাঁধনে—বিষম দায়,—ঘটাল প্রমাদ হায়॥

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এল, এম, এস, এইচ্।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ-রাজ বংশের ইতিহাস।

নবম পরিচ্ছেদ।

দর্পনারায়ণ।

রাজা গণেশ অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাহাকে প্রাণের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। তিনি পাণ্ডুয়ার বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই রাজত্বের অবসানকালে গড়ভবানীপুরে রাজা দেবনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ সিংহাসনারোহণ করেন। রাজা দর্পনারায়ণ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ হইতে তমলুক্ পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগের স্বাধীন ভূপতি ছিলেন। মহাবীর মহেন্দ্রের বীর্য্যবলে রাজা গণেশ বঙ্গদেশে যবনরাজ্য উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই ব্রাহ্মণ রাজগণকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ ছিলেন।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র

চৈৎমল্ উত্তর বঙ্গের সিংহাসন লাভ করেন। ইনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং মুসলমানগণের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির অত্যন্ত পক্ষ-পাতী ছিলেন। চৈৎমল কোন আফ্গান ওমরাহের সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি নিজে মুসলমান হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, বঙ্গবাসী হিন্দুগণকে ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যে ভবানীপুরের পরম হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা দর্পনারায়ণ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা দর্পনারায়ণ চৈৎমলকে সতর্ক করিবার জন্য তাহার রাজসভায় একজন বিচক্ষণ দূত প্রেরণ করিলেন।

দূত পাণ্ডুয়ার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজা দর্পনারায়ণের নির্দেশ মত বঙ্গাধীপ চৈৎমল্‌কে বিনয়সহকারে বলিলেন,—"রাজন্! হিন্দু-কুল-তিলক রাজর্ষি দর্পনারায়ণ আমাকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া আপনার রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছেন; যদি আদেশ করেন, তাঁহার সমস্ত কথা যথাযথ বর্ণন করি।" দূতের এই কথা শুনিয়া চৈৎমল্ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি অতীব অর্ব্বাচীন, তোমার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই; সভ্যতার লেশমাত্রও তুমি অবগত নহ; তোমার ন্যায় মহামূর্খকে দূতের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাজা দর্পনারায়ণও অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছেন। তুমি কোন্ সাহসে আমাকে "রাজন্" বলিয়া সম্বোধন করিলে; তুমি কি অবগত নহ যে, আমি আর পুত্তলিকা-উপাসক ঘৃণাস্পদ হিন্দু নহি; আমি আর কাপুরুষোচিত জাতি-বিচার গ্রাহ্য করি না, হিন্দুদিগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বর্ব্বরোচিত আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লামের সুমার্জ্জিত সুরুচিপূর্ণ রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছি! তুমি কি জান না যে, বিলাস-বিভ্রমবিহীনা, ব্রতোপবাসনিরতা, নৃত্যগীতানভিজ্ঞা, হিন্দুললনা আর আমার অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হয় না—তুমি কি অবগত নহ যে, আমি আর রাজা চৈৎমল নহি, আমি এখন সুল্‌তান জেলাল-উদ্দিন? যাহা হউক, রাজা দর্পনারায়ণ যখন তোমাকে পাঠাইয়াছেন তখন তোমার কি বক্তব্য আছে নিভয়ে বল, তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম, অন্য কাহারও মুখ হইতে এরূপ বাক্য উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইত।" দূত নির্ভীক-ভাবে, জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র শোণিত আমার শিরায় শিরায় এখনও প্রবাহিত হইতেছে, আমি জীবনের মমতা রাখি না; বিশেষতঃ, আমি দূত, আপনার অধীন প্রজা নহি যে, আপনি আমার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন। হিন্দুকুলাবতংস পরম ধার্ম্মিক রাজা গণেশের পুত্র যে নিজেকে রাজা বলিতে অপমান বিবেচনা করেন—ইহা অত্যন্ত ঘৃণার কথা। যাহা হউক, আপনাকে শিক্ষা দিবার আমার অধিকার নাই এবং আবশ্যকও বিবেচনা করি

না। মহারাজ দর্পনারায়ণ যাহা আমাকে বলিতে বলিয়াছেন—শ্রবণ করুন।

"যবন-রাজ্য উচ্ছেদ মানসে বীরবর রাজা মহেন্দ্র মহাযুদ্ধে বঙ্গাধীপ, মহা অত্যাচারী কুকর্ম্মাসক্ত সামসুদ্দিনকে নিহত করিয়া পরম ধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ, বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি আপনার পিতাকে বঙ্গ-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আপনার পিতাও প্রাণপণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণের অভাব-মোচন করিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও বলে তাহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কিন্তু আপনি এই মহাপ্রাণ ধার্ম্মিক পিতার আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহার অক্ষয় নাম, অনন্ত কীর্ত্তি মহা পাপ-পঙ্কে প্রোথিত করিয়া হিন্দুর নাম পর্য্যন্তও চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতল সলিলে বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছেন; আপনি বঙ্গদেশের রক্ষকরূপে ভক্ষক হইয়া বসিয়াছেন—আপনি বল প্রয়োগ করিয়া হিন্দু প্রজাগণকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইতেছেন। হিন্দুগণ মুসলমানগণের দ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতেছে, আপনি তাহার প্রতিবিধান না করিয়া বরং উৎসাহ দান করিতেছেন—আপনি হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছেন, সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছেন, আপনার অত্যাচারে আবার বঙ্গদেশ হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে—আপনার এই সমস্ত অপকর্ম্ম ও অত্যাচারে আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি। আপনার পিতার সহিত আমাদের পরম বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু আপনার ব্যবহারে সে বন্ধুত্বভাব আর রাখিতে পারি না। আপনি আমাদের, কেবল আমাদের কেন, সমস্ত বঙ্গদেশের একজন মহাবন্ধুর পুত্র, সেই জন্য আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনি যদি এইরূপ অত্যাচার বন্ধ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে সাম্-সুদ্দিনের দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া দূত নীরব হইল। জেলালের চক্ষুদ্বয় হুতাশনের ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মহাক্রোধভরে কোষনিবদ্ধ অসি নিষ্কোষিত করিয়া দূতের মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু দূতের প্রাণবধ করিলে মহারাজ দর্পনারায়ণের রোষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িবে বুঝিতে পারিয়া আত্মসংযম করিলেন এবং দূতকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া রাজ-সভা হইতে বিদূরিত করিলেন। দূতও ক্ষিপ্র-পদে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ দর্পনারায়ণ দূতমুখে জেলালুদ্দিনের দম্ভপূর্ণ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং বঙ্গবাসী দুর্ভাগ্য হিন্দু-নরনারীগণের দুঃখ দূরীকরণ মানসে উদ্যোগী হইলেন। তিনি দেখিলেন—যখন জেলালুদ্দিন তাঁহার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে, তখন তাহার সহিত যুদ্ধ না করিলে উপায়ান্তর নাই; তরবারির দ্বারা শিক্ষাপ্রদান না করিলে তাহার চৈতন্যোদয় হইবে না। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা দর্পনারায়ণ বহু সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; এবং রাজা মহেন্দ্রের

পুত্র কুমার যোগেন্দ্রকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া স্বধর্মত্যাগী পাপাত্মা জেলালকে রাজ্যচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কুমার যোগেন্দ্র অগণিত সমরকুশল বীর্য্যবান্ সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডুয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডুয়া অবরোধ করিলেন। রাজা দপনারায়ণের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিলেই পাণ্ডুয়া নগর। সেইজন্য জেলাল শত্রু-সৈন্যের আগমন পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, এবং শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুতও হইতে পারেন নাই। কুমার যোগেন্দ্রের সৈন্যগণ পাণ্ডুয়া বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। বাগ্দী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দুগণ পদাতিক-সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত ছিল। ইহাদের সমরকৌশল অতীব আশ্চর্য্যজনক। ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইহারা অতি দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত। ইহাদের তাণ্ডব সমর-নৃত্যে মেদিনী কম্পিতা হইত, ইহাদের ভৈরব হুঙ্কারে গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত। বঙ্গদেশীয় লাঠিয়ালগণের লাঠি খেলিবার সময় তালে তালে ভয়ঙ্কর নৃত্য ও লোকভয়ঙ্কর 'কু'-ধ্বনি বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। যদি একজন লাঠিয়াল এই 'কু' ধ্বনি করে, মনে হয় যেন শত শত লোক এক সময়ে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। এরূপ বিভীষণ সমর হুঙ্কার পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয় বীরপুরুষ করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বঙ্গবীরগণের ন্যায় তরবারি চালনের অদ্ভুত কৌশল অন্য জাতির যোদ্ধারা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহারা ঢালের দ্বারা নিজ দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া মৃত্তিকার উপর পড়িয়া থাকিত, মনে হইত যেন একটী ঢাল মাত্র মাটিতে পড়িয়া আছে কিন্তু শত্রু নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সলম্ফে তরবারি হস্তে উত্থিত হইয়া শত্রু বধ করিত। তাহাদের প্রায় চারি পাঁচ হস্ত পরিমিত গুলি-বাঁশের লাঠি লোহার পাতে বাঁধান থাকিত। এরূপ সুকৌশলে তাহারা লাঠি চালনা করিতে পারিত যে, তীর কিংবা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিলে উহা লাঠিতে লাগিয়া ভূপতিত হইত, কদাপি গাত্রস্পর্শ করিতে পারিত না। বঙ্গবীরগণ দুই হাতে দুই লাঠি সবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত্রুব্যূহ অবলীলাক্রমে ভেদ করিতে পারিত। তরবারি, তীর, বর্শায় তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিত না। তাহারা লাঠিতে ভর দিয়া ঘণ্টায় দশ বার মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইত।

জেলালও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নরশোণিতে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইল। কখনও জেলালের পক্ষ জয়যুক্ত হইতে লাগিল, কখনও বা যোগেন্দ্র জয়লাভ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে অগণিত লোকক্ষয় হইতে লাগিল এবং দেশমধ্যে ভীষণ অশান্তির ছায়া পতিত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে মতিলাল শর্ম্মণ নামক এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। বিশেষতঃ, জেলালের পিতা রাজা গণেশ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। পণ্ডিত মতিলাল রাজা

গণেশের সাহায্যে বহু সংস্কৃত পুস্তক প্রণয়ন করেন। জেলালুদ্দিন মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও পণ্ডিত মতিলালকে সম্মান করিতে ত্রুটি করিতেন না।

বঙ্গের তৎকালীন সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত মতিলাল দেশের এরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং তাহার প্রতিকারকল্পে রাজ-সেনাপতি যোগেন্দ্রের শিবিরে উপনীত হইলে মহাবীর যোগেন্দ্র তাহার যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মন্! যুদ্ধস্থলে ভবাদৃশ জনের আগমনের কারণ বলিয়া আমার উদ্বেগ দূর করুন! আপনি কি কোন মূঢ়ের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন কিংবা আপনার কোন অত্যাহিত সংঘটিত হইয়াছে? শীঘ্র বলুন, আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—"বৎস যোগেন্দ্র, তুমি জেলালের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেন বৃথা লোকক্ষয় করিতেছ? ইহাতে যে দেশের বিশেষ কিছু উপকার হইবে, তাহা নহে। বরং মুসলমানগণ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া থাকিবে এবং সুবিধা পাইলেই তোমার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে। আমার ইচ্ছা, তুমি এই ভীষণ সমর হইতে নিবৃত্ত হও।"

ব্রাহ্মণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর যোগেন্দ্র বলিলেন,—'আপনি মহা পণ্ডিত; বলুন দেখি, হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে এরূপ পাষণ্ডের সহ যুদ্ধ অনিবার্য্য কি না? স্বধর্ম্মত্যাগী পাপাত্মা নিজে মুসলমান হইয়াই ক্ষান্ত হইল না, হিন্দু প্রজাগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে। এরূপ অত্যাচার জীবিত থাকিয়া কিরূপে সহ্য করা যাইতে পারে।

যোগেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—"দেখ যোগেন্দ্র, আমাদের দেশ কপটাচারী লোকে পূর্ণ হইয়াছে; হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, অর্থই এখন এ দেশের লোকের একমাত্র আরাধ্য বস্তু হইয়াছে, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তুমি মুসলমানের সহ যুদ্ধ করিয়া দেশের কোন উপকারই করিতে সমর্থ হইবে না। ভাবিয়া দেখ না কেন, তোমার দেশে মুসলমান কিরূপে আসিল! হিন্দু-কুল-কলঙ্ক, মহাপাতকী, স্বদেশদ্রোহী, কাপুরুষ জয়চন্দ্র না সাহায্য করিলে কি মহম্মদ ঘোরী কোন কালে ভারত-জয়ে সমর্থ হইত? বেহারের রাজপুত্রকে কৌশলে স্থানান্তরিত না করিলে ও বঙ্গাধীপ বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষ স্বার্থান্ধ মন্ত্রীকে বশীভূত না করিতে পারিলে কি বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ-বেহার বিনাযুদ্ধে অধিকার করিতে সমর্থ হইত? কখনই নহে। তবেই বুঝিতেছ না যে, মহানারকী ভারতবাসীর সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্যই ভগবান ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী। এই মুসলমান-রাজ্য এখন ভারতে সুদৃঢ় হইয়াছে। মুসলমানের অত্যাচারে বৃথা হিন্দুনামধারী ধর্ম্মদ্বেষী, হিন্দু-আচারবিদ্বেষী, হিন্দু-কুল-কলঙ্ক ভারতবাসী যখন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িবে, যখন মুসলমান রাজগণের সন্তোষ-বিধানের জন্য নিজেদের ধন, মান, প্রাণ—এমন কি, পুত্র-পরিবার পর্য্যন্ত

ডালি দিতে বাধ্য হইবে, তখন কুলাঙ্গারগণ বুঝিবে, তখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইবে। হিন্দুধর্ম্মের শাসনে থাকিলে, মানুষ এত নীচ স্বার্থপর হইতে পারে না। অধুনা অধিকাংশ ভারতবাসী নামে হিন্দু মাত্র; কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের শাসন মানে না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পশ্বাচারই এখন তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু নামটী মাত্র রাখিয়া মুসলমানের আচার-ব্যবহার অনুকরণে সর্ব্বদা ব্যস্ত। মুসলমানগণের পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাস দেখিয়া ভারতের নব-নারী অভিভূত। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, দেহ ক্ষণবিধ্বংসি; ইন্দ্রিয়-সুখই তাহাদের জীবনের প্রধান সুখ হইয়া পড়িয়াছে সংক্ষেপতঃ তাহারা কুক্কুর, শৃগালাদি ইতরজন্তুর ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কার্য্যে জগতের মঙ্গল ও আনন্দ উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্য সম্পাদনে যতই বিপদ ও দুঃখ থাকুক না কেন, তাহাতে অবিনশ্বর অতুল আনন্দ নিহিত আছে, তাহা উন্নতচেতা ধার্ম্মিক মহাত্মা ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হিন্দুগণ যখন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল, তখন তাহাদের শৌর্য্যে-বীর্য্যে, গৌরবে মেদিনী পূর্ণ হইয়াছিল। এখন তাহারা অধঃপতিত; শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, পীড়া, অত্যাচার প্রভৃতি দ্বারা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত না হইলে তাহাদের চৈতন্য হইবে না। তাহারা এক্ষণে বিকারগ্রস্ত। কিছুতেই নিজ হিত বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যুদ্ধ করিয়া জেলালকে পরাস্ত করিতে পারিলেও ভারতবাসীর মনের ভাব দূর করিতে কি সমর্থ হইবে? রাজা গণেশ যখন বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় বিষয়ে তাঁহার কতই না আশা হইয়াছিল, কিন্তু কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে? তাঁহার স্বীয় পুত্র মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর মহাশত্রু হইয়া উঠিয়াছে। তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ ভারতবাসীই হৃদয়ে মুসলমান ভাব পোষণ করিতেছে ও সেই ভাবে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে, এই মোহময় ভাব তাহাদের হৃদয় হইতে যতদিন না দূরীভূত হইবে, যতদিন না তাহারা নিজেদের প্রকৃত সত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে, ততদিন হিন্দুদের উন্নতির কোন আশা নাই। অতএব বৎস! যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া দেশের লোক যাহাতে প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।"

পণ্ডিত মতিলালের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন,—"যুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন কি প্রকারে নিবৃত্ত হইব, অধিকন্তু তাহাতে লোকে আমাকে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিবে, এবং জেলালও আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ছারখার করিবে।"

পণ্ডিত মতিলাল উত্তর করিলেন,—"বৎস, চিন্তিত হইও না; এই যুদ্ধে জেলাল যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; আমি এখনই তাহার নিকট গমন করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিব; আমার বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই ইহাতে স্বীকৃত হইবে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"আপনি যদি জেলা-

লের সভায় গমন করেন, তাহা হইলে, তাহার নিকট প্রস্তাব করিবেন—সে যেন হিন্দুধর্ম্মের ও জাতির উপর অত্যাচার না করে। তাহা হইলে যুদ্ধ পুনর্ব্বার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।"

অতঃপর পণ্ডিত মতিলাল, জেলালের সভায় উপস্থিত হইয়া' যোগেন্দ্রের প্রস্তাব তাহার গোচর করিলেন এবং জেলালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি হিন্দুর জাতি ও ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিলে, রাজ্যমধ্যে চির সমরানল প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

পণ্ডিত মতিলালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জেলাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার পিতা আপনাকে গুরুর ন্যায় বিবেচনা করিতেন, এবং আমিও আপনাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। যদি সেনাপতি যোগেন্দ্র সসৈন্যে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আমি আর কখনও হিন্দু-প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিব না।"

এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য মতিলাল শর্ম্মার চেষ্টায় সমরানল নির্ব্বাপিত হইল এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হইল।

জেলালুদ্দিন পণ্ডিত মতিলালের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায়-মুকুট" উপাধি দান করেন; এবং এই যুদ্ধের পরে রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করিয়া ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

জেলালের মৃত্যুর পর হইতেই উত্তরবঙ্গে মুসলমান রাজাগণ হীনবল হইয়া পড়েন এবং রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সময়ে গড় ভবানীপুরের সিংহাসনে ক্রমান্বয়ে উদয়নারায়ণ, সত্যনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ ও শিবনারায়ণ নামধেয় চারিজন ব্রাহ্মণ রাজা নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গ সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভুরস্থট পরগণার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের নামানুসারে উদয়নারায়ণপুর, প্রতাপপুর, শিবপুর প্রভৃতি গ্রাম স্থাপিত হয়। এখনও ঐ সমস্ত গ্রাম পূর্ব্ব নামে পরিচিত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত নরপতিগণের রাজত্বকালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; কিম্বা লোকপরম্পরায়ও এই সকল নৃপতি সম্বন্ধীয় কোন কাহিনী শ্রুতি-গোচর হয় না। তবে রাজা সত্যনারায়ণের রাজত্বকালে গৌড়ে হোসেন-সা নামক একজন মুসলমান রাজা প্রবল হইয়া উঠেন। হোসেন-সা বঙ্গের অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গ নিজাধিকার ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু রাজা সত্যনারায়ণ পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ ভূভাগ ছাড়িয়া দিয়া হোসেন-সার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

মন।

মদমত্ত করী পারি করিতে বন্ধন,
রজ্জু হাতে যেতে পারি সিংহের সদন,
গিরি চূর্ণ করিবারে পারি অনায়াসে,
সাগরে ডুবিতে পারি, উড়িতে আকাশে,
জগতে কিছুই মোর অসাধ্য দেখি না,
সবারে জিনিতে পারি, মনকে পারি না।

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

আশার প্রতি।

(১)

কি বলে সম্বোধি তোমা আশা সুহাসিনি!
তোমার মধুর হাসি
সদা দুঃখ-তমঃ নাশি
ঢালে হৃদে সুখ-জ্যোতিঃ মৃতসঞ্জীবনী।

(২)
তুমি দীন-হীন জনে অভয়দায়িনী।
তোমার অভয় বলে
পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চলে
উত্তুঙ্গ অচলশ্রেণী হিম কিরীটিনী।
(৩)
(তুমি) স্নেহময়ী মাতাসম শান্তিবিধায়িনী।
তোমার স্নেহের বলে
শোক-জ্বালা সবে ভুলে
নিরানন্দ নরে তুমি আনন্দদায়িনী।
(৪)
মুমূর্ষু নরের তুমি জীবনদায়িনী।
শক্তিহীন বৃদ্ধ নর
পাইয়া তোমার বর
হৃষ্ট হয় যুবা মত অয়ি সুহাসিনি।
(৫)
ঈশের দর্শন আশে যোগী ঋষিগণ
বসি যবে যোগাসনে
সেই পদ ভাবে মনে
জীবন অন্তিম কালে লভিতে নির্ব্বাণ।
(৬)
তদা কাম-ক্রোধ আদি ষড়রিপুগণ
নব জলধর মত
ঢালে বর্ষা অবিরত
সে প্রাণের দীপ্ত অগ্নি করিতে নির্ব্বাণ।
(৭)
সে প্রাণে নিরাশা তমঃ ঘনায় যখন
স্বজ্যোতিতে আলো করি—
অয়ি দেবি শুভঙ্করি!
তুমি তার প্রাণে অগ্নি জ্বালহ তখন।
(৮)
তুমি পথ দেখাইয়া চালায়েছ মোরে
বাণীর চরণোপরে
দিতে অর্ঘ্য ভক্তিভরে
আপন অভিষ্ট লাভ করিবার তরে।
(৯)
বিদ্রুপের শতধারা পড়িয়া যখন
বন্ধুদের ওষ্ঠ হ'তে
মোর জীবনের পথে
ভাসাইয়া জ্ঞান, মান করিবে হরণ।
(১০)
ঘনাইবে অন্ধকার জীবনে তখন
নিজ গুণে দয়া করে
তুমি দেবি হাতে ধরে
আমারে লইয়া, দিও শান্তি অনুক্ষণ।
(১১)
অয়ি প্রপঞ্চক! তোর এ খেলা কেমন?
চঞ্চলা চপলা মত
ক্ষণ উজলিয়া পথ
দ্বিগুণ আঁধারে মোরে ত্যজেছ এখন।
(১২)
সকলে মোহিত দেখি তোর সেই হাসি
(তোর) অধরে মধুর হাস
হৃদয়ে গরল রাশি
হাসিতে ভুলিয়া তাই আঁখি জলে ভাসি।
(১৩)
সে হাসিতে আর কভু ভুলিব না মিছে
উন্মত্ত মাতঙ্গ মত
ছাড়িয়া বাসনা-রথ
আর কভু ছুটিব না তোর পিছে পিছে।
(১৪)
যা' করেন পরমেশ তাহাই মঙ্গল
নর-জন্ম হোক ব্যর্থ
না থাকুক মান অর্থ
তবু তোরে স্মরি নাহি চাহি অর্থ-বল।
(১৫)
সিদ্ধি-নীর লাভ তরে দুষ্ট কুহকিনি!
মরুভূমে মৃগপ্রায়
কত ভ্রমাইলি হায়!
নগর নগরী শৈল সাগর তটিনী।
(১৬)
কি বলে সম্বোধি তোমা কহ সুহাসিনি।
পাপীয়সী মায়াবিনী,
অথবা শান্তিদায়িনী
কি বলে সম্বোধি তোমা কহ সুহাসিনি!

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

ESTABLISHED 1303 B. C

একবিংশ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।　　[৮ম সংখ্যা।

হিন্দু সমাজের মুখপত্র।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১॥০ টাকা।

1917

হাওড়া, ৯ নং ট্রেঙ্ককম্ম ঘাট রোড, কল্পযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগল কৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ সাল।

আর্য্য।

আর্য্য—দেবতা। অনার্য্য—দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি। ধর্ম্মদ্বেষী, নাস্তিক, দস্যু ব্যবসায়ীরা প্রাচীনকালের অনার্য্য। ধর্ম্মবিশ্বাসী আস্তিকগণই প্রাচীন সময়ের আর্য্য।

ঋ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় যোগে আর্য্যপদ নিষ্পন্ন। ঋ ধাতুর সাধারণ অর্থ গমন। এ অর্থে যাহারা যাযাবর, পরিব্রাজক তাঁহারাই আর্য্য। গৃহ নির্ম্মাণে উদাসীন, ঈশ্বর-উপাসক, শান্ত প্রকৃতি ব্যক্তিগণই প্রকৃত আর্য্য। ঋ ধাতুর একটী অর্থ চাষ করা। প্রথম যাহারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া চাষ-বাস দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন তাহারা আর্য্য। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যেতর মানবগণ পশুদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের কাঁচা মাংসই ভোজন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও শস্ত্র-বিদ্যায় আর্য্যগণ শিক্ষিত ছিলেন।

আর্য্য-পদের আভিধানিক অর্থ অনেকগুলি, তন্মধ্যে প্রথম অর্থ পূজ্য। গুরুস্থানীয়গণ পূজ্য, গুরুস্থানীয়েরা আর্য্য। শিষ্যের নিকট গুরু, ছাত্রের কাছে অধ্যাপক আর্য্য। সম্মানিত ব্যক্তিমাত্রেই আর্য্য। প্রাচীনকালে যাঁহারা এইরূপ পূজ্য পদবীতে সমারূঢ় হইবার যোগ্য ছিলেন, তাঁহারা আর্য্য। পতির পিতা অর্থাৎ শ্বশুর স্ত্রীলোকের নিকট আর্য্য-পদে অভিহিত হইতেন।

আর্য্য শব্দের আর একটী অর্থ পবিত্র। "যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ" বলিয়া মহাকবি কালিদাস এই অর্থের ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শান্ত দান্ত উপাসক, যাঁহারা জীব-জগতের মঙ্গলে যত্নবান্, পাপ পরিহারে অবহিতচিত্ত, নিজেদের পারত্রিক কল্যাণার্থ চেষ্টাবান্, তাঁহারাই প্রকৃত আর্য্য।

আর্য্য শব্দের অপর একটী অর্থ জ্ঞানী। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ক্ষুদ্র বুদ্ধিবৃত্তিমূলক সাধারণ জ্ঞানও এই জ্ঞান। এই জ্ঞানী অর্থে ব্রহ্মবাদী ঋষিবৃন্দ হইতে অধ্যয়নরত দ্বিজমাত্রেই আর্য্য। বৈদিক ঋষিগণ হইতে জিতেন্দ্রিয় তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ আর্য্য। দেশরক্ষক, বেদ ব্রাহ্মণরক্ষক ক্ষত্রিয়েরা আর্য্য। কৃষি বাণিজ্যসেবী বৈশ্য, সেবাপরায়ণ সৎশূদ্র মাত্রেই আর্য্য।

যাঁহারা বেদোপনিষৎ প্রচারক, সংহিতা-

পুরাণানুশাসনে শাসিত, স্বর্গার্থী, মুমুক্ষু, তাহারা আর্য্য। সরস্বতী-তীরে যাহারা ঋত মন্ত্রপাঠ করিয়া সামবেদের ঝঙ্কারে তপোবন প্লাবিত করিয়া, যজুর্মন্ত্রে যজুতীয়াগ্নিতে আহুতি দিয়া দেশের মঙ্গল বিধান করিতেন, তাঁহাদের আর্য্য আখ্যা। শিল্প বাণিজ্য, কৃষি, ধনুর্ব্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, অঙ্ক, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়নে অধ্যাপনে যাঁহারা বড় ছিলেন, তাঁহাদেরই আর্য্য নাম। আম মাংস ভক্ষণে একান্ত বিরত, কৃষ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে উদ্যুক্ত, শরণাগতবৎসল, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণই প্রকৃত আর্য্য-পদবীর যোগ্য। বিবাহ যাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্য, সংসার যাঁহাদের গার্হস্থ্যাশ্রম, অধ্যয়ন যাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ, তাঁহারাই আর্য্য নামের অধিকারী।

চতুর্থ অর্থ সৎকুলোদ্ভব, আভিজাত্য সৎকুলে জন্ম প্রভৃতি মানবের মঙ্গলের নিদান। অনার্য্য হইতে বিশেষত্ব এইখানেই সুব্যক্ত। সাধারণতঃ জারজ কখন সৎকুলোদ্ভব হইতে পারে না,কাজেই তাহারা আর্য্য নহে। স্বাতন্ত্র্য, পবিত্রতা, আভিজাত্য অটুট রাখিবার জন্য আর্য্যগণ আর্য্য।

আর একটী অর্থ শ্রেষ্ঠ। পূজ্য পবিত্র সৎকুলোদ্ভব সুসভ্য ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র এতই বিস্তীর্ণ যে, ইচ্ছামত অনেক অর্থ করা যাইতে পারে। অজ জন্মরহিত, অজা প্রকৃতি। এই অজ ও অজার অর্থ ছাগ ও ছাগী না হইতে পারে তাহা নহে। কোন কোন ব্যক্তিদের নিকট এইরূপ নূতন অর্থ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্বাধীন চিন্তাশীলতার নামে যে কত যথেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার চলিয়া যাইতেছে, তাহা কে লক্ষ্য করে। ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা অর্থ হয় বলিয়া ভারতীয় প্রাচীন মহাত্মাগণ কৃষক ছিলেন এমন কথাও শুনিতে পাই। আমরাও কৃষিবিদ্যা জানি, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি—এই অর্থে আমাদিগকে কেহ যদি কৃষক বলেন, তাহা হইলে আমরা কি সন্তুষ্ট হই? হাসির কথা "সেই আর্য্য কৃষকগণ লাঙ্গল হস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে আপন মনে যাহা মনে আসিত তাহাই গান করিতেন—ইহাই বেদ।" হায় কি মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা, ভারতের পণ্ডিতদের মধ্যেও দুই একজন এই মতাবলম্বী, বেদ কি ইহাই? সেই অপৌরুষেয় জ্ঞানময় বেদ কি চাষার গান? জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরমার্থ তত্ত্ব প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে সকল অশরীরিবাণী ঋষিগণের তপঃপূত অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাই বেদ। সেই অশরীরিণী দৈবী বাণি, সেই নিত্য অপৌরুষেয় ব্রহ্মনিশ্বাস স্বরূপা বাক্‌ ভারতের ধর্ম্মের মূল,জ্ঞানের আকর অভ্যুদয়ের হেতুভূত সেই শ্রুতি চাষার গান? আম-মাংস ফল-মূলই পূর্ব্বে মানবের খাদ্য ছিল, আর্য্যগণ কৃষি-বিদ্যার প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহারা স্বহস্তে লাঙ্গল দিতেন মানিতে হইবে? রাজর্ষি জনক যে যজ্ঞস্থল কর্ষণ করেন—তাহা ধর্ম্মমূলক আচার নিবন্ধন। সাবিত্রী-ব্রতের পরদিন লাঙ্গল দিয়া গৃহ-প্রাঙ্গন কর্ষণ করা এখনও আচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে,

সেই আদর্শ জ্ঞানী, কর্ম্মী মহারাজ স্বহস্তে কৃষকদের মত চাষ করিতেন ?

বেদের একটী নাম শ্রুতি আর তাহা গুরু-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। ইহাতে কেহ এমন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতেরা লিখিতে জানিতেন না। অদ্ভুত যুক্তি! পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথা, এজন্য আমাদের তেমন দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এখনও নব্য ন্যায়ের অনেক যুক্তিতর্ক গুরুপরম্পরাক্রমে মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার অনেকগুলি কোথাও লেখা পর্য্যন্ত নাই, উত্তরকালের বংশধরগণ সিদ্ধান্ত করিবেন, বাঙ্গালার নৈয়ায়িকেরা লিখিতে জানিতেন না!

আর্য্য—এই শব্দের চারিটী ধার বা দিক আছে। প্রথম পূজ্য, দ্বিতীয় জ্ঞানী, তৃতীয় পবিত্র, চতুর্থ সৎকুলোদ্ভব। আর্য্য চতুর্ব্বিধ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অনার্য্য মিশ্রণ শূদ্রদিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে ঘটিয়াছে বলিয়া শূদ্র যে অনার্য্য তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ, বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণও যে শূদ্র মধ্যে পরিগণিত না হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। নচেৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই কেন ?

আমাদের এই চতুর্ব্বিধ বিভাগ আজ প্রাচীনকাল হইতে অনেক বিষয়েই দেখা যায়; বেদ চতুর্ব্বিধ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। অথর্ব্ব বেদ—কেবল ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ (চৌবে) আছে; অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত উপনিষৎ আছে, তবে কেমন করিয়া বলিব অথর্ব্ববেদ—অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রসূ বেদ নহে। তবে কোথাও অবশ্য বেদ তিনটী বলিয়াও উক্ত আছে।

আর্য্যদের আদি পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্মুখ, চতুর্হস্ত, পিতৃস্থানীয় প্রজাপতিও চতুর্হস্ত ছিলেন। আর আর্য্যদের উপাস্য ব্রহ্মও চতুষ্পাৎ, তিনটী পদ যথাক্রমে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ, চতুর্থ পদ স্বাত্ম স্বরূপে। আর বামন অবতারেও তিনটী পদ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে, আর একটী পদ তাঁহার পরম ভক্ত বলিরাজের মস্তকে। নারায়ণ, কালিকা দেবী প্রভৃতিও চতুর্হস্ত। নারায়ণের চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। বেদমাতা গায়ত্রীও চতুর্হস্তা। চতুর্হস্তে "বরদাঙ্কুশাক্ষমালাং কমণ্ডলুধরাং" গায়ত্রীর ধ্যানও করি।

আর্য্যদের দেবদেবী সাধারণতঃ চতুর্হস্তা। মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন বলিয়া বা ধর্ম্মের সেবক ছিলেন বলিয়া আর্য্য চতুষ্পাৎ। ধর্ম্মেরও চারিটী পদ যথা দয়া, দান, সত্য ও সরলতা। এই অর্থে আর্য্য দয়ালু, দাতা, সত্যবাদী ও সরল।

আমাদের গৃহে, সংসারে, কাব্যে, নাটকে, পুরাণে ও দর্শনে আর্য্যশব্দের অতীব প্রভাব দৃষ্ট হয়। যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা স্পৃহনীয়, যাহা সুন্দর, যাহা পবিত্র, তাহাই আর্য্য। সে আর্য্য কাহারা? ভারত যাঁহাদের লীলাক্ষেত্র, জগৎ যাঁহাদের নিকট নতশির, ঐহিক সুখ যাঁহাদের কাছে তুচ্ছ—সেই জগতের শিক্ষাগুরু আর্য্য কোথায়? সেই সুন্দর, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ জাতির বংশধর

আমরা সে আর্য্যনামের উপযুক্ত আছি কি?

আর্য্যের সে মহদ্‌গুণ, সে জ্ঞান-জ্যোতি কোথায়? আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি, অতীতের জ্ঞানগুরু ভারতে আছে কেবল শূদ্রত্ব ও বৈশ্যত্ব। প্রকৃত সেবাপরায়ণ শূদ্রও মেলে কি? আমরা যজ্ঞোপবীত গলায় রাখি, তাহার মর্য্যাদা কতটুকু রাখি? জপ, তপ, ধ্যান, তিতিক্ষা, সংযম ও ধারণার দিকে অগ্রসর হইবার কৈ চেষ্টা করি? দয়া, দান, আতিথ্য, সারল্য, সত্য, বিনয়, প্রভৃতি আর্য্য-গুণের কতটুকু অনুকরণ করি? আর্য্যের প্রকৃত বিশেষণ আমাদের নাই; তবে আমরা তাঁহাদের সন্তান বলিয়া যা' গৌরব অনুভব করি এই মাত্র। রাজা নাই, রাজপুরী নাই—গ্রাম যেমন রাজাপুর—সেইরূপ মত নহে কি?

এই আর্য্যগণ কোথা হইতে আসিয়াছেন—এ জন্য বাদ বিসংবাদ না করিয়া তাঁহারা যেরূপ ছিলেন, সেইরূপ হইতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ভারতের আর্য্য মধ্য এসিয়া হইতে, ককেসস পর্ব্বত হইতে, মরুভূমি হইতে ভারতে আসিয়া-ছিলেন—এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিত আলোচনা করুন। আমরা জানি ভারতেই এই গৌরবর্ণ জাতির নিবাস। যে কারণে মধ্য এসিয়ায় সেই গৌরবর্ণ জাতির আবাসস্থল মানা যায়, সেই কারণেই ভারতের অধিবাসীই বা না বলা হয় কেন? হিমালয়ের পাদদেশে ব্রহ্মবর্ত্ত দেশই তাহাদের আদিম নিবাস। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি আর্য্যজাতির বাস-স্থান হইল। আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা ভারতের অধিবাসী নন বলিয়া অণুমাত্র সংশয় আমাদের মনে জাগে নাই। মধ্য এসিয়ায় আর্য্যজাতির আবাস ছিল তাহার কোন বর্ণনা সংস্কৃত গ্রন্থে দেখি না। হইতে পারে, পাশ্চাত্ত্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ মধ্য এসিয়া বা ককেসস পর্ব্বত হইতে ইউরোপে গিয়াছিলেন; তাহাতে কি ভারতের অধিবাসীকে তাঁহাদের বংশধর বলিতে হইবে? ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়, পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে,আর্য্যেরা ভারতের অধিবাসীই ছিলেন।

আমরা আর্য্য—এ কথাটীতে কত গৌরব, কত সুখ বিরাজিত আছে। আর্য্যপদে যে প্রাণময়ী শক্তি, যে ধর্ম্মময় বীজ, যে তপঃপূত জ্ঞান-জ্যোতি মনে পড়ে, তাহার অধিকারী আমরা কি হইব না? কালেও কি সে ভাব ফিরিয়া আসিবে না?

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

মাহিষ্য-কবি দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মী-চরিত্র।

মেদিনীপুর জেলার কাশীযোড়া পরগণার অন্তর্গত ভোগপুর ষ্টেসনের অনতিদূরে কিশোর-চক চণ্ডীতলা নামক গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবি দয়ারাম দাস জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচয় সাহিত্য-সমাজে প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশের শান্তিপ্রিয় পরিশ্রমী কৃষক সম্প্রদায়ের গৃহে

নিত্য নিত্য যে "লক্ষ্মী-চরিত্র" নামক পুঁথি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার রচয়িতা এই কবি দয়ারাম দাস। মেদিনীপুর জেলার সাধারণ লোকের মুখে এখনও কবি দয়ারামের অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

তিনি বাল্যকালে প্রথমে স্বগ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া নিজ প্রতিভা-প্রভাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি দেবী কমলার বলে কবি হইয়াছিলেন। বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশঃ গভীর চিন্তাশীল হইতে লাগিলেন। এমন কি কিছুদিন পরে মধ্যে মধ্যে আহার ও শয়নের কথা ভুলিয়া যাইতেন। প্রবাদ আছে, একদিন তিনি নিশীথকালে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথা চলিয়া যান। দুই দিবস খোঁজ খবর করিয়া কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৃতীয় দিবস সায়ংকালে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বগৃহে আবির্ভূত হইলেন। তিনি এইভাবে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে যে কেবল আনন্দিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তৎপরে তিনি দেশবাসী জনসাধারণকেও আনন্দিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভায় পরে প্রকৃত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দেবী কমলার উদ্দেশে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়াছিলেন। দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণীর বেশে শ্রীচরণ দর্শন দিয়াছিলেন ও বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি "কমলার বরপুত্র" নামে প্রসিদ্ধ। কবি তাঁহার স্বরচিত পুস্তকেও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে,

"দয়ারাম দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র।
ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা যারে দিল গীত ॥"
"দয়ারাম দাস গায় কমলার বরে।"

ইত্যাদি।

কিশোরচক গ্রামে একটী স্থান এখনও অতীত বৃত্তান্তের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ঐ স্থানে শ্রীশ্রী৺চণ্ডীদেবীর ভগ্ন মন্দির আছে। দেবীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। উক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম "চণ্ডীতলা" বা চণ্ডীপাড়া হইয়াছে। স্থানের দৃশ্য এরূপ মনোরম ছিল যে দেখিলেই দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইত। ইহা দেবদেবীর বাগান বা বাগিচাপাড়া নামেও অভিহিত হইত। কথিত আছে, কবি ঐ স্থানে কমলাদেবীর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছিলেন। স্থানটীর দৃশ্য যেরূপ রমণীয় তাহাতে সহজেই ভাবুকের চিত্ত আকুলিত হইয়া কবিত্বের উৎস ছুটিত। এই কবিকুঞ্জে তিনি নিজের উন্মেষশালিনী প্রতিভার প্রভাবে নিত্য নব নব মাল্য রচনা করিয়া মাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন।

কবির নিকট অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত. তাহারা আহার ও বাসস্থান পাইত। কাশীযোড়াধিপতি দানবীর রাজা তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কবি স্বরচিত "লক্ষ্মী-চরিত্র" পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

"কাশীজোড়া মহাস্থান, মহারাজ নন্দনারাণ,
ধন্য ধার্ম্মিক নরপতি।
হয়্যা তার পৃতিষ্ঠীত, দয়ারাম রচে গিত।"

(১২১৮ সালের হস্তলিখিত পুঁথি)

অনেকে বলেন তাঁহার উপাধি 'বেরা' ছিল; কমলার বর প্রাপ্তির পর তিনি কমলার দাস এই অর্থে দাস উপাধি লয়েন। কবির সন্তানের মধ্যে একটী কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম মতি দেবী। ঐ গ্রামের ভীমাচরণ সামন্ত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। কথিত আছে ভীমাচরণ সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন। তিনি কবির অনেক সঙ্গীতাদির তান-লয় সংশোধনে সহায়তা করিতেন।

ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ভীমাচরণের বংশ-লতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

৺ভীমাচরণ + ৺মতিদেবী

৺রসিকমোহন + ৺অহল্যা

৺অদ্বৈত + বিলাসিনী ৺নিত্যানন্দ ৺চৈতন্য + গৌরী

ঈশ্বর (বয়স ২৪ বৎসর) + গিরিবালা

এই বংশের একমাত্র বংশধর শ্রীমান ঈশ্বর-চন্দ্র সামন্ত দীনভাবে উক্ত গ্রামে জীবন যাপন করিতেছেন। যেখানে কবির বাসস্থান ছিল, সেই স্থানটী প্রায় ৭।৮ বিঘা হইবে। উহার মধ্যে একটী পুকুর এবং উহার চারি পাশে বৃত্তাকারে একটী পরিখা বা গড় কাটা আছে। এখনও ঐ পুকুরটীকে 'কবির পুকুর', গড়টীকে 'কবির গড়' এবং স্থানটীকে 'কবির বাড়ী' ও 'কবির ভিটে' বলিয়া থাকে।

কবি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকের কোন কোন স্থানের ভাব সংগ্রহ করিয়া পদ্যের ছন্দে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কলঙ্কভঞ্জন, শিবায়ণ, লক্ষ্মীচরিত্র, তরণী সেনের পালা, ধর্ম্মায়ণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, গোবিন্দমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবরামের যুদ্ধ ও শব্দরূপ এই কয়খানি গ্রন্থ বহু চেষ্টা করিয়া ভোগপুর ছাত্র-সম্মিলনীতে সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্ত গুলি গ্রন্থই ছিন্নভিন্ন ভাবে রহিয়াছে। আজকাল অনেক পাঁচালী-গায়ক আছেন, তাঁহারা কবির গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং স্বীকার করেন যে,—"আমরা কবি দয়ারামের অনুগ্রহে বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি!" যদি তদানীন্তন সময়ে আজকালকার মত মুদ্রাযন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে কবি দয়ারাম আজ সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। চৈত্র মাসের 'গাজনের' সময় অনেক ভক্ত তাহার রচিত শিবায়ণ প্রভৃতি পাঁচালী গাহিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। পল্লীস্থ বালকেরাও কবির রচিত অনেক ছড়া গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামস্থ বালকেরা গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া ও হিসাবাদি শিক্ষা করিবার পর, হস্তলিখিত দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, লক্ষ্মীচরিত্র প্রভৃতি পুঁথি পড়িয়া পাঠ সমাপন করিত। ঐ সময়ে তাহা-দের মাতাপিতা ও শিক্ষক মহাশয় কবি দয়া-রাম রচিত—

'চাষ করি চতুর্ব্বর্গ পায় মহুরায়।'

"লক্ষ্মীকে যে জন চিনে লক্ষ্মী চিনে তারে।
তার দুঃখ নাহি চাবি যুগ যুগান্তরে॥"
'যাহার যেমন মন সে পায় তেমন।'
"ঘৃত অন্নে ভোজন করিবে বার মাস
অভাগা কপাল যার নাহি চাষ বাস।"
"আষাঢ়ের চষা ধান্য পৌষ মাসে পাবে
অসময়ে বপিলে ফল কোথা হতে পাবে॥"

ইত্যাদি অনেক উপদেশপূর্ণ প্রবচন শিক্ষা দিতেন। মোট কথা, অনেক পল্লীগ্রামে খনার বচন প্রভৃতির সহিত কবি দয়ারাম-রচিত অনেক প্রবচন স্থান পাইয়াছে। কোন্ বচন কাহার কর্তৃক রচিত, তাহা বর্তমান সময়ে ঠিক করা কষ্টকর। প্রবন্ধ বৃদ্ধির ভয়ে কবির রচিত অনেক বচন এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল না।

কবি দয়ারাম এইরূপে অক্ষয় যশঃ অর্জন করিয়া অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে নিকটে ডাকাইয়া সকলকে শ্রীহরির নাম স্মরণ করিতে বলিয়া সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

কবি দয়ারাম দাস পরম সাধক ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে একটী বিখ্যাত শীতলা-মণ্ডপ আছে। কবি কোনও কারণবশতঃ এক সময়ে সেই স্থানে গমন করেন এবং তথায় রাত্রিযাপন জন্য একটী বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে শীতলা-মণ্ডপ আছে, এ কথা বোধ হয় তিনি জানিতেন না। তিনি সেই শীতলা-মণ্ডপের দরজার বিপরীত পার্শ্বে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। কথিত আছে, কবি যে দিকে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, শীতলা-মণ্ডপের সেই দিকের দেওয়াল তৎক্ষণাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল।

তিনি সন্ধ্যার সময়ে শিষ্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংকীর্ত্তন করতঃ চতুর্দ্দিক আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেন। কবি পরলোকগমন করিলে, তাঁহার শিষ্যেরা কবির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চামর ও করতালি উক্ত জেলার অন্তর্গত 'কোলেমাজ্য়া' নামক গ্রামে "ধর্ম্মদেবের মন্দিরে" রাখিয়া দিয়াছেন; উহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকিয়া কবির সংকীর্ত্তনরূপ সদনুষ্ঠানের পরিচয় দিতেছে।

"বাণিজ্যে বিস্তর দুঃখ সর্ব্ব সুখ চাষে
চাকর কুকুর যেন ফিরে দেশে দেশে॥"

ইহা তাঁহার রচিত। জগতে গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্য—লোকশিক্ষা। এক একজন ক্ষণজন্মা মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া যান যে, গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাগুলি সেই দেশের অধিবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে লোকশিক্ষা পরিচালন করে। চিত্রকর যেমন চিত্রাঙ্কনের আদর্শ লইয়া অঙ্কন এবং নয়নরঞ্জন, স্বাভাবিক বর্ণ সন্নিবেশ ও উহার প্রতিফলনে কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কবিগণও সেইরূপ এক একটা ঘটনা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে সেই সমস্ত ভাব সন্নিবিষ্ট করতঃ ধন্য ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। কবি দয়ারাম দাস এ দেশের লোক ও কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত মাহিষ্য ছিলেন; সুতরাং যাহাতে কৃষিকার্য্যের বিস্তার হয়, কৃষিকার্য্যকে কেহ ঘৃণার চক্ষে না দেখে, কৃষির

উন্নতি হইলে দেশের উন্নতি হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শ্রীমান্ হওয়া যায়, ইত্যাদি বিষয়ে, যাহাতে আমাদের স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব কাশীযোড়াধিপতি রাজার সভায় কবির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সময়ে সময়ে কবিকে উক্ত সভায় যাইতে হইত এবং স্বরচিত নূতন নূতন পুস্তক পাঠকরতঃ রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইত। রাজা এবং *রাজকর্ম্মচারিগণ আহ্লাদিত হইয়া ধন্যবাদ* এবং পুরস্কার প্রদান করিতেন। তাঁহার রচিত হস্তলিখিত লক্ষ্মীচরিত্র গ্রন্থে এই কাশীযোড়াধিপতির কথা উল্লিখিত আছে। মুদ্রিত লক্ষ্মীচরিত্র পুস্তকে কবি দয়ারাম দাসের নাম পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহাতে এইরূপ আছে:—

কাশীযোড়া মহাস্থান, নর নারায়ণ আখ্যান
ধন্য রাজা ধার্ম্মিক ভূপতি।
হৈয়া তার প্রতিষ্ঠিত কবিবর গায় গীত
তাঁর রাজ্যে যাহার বসতি॥"

এই উদ্ধৃতাংশটী অনেক স্থলে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে। এই অংশটী বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধের মুখে কিংবা আমাদের সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথিতে ইহার অনেক বিপরীত জানিতে পারা যায়।

নূতনের নিকট পুরাতন অনেক সময় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরাও অনেক সময়ে নূতন পাইয়া পুরাতন ভুলিয়া যাই। ১২১৮ সালের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি লক্ষ্মীচরিতে এইরূপ আছে:—

"কাশিজোড়া মহাস্থান মহারাজা নন্দ নারাণ
ধন্য ধার্ম্মিক নরপতি।
হয়্যা তার প্রতিষ্ঠীত দয়ারাম রচে গিত
কিশোরচকে যাহার বশতি॥"

১২৫৪ সালের একখানি পুঁথি হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে রাজা নন্দনারায়ণের স্থলে সুন্দরনারাণ লেখা আছে। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বোধ হয়, কবি রাজা নন্দনারায়ণের রাজত্বকাল হইতে রাজা সুন্দরনারায়ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীদীননাথ দাস পাল (?) হইতে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মাজি প্রণীত "বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র" মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইতেছে। উহার সহিত হস্তলিখিত পুঁথির স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অমিল আছে। আমরা জানি, বর্ণাশুদ্ধি ও পদ্যের অমিল প্রভৃতি থাকিলে সেই সমস্ত শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইলে সংস্করণ করা হয়। যথা—

"বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে
কোথক দিন কাল কাটে কুড্যার ভিতরে॥
ভোজনে ভাজনে নাঞি তাণ্ডে জল খায়।
শনি পীড়া জেন রাজা শ্রীবচ্ছের প্রায়॥"

(হস্তলিখিত পুঁথি দ্রষ্টব্য)

এইরূপ পদ্যের স্থলে সংশোধন করতঃ—
"বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে।
বাস করি থাকে সেই কুঁড়ের ভিতরে॥

জলপাত্র বিহনেতে ভাণ্ডে জল খায়।
শনিপীড়া হৈল যেন শ্রীবৎস রাজায় ॥"

(মুদ্রিত পুস্তক দ্রষ্টব্য)

কিন্তু 'রাজা নন্দনারায়ণ' কিংবা 'রাজা সুন্দরনারায়ণ' স্থলে নরনারায়ণ (নর দিগের নারায়ণ এইভাবে লিখিত ?), 'দয়ারাম' স্থলে 'কবিবর' (যথা—'দয়ারাম দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র' স্থলে 'কবিবর গায় গীত লক্ষ্মীর চরিত্র'), 'কিশোরচক' স্থলে 'তাঁর রাজ্যে' ইত্যাদি লিখিলে সংস্করণ করা হয় না। জানি না, ঠিকানাবিহীন মার্জ্জি মহাশয় কি উদ্দেশ্যে 'কিশোরচক' ও 'দয়ারাম দাসের' নাম (দীননাথ দাস পালই কি দয়ারাম দাস ?) বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ? মুদ্রিত পুস্তকে কেবল মাত্র 'তিলোত্তমা' পালাটিতে কবি প্রহ্লাদ দাসের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও কেবল বিনন্দ রাখালের পালা ব্যতীত অন্য হস্তলিখিত কোন পালা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

(বিনন্দ রাখালের পালার অবিকল প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)

এইরূপে আমরা হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে না পারিলে কবি দয়ারাম দাসের কোন সন্ধান লাভ করিতে পারিতাম না। মুদ্রিত লক্ষ্মী-চরিত্র পুস্তকে তাঁহার নাম বিলোপ করিয়া প্রাচীন কবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালীরা কত যে বাঙ্গালী কবির স্মৃতি হারাইয়া ফেলিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তোগপুর ছাত্রসম্মিলনীতে কবি দয়ারাম দাসের রচিত কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবল বিনন্দ রাখালের পালার (লক্ষ্মী-চরিত্রের একাংশ) অবিকল প্রতিলিপি এবং ১২১৮ সালের হস্তলিখিত পুঁথির কতিপয় জীর্ণ পত্র এবং একখানি মুদ্রিত বৃহৎ লক্ষ্মী-চরিত্র পুস্তক এই প্রবন্ধের প্রামাণ্য উপকরণ স্বরূপ তথাকার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় মহাশয় আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁহার দ্বারা লিখিত। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

(গল্প)

(১)

খুড়িমা বলিলেন, "সে কিরে অমূল্য! বৌমার সঙ্গে কি এম্নি করে ঝগড়া কত্তে হয়? বৌমা আজ কত কেঁদে তার দুঃখের কথা আমাকে বল্লেন। আহা! এমন করে কেন লক্ষ্মীকে কষ্ট দিস্ বাবা?"

উক্ত খুড়িমা অর্থাৎ গ্রাম সম্পর্কীয় বৃদ্ধ হরকান্ত লাহিড়ী খুড়া মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ইনি, অর্থাৎ (খুড়িমা) অতিশয় মুখরা এবং বাচাল স্ত্রীলোক এবং বাটীতে খুড়া মহাশয়ের সহিত এক মুহূর্ত্তও ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু পাড়াপরশীদের

প্রতি ইনি খুব সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, শুনা যায়।

হাজার হোক্ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সেই জন্যই লোকে অনেক স্থলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কথা বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। যাহা হউক খুড়িমা, অমূল্যর শুধু গ্রাম সম্পর্কীয়া খুড়িমা ছিল না, ইহা ছাড়া তাহার অন্য একটী সম্বন্ধও ছিল।

যাহা হউক খুড়িমার উক্ত কথার উত্তরে অমূল্য অতিশয় অপ্রতিভ হইল, এবং মাথা হেট করিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না।

অমূল্য হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার রায় মহিমচন্দ্র রায় বাহাদুরের জ্ঞাতি-পুত্র। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিধবা মাতা কালীসুন্দরী শোকে অধীরা হন এবং পুত্রের ভরণপোষণ বিষয়ে আত্মীয়-জ্ঞাতি মহিম বাবুকে জানান। এবং তাঁহারই ফলে, তিনি উক্ত জমিদার বাবুর বাড়ী হইতে মাসক ১২৲ বার টাকা মাসহরা পাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। কালী সুন্দরী আপাততঃ সাহায্য পাইয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, পুত্র অমূল্যকুমারকে ৫।৬ বৎসর দুঃখে কষ্টে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলে আর তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না, কিন্তু এখন সে আশাতরু ফলবতী না হইয়া প্রারম্ভেই শুষ্ক হইবার উপক্রম হইল। দিবারাত্রি মাতার চক্ষের জলধারা আর নিবারণ হয় না, নিয়তই দুঃখিনী এইরূপে কাটাইতে লাগিলেন, কারণ অমূল্যকুমার পাঠ্যাবস্থা হইতেই কুসঙ্গে মিশিয়া অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীদের গুণে নেশা করিতে শিখিল। এই দলের মধ্যে জমিদার মহিম বাবুর পুত্র দ্বিজেন্দ্রই প্রধান দলপতি ছিল। তাহার সাহায্যে ও তাহার অর্থে মদ্যাদি পান রীতিমত চলিতে লাগিল। সে কিন্তু পিতার শাসন গুণে একেবারে উৎসন্ন যাইতে পারিল না, কিন্তু অমূল্যকুমার সকল রকম অন্যান্য কুঅভ্যাস ও কুক্রিয়ায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। সুতরাং বিধবা দুঃখিনী কালী সুন্দরীর আর দুঃখের অবধি রহিল না। বিধবার একমাত্র আশা ও ভরসা এই পুত্র, তাহার এইরূপ অবস্থা দর্শনে কোন্ জননীর হৃদয় দুঃখে গলিয়া না যায়? অমূল্যকুমার পাঠত্যাগের পর হইতে প্রত্যহ ভোর ৭টায় বাহির হইতেন, এবং মধ্যাহ্ন ২টার সময় বাটীতে আহারার্থে আসিতেন, এবং আহার করিয়া আবার বাটীর বাহিব হইতেন, এবং রাত্রি ১২টা বা ১টার সময় বাটী ফিরিতেন, এবং কোন কোন দিন প্রাতে বাহির হইয়া রাত্রিতে বাটী আসিতেন, কিংবা আসিতেন না।

যখন অমূল্যকুমার এইরূপ বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ কবিলেন, তখন জননী আর কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে মিষ্ট বাক্য ও উপদেশ দ্বারা নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন অমূল্যকুমার কুসঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইল না, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় অমূল্য বাটী আসিবার পর মাতা অতিশয় তিরস্কার করিলেন। সেই দিনই রাত্রে অমূল্যকুমার গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। মাতা কালীসুন্দরী যদিও পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষায়

তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন, কারণ নারী জাতির,বিশেষতঃ জননীর ইহা হওয়া স্বাভাবিক।

কালীসুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে লোক দ্বারা অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। জননী পুত্রের নিরুদ্দেশে অতিশয় শোক-বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদা তাঁহার মন হু হু করিয়া জ্বলিত, আর বলিতেন, "কেন বাছাকে বকিলাম, সে কেন নেশাখোর, পাগল হযে বাড়ীতে থাকৃল না" ইত্যাদি। প্রতিবাসিনীরা সকলে তাহাকে নানারূপ কথা দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তিদেবীব আবির্ভাব হইল না। তিনি বড় বড় জ্যোতিষীর কাছে পুত্রের ঠিকুজী-কোষ্ঠী লইয়া দেখাইলেন, সকলেই তাঁহাকে "ভাল হইবে" এইরূপ আশা দিল।

প্রায় দুই মাস পরে অমূল্যর স্বহস্ত-লিখিত এক পত্র আসিল। পত্রখানি এইরূপ :—

"মা, আমি এখন মনুষ্যত্বের বহির্ভূত হইয়াছি। সুতরাং আমার আশা ত্যাগ করুন। আমি এ জীবনে নেশা ছাড়িতে পারিব না, এবং এ মুখও আর দেখাইব না। বৃথা আমায় পাইবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া অর্থব্যয় করিবেন না।" ইতি আপনার স্নেহের অমূল্য।

পত্র পড়িয়া মাতা নয়ন জলে ভাসিলেন, এবং মনে করিলেন যে তাহার মাতুল শ্রীযুক্ত হরনাথ বাবুকে কিছু টাকা দিয়া পুত্রের অনুসন্ধানে পাঠাইবেন।

কিন্তু অর্থ কোথায়? নগদ একটী মুদ্রাও যে কালীসুন্দরীর নিকট নাই! শেষে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,—তাঁহার পুরাতন "বেনারসী শাড়ীখানি" ও তাহার এক জোড়া "অনন্ত" বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থ দ্বারা মাতুল মহাশয়কে পাঠাইবেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি সিন্দুক হইতে কাপড়, এবং অনন্ত বাহির করিলেন এবং তাহা লইয়া জমিদার বাবুর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্রীযুক্তা রায় পত্নীর কাপড় ও অলঙ্কার পছন্দ হইল এবং তাহা ক্রয় করিলেন। কালীসুন্দরী সর্ব্বসমেত ১৫০৲ দেড়শত টাকা পাইলেন। বাটী আসিয়া সেই মুহূর্ত্তেই মাতুল মহাশয়ের নিকট যাইয়া সেই টাকাগুলি দিলেন। হরনাথ বাবু কালীসুন্দরীর নিকট এত টাকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কাপড় ও গহনা বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং হরনাথ বাবু তাঁহার হাতে ২৫৲ পঁচিশ টাকা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "মা, এ কয় টাকা তোমার কাছে রাখিয়া দাও, আমি নিজে এ পঁচিশ টাকা দিব।"

কালীসুন্দরী অগত্যা মাতুলের অনুরোধে টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন, এবং যাহাতে তিনি সেইদিনই অপরাহ্নে রওনা হন, সেজন্য তাঁহাকে বলিয়া বাটী ফিরিলেন।

(২)

দিন গেল, রাত্রি আসিল। দিন যায়, রাত্রি আসে, কিন্তু দিন যাহা লইয়া গেল, রাত্রি কি তাহা পুনরায় আনিতে পারে? এ সংসারে দুঃখের পর সুখ, বিরহের পর মিলন, সংযোগের

পর বিয়োগ, অমানিশার পর ফুল্লজ্যোৎস্নাময়ী রজনী ত আছেই। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোনও কালে পরিবর্ত্তন হইবে না।

ক্রমে কালীসুন্দরীর মানসিক অবস্থাও মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল; যেন অমানিশার ঘোর তামসী নিশীথিনী ঘনঘোর মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইল। দুঃখিনী কালীসুন্দরী প্রত্যহ পত্রের আশায় পথপানে চাহিয়া থাকেন কিন্তু পত্র না আসিয়া হঠাৎ একদিন একখানি টেলিগ্রাম আসিল, তাহাতে কেবলমাত্র এই কয়টী কথা লেখা ছিল,—"ভাববেন না, শীঘ্রই অমূল্যকে লইয়া রওনা হইতেছি।"

কালীসুন্দরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে শুনিবার পর হইতেই কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে—মনে করিয়া মূর্চ্ছিতা হইবার ন্যায় হইয়াছিলেন, কিন্তু পাড়ার মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্র অবিনাশ সংবাদ পড়িয়া বলিল,—"সংবাদ ভাল, ভয় নাই।" তখন মাতা স্থির হইয়া পুত্রের সংবাদ শ্রবণে সুস্থ হইলেন। তৎপর দিবসই পত্র আসিল, এবং কালীসুন্দরীর সত্য খবর বলিয়া বিশ্বাস হইল, এবং অমূল্যকুমার সেখানেও এক নেশাখোরের আড্ডায় ছিল, ইত্যাদি সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন।

যাহা হউক্, ৩।৪ দিন পরেই হরনাথ অমূল্যকে লইয়া হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছিলেন। মাতা অনেক দিন পরে নয়নের ধ্রুবতারা এক মাত্র পুত্রকে পাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। প্রতিবাসীরা সকলেই বলিলেন যে, "অমূল্যকুমারের বিবাহ দিলেই ভাল হইবে।" কালীসুন্দরী অগত্যা অমূল্যর বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কি কেহ চরিত্রহীন, নেশাখোর পাত্রের সহিত স্নেহের কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারে? সুতরাং দেশের মধ্যে কেহ অমূল্যকে কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল না। পরে তাহার জ্যেষ্ঠ মাতুল শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু কলিকাতার নিকট বরাহনগরে এক ভদ্র বংশের কন্যার সহিত অমূল্যর বিবাহের সমস্ত স্থির করিলেন। কন্যার পিতা দীননাথ বাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু সেইজন্যই কন্যাকর্ত্তারা দীননাথ বাবুর কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন।

(৩)

আজ অমূল্যকুমারের বৌ আসিয়াছে। আজ মাতা কালীসুন্দরীর কি আনন্দের দিন, কিন্তু তাহা হইলেও নারীজাতির স্বভাব কোন আনন্দের দিনে অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

কালীসুন্দরীও তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর মৃত্যু এবং তাঁহার নানাবিধ কথা স্মরণ করিয়া আজ এই আনন্দের দিনেও অশ্রুত্যাগ করিতে ছাড়িলেন না।

একমাত্র পুত্র অমূল্যকুমার, তাহার বিবাহে আত্মীয় স্বজনকেও আনিবার সামর্থ্য নাই, কাজে কাজেই কালীসুন্দরীর দুঃখের ইহাও একটী প্রধান কারণ হইয়াছিল।

নব বধু তত সুন্দরী না হইলেও, মোটের উপর মন্দ নয়, কিন্তু প্রথম হইতেই অমূল্যকুমারের কি কু-নজরে যে পড়িল, সে দিনের অনেক দিন পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। অমূল্যকুমার বধুমাতাকে দেখিতে পারিতে না ... বলিয়া

কালীসুন্দরী কতদিন, কতরূপে বুঝাইলেন ও ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। অমূল্যকুমার বিবাহের পর কিছুদিন শ্রীযুক্ত হরনাথ বাবুর ভয়ে কুসঙ্গে মিশিতে পারে নাই, কিছুদিন পরেই হরনাথ বাবুর কলিকাতা গমনের সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই, পুনরায় সে পূর্ব্বোক্ত আড্ডায় মিশিল, এবং ২।৪ দিন মধ্যেই পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

মাতা ঠাকুরাণী কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। যে আশা পুনরায় তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল, তাহাও নিষ্ফল হইবে ভাবিয়া এবং অমূল্যর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি দুশ্চিন্তারূপ মহাসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। দিন দিন অমূল্যকুমারেরও অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। শরীর অতি জীর্ণ শীর্ণ, এবং মদ্য পান প্রভৃতি কুক্রিয়ায় শিথিল হইয়া পড়িল, এবং সকলেই বলিল,—"অমূল্য আর বেশী দিন বাঁচিবে না।"

সেই সময় হইতে কালীসুন্দরী অমূল্যর উপর বিশেষ যত্ন লইতে আরম্ভ করিলেন। নব বধূ বিবাহের পরই পিত্রালয়ে গিয়াছিল, তাহাকে আনা হইল, তথাপি অমূল্যর কিছুমাত্র মনের পরিবর্ত্তন হইল না, বরং বধূর প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যবহারই রহিল। ইহা ছাড়া তিনি তাহাঁকে বড়ই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাতে বালিকা মনোরমা ভাবিল,—"এজগতে স্বামীই স্ত্রীজাতির একমাত্র সম্পদ, তাহার নিকট সন্দেহ এবং ঘৃণার পাত্র হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।" ইহা ভাবিয়া বধূ একদিন পাড়ার মধুকে দিয়া আফিং আনাইয়া খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার বুদ্ধিমতী শাশুড়ী ঠাকুরাণী কৌশলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

কালীসুন্দরী অমূল্যর এরূপ ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র ভাবিলেন,—"হয়ত আজকাল অত্যধিক নেশা করিতেছে, নচেৎ এরূপ তো কখন হয় না।"

কালীসুন্দরী স্বয়ং জমিদার মহিমবাবুকে এ সমস্ত বিষয় জানাইলেন, এবং যাহাতে তিনি অমূল্যকুমারকে ডাকাইয়া কিছু উপদেশ দেন, তজ্জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসিলেন। বৈকালে একজন দরোয়ান আসিয়া অমূল্যকুমারকে ডাকিয়া লইয়া গেল। মহিমবাবু অমূল্যকে কাছে বসাইয়া নানারূপ বুঝাইলেন, এবং উপস্থিত দুরবস্থা, এবং মাতা ঠাকুরাণীর ও তাহার স্ত্রীর দুঃখের কারণ সমস্তগুলি বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। অমূল্য নিঃশব্দে মস্তক অবনত করিয়া সমস্ত শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, সত্য সত্যই তিনি তাঁহার মাতা এবং স্ত্রীর অশান্তির একমাত্র কারণ। তাঁহার স্ত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা, এবং তাঁহার মাতার মনঃপীড়ার একমাত্র হেতু তিনি। আরও বুঝিলেন যে, মানবমাত্রেই মরণশীল। কে কখন এই জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। যে আজ লক্ষপতি হইয়া অতুল সম্পদ উপভোগ করিতেছে, সেও এক

দিন কালের করাল গ্রাস হইতে নিস্তার পাইবে না। সুতরাং এই মায়াময় পৃথিবীর নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, এবং তিনি বুঝিলেন, উচ্ছৃঙ্খল ও লম্পটভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা, সেই পরম শান্তি লাভের জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কর। সেইদিন হইতে তিনি মনুষ্যত্বলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং তজ্জন্য অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে অমূল্যর কিঞ্চিৎ বাহ্যিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল।

সন্ধ্যা হইল। মহিম বাবু অমূল্যকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরবাড়ীতে গেলেন। ঠাকুরবাড়ীতে দৈনিক অতিথি সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং সাধু সন্ন্যাসী অতিথি প্রভৃতি প্রায়ই এই বাড়ীতে আসিত। অমূল্যও সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভালবাসিত, কারণ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে গঞ্জিকাদি সেবন উত্তমরূপে চলিত, কিন্তু এখন অমূল্যকুমারের আর সে অভিপ্রায় নাই, বলিয়া বোধ হইল। সে এখন আর সন্ন্যাসীদের নিকট গঞ্জিকাদি সেবনের নিমিত্ত যায় না, বরং কোন সদ্‌গুরু বা সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে ঘুরিত, এবং তখন হইতে তাহার সাংসারিক বৈরাগ্যের চিহ্নও কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল, শীতলের পর মহিমবাবু অমূল্যকে বৈকালিক প্রসাদ ভোজন না করাইয়া ছাড়িলেন না।

অমূল্য প্রসাদ গ্রহণান্তে বিদায় লইলেন। আসিবার কালীন পথে শুনিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীতে এক মহাত্মা সাধু আসিয়াছেন। অমূল্য এই কথা শুনিয়া অবধি সদ্‌গুরু লাভের আশায় কোনরূপে সে রাত্রি কাটাইয়া, অতি প্রত্যুষেই মহিমবাবুর বাটী গমন করিলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে অতিথিশালার একটী ঘরে সেই নবাগত, সৌম্য, দীর্ঘশ্মশ্রুধারী সাধু বসিয়া আছেন। অমূল্যকুমার সাধুকে প্রণাম করিলেন। সাধুও তাঁহাকে নিজ আসনে বসিতে স্থান দিলেন, কিন্তু অমূল্যকুমার তাহাতে না বসিয়া মাটীতেই উপবেশন করিলেন। সাধুর সহিত নানারূপ শাস্ত্রীয় কথাবার্ত্তা চলিল, এবং অতঃপর অমূল্যর প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহাকে গুরুরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধু যুবকটীর এরূপ সাংসারিক বৈরাগ্যদর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং যাহাতে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে, তদ্বিষয়েই নানারূপ উপদেশ দিলেন, কিন্তু অমূল্যকুমার আর এই সাধুকে ছাড়িলেন না। দুই দিবস পরে সাধুর সেখান হইতে অন্যত্র যাইবার কথা ছিল, অমূল্যকুমার তাঁহার সহিত যাইবে মনস্থ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে, সন্ধ্যার সময় সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এ দিকে বাটীতে মাতা কালীসুন্দরী পুত্রের অনুপস্থিতিতে ভাবিলেন,—হয়ত মহিমবাবু আসিতে দেন নাই, তাই তাঁহারই বাটীতে আছে। কালীসুন্দরী মহিমবাবুর বাটীতে অমূল্যর অনুসন্ধানের জন্য পাড়ার গোয়ালা-পিসীকে পাঠাইলেন। গোয়ালা-পিসী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পুত্রের কোন উদ্দেশ পায় নাই, এইরূপ জানাইল। কালীসুন্দরী ইহা শুনিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন, এবং স্বয়ং পুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

অনেক অনুসন্ধানেও পুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবার আর নিজ অর্থে দূরদেশে পুত্রের অনুসন্ধানার্থ কোন লোক পাঠাইতে হইল না, এবার অমূল্যর শ্বশুর শম্ভুনাথ গোস্বামী মহাশয় একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে কিঞ্চিৎ মুদ্রাসহ শ্রীমানের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। শম্ভুনাথ বাবুর প্রেরিত লোকটী কলিকাতা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করতঃ কোথায়ও অমূল্যর সন্ধান না পাইয়া প্রায় দুই মাস পরে ফিরিয়া আসিল।

দুঃখিনী মাতা কালীসুন্দরী পুত্রের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মাদরোগগ্রস্তা হইবার উপক্রম হইল। তিনি এখন আর কাহারও সহিত বেশী বাক্যালাপ করেন না, সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হয়। এখন তিনি প্রায়ই নির্জ্জনে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া প্রতিবাসিরা উন্মাদ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুঃখিনী কালীসুন্দরী বধূমাতাকে লইয়া প্রায় দুই বৎসর জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইলেন।

কাশীধামের নিকটবর্ত্তী সারনাথ নামক স্থানে স্বামী যোগানন্দের আশ্রম। এই যোগানন্দ স্বামীকে পাঠক চিনিতে পারিয়াছেন কি? যে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের অমূল্যকুমার চিরদিনের মত সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, ইনিই সেই সন্ন্যাসী—যোগানন্দ স্বামী।

বৈশাখ মাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে মাঝে মাঝে "লু" চলিতেছে। অমূল্যকুমার স্বামিজীর আহারের পর খাদ্যাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমের একটী ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব অমূল্যকুমারকে তাঁহার ঘরে ডাকিলেন। অমূল্যকুমার তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্বামী যোগানন্দ ধীরে ধীরে অমূল্যকুমারকে কহিতে লাগিলেন,—"দেখ অমূল্য, প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল, তুমি আমার সঙ্গে আসিয়াছ। তোমার মাতা এবং স্ত্রী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিলে তোমার সন্ন্যাসাশ্রমের কোন ক্রিয়াই ফলবতী হইবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি পুনরায় সংসারী হইয়া, তোমার জননীর সেবা কর।" গুরুদেবের মুখে এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া অমূল্যকুমারের সংসারের কথা মনে পড়িল। সেই স্নেহময়ী জননীকে অব্যক্ত যন্ত্রণা দেওয়া, পতিপরায়ণা সাধ্বী-সতী স্ত্রী মনোরমার প্রতি দুর্ব্যবহার, ইত্যাদি আপনার ঘৃণিত ব্যবহারের কথা অমূল্যকুমারের মনে উদিত হইয়া, অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। তিনি গুরুদেবের আদেশের কোন প্রতিবাদ না করিয়া অবনত শিরে তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইলেন। তৎপরে স্বামীজী অমূল্যকে ৺কাশীধাম হইতে হরিশ্চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত যাইবার গাড়ীভাড়া ইত্যাদি দিয়া বিদায় দিলেন। অমূল্যও গুরুপদধূলি মস্তকে ধারণকরতঃ ৺কাশীধাম হইতে রওনা হইয়া যথাসময়ে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

পাড়ার কেহ কেহ আসিয়া কালীসুন্দরীকে অমূল্য আসিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বেই সংবাদ দিল, কিন্তু তিনি সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কারণ, তিনি পুত্রের বিষয় একেবারেই নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি যে শেষ বয়সে পুত্রমুখ দেখিয়া সুখে মরিতে পারিবেন, সে আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" সুতরাং কালীসুন্দরীর দীর্ঘকাল দুঃখভোগের পর শুভদিন আসিল। তিনি বহুদিনের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমানা হইলেন।

অমূল্যকুমার এখন আর সে নেশাখোর ঘৃণার্হ অমূল্য নাই; এখন সে একজন সৎপথাবলম্বী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সহবাসগুণে মানবের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সাধু যুবকই এক সময়ে কুসঙ্গে মিশিয়া অতিশয় নেশাপ্রিয় এবং নানারূপ ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। আবার এখন সেই যুবকই সৎসহবাসে দেবতুল্য স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অমূল্যকুমারের মাতা কালীসুন্দরী পুত্রকে পুনরায় কোলে পাইয়া, আশ্বস্তা হইলেন এবং দেবদেবীর নিকট মানত পূজা প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে যত্নবতী হইলেন।

দুই চারি দিবসের মধ্যেই অমূল্যকুমারের কল্যাণার্থ দেবপূজাদি সুসম্পন্ন হইল। কালীসুন্দরী অমূল্য এবং বধূমাতাকে লইয়া পরম সুখে পুনরায় সংসার করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ প্রতিবেশীরা সকলেই অমূল্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে আসিল; এবং সেইদিনই গ্রাম মধ্যে "আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন" এই কথাটী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যবিনোদ।

কে তুমি?

বহুদিন হ'তে হৃদয় আমার
বিষাদ-ধূলিতে ম্লান,
কে তুমি গো, আজ কি আনন্দ-জলে
আমারে করালে স্নান।
আশায় বসিয়া ছিনু যে সুপ্ত
দুঃখে মুছিয়া আঁখি,
কে তুমি জননী?—জাগালে আমারে
কখন্ কি মন্ত্রে ডাকি?
আজি উন্মুক্ত করিয়া অনেক দিনের
রুদ্ধ হৃদয়-দ্বার,
বল কে তুমি গো, আনন্দ-প্রতিমা
সম্মুখে দাঁড়ালে আমার?

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

পাপীর প্রার্থনা।

(১)

জানি না তোমারে আমি,
কোন্ দিকে আছ স্বামী,
জানি না কেমন রূপ, থাক তুমি কোথা।
জানি না ভকতি স্তুতি,
অবিশ্বাসী পাপী অতি,
নাহি মম জ্ঞান, ধ্যান আর একাগ্রতা॥

পশু হয়ে নরাকারে,
আছি পড়ে অন্ধকারে,
অধম পাষণ্ড হয়ে, জান অন্তর্যামী।
পাপের অনল শুধু,
হৃদে জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ,
নাহি দিন, নাহি সন্ধ্যা, নাহি নাথ যামী॥

(২)

কেবল শুনি গো কাণে,
"আছ তুমি সব স্থানে,
সতত সদয় তুমি পতিতের প্রতি।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
তুমি নাকি সর্ব্বেশ্বর,
তুমি কালী, তুমি হরি, বিশ্ব-মূলাধার।
বিপদে ডাকিলে পরে,
তুমি নাকি ত্বরা করে,
রক্ষা কর পাপী জনে ওহে সারাৎসার॥"

(৩)

তবে আমি দয়াময়,
রব কিগো নিরাশ্রয়,
আশ্রয় যখন তব অভয় চরণ?
দয়া করি তুমি প্রভু,
রাখিবে না মোরে কভু,
হবে না কি পতিতের কামনা পূরণ?
আঁধার যামিনী প্রভু,
পোহাবে না কি গো কভু,
আবার যামিনী পরে পূত জাগরণ?
পৃথিবীর জ্বালা, ক্লেশ,
কহ ওগো হৃদয়েশ,
কবে কোথা মম হবে সমাপন?

(৪)

অসহ্য পাপের ভার,
কত কাল স'ব আর,
কখন ভাঙ্গিবে প্রভো রঙ্গীন স্বপন?
কেটে যাবে ঘুম-ঘোর,
মোহের মদিরা মোর,
হৃদি হতে হবে দূর কেমনে, কখন?
অজ্ঞানতা, অন্ধকার,
ছাড়িবে কি মোরে আর,
পাব কি দেখিতে প্রভো, আলোক জ্ঞানের?
অনিত্য সংসার লীলা,
অলীক ভোগের মেলা,
কবে হবে শেষ নাথ এই অধমের?

(৫)

প্রবল ইন্দ্রিয়-দাহ,
জ্বলে হৃদে অহরহঃ,
কেবল কুচিন্তা আর লালসা ভীষণ।
শুচি, বুদ্ধি, সংযমতা,
অনুরক্তি, পবিত্রতা,
নাহি কিছু হৃদে মোর কেবল বাসনা।
চাহি না তোমারে প্রভু,
নাম নাহি লই কভু,
ইন্দ্রিয় সুখের চিন্তা করি অবিরত।
বিবেক গিয়াছে সরে,
মতি, গতি বহু দূরে,
নাহি আর মোর মাঝে পূত মানবত্ব॥

(৬)

সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী,
দেখিছ নিয়ত তুমি,
পাপ-দগ্ধ প্রাণে মম কিবা আছে-সার।

শুধু স্বার্থ সিদ্ধি তরে,
ডাকি মুখে বারে বারে,
মন কিন্তু অবিরত ঘোরে চারিধার ॥
চাহি ভোগ, চাহি অর্থ,
ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থ,
চাহি শুধু সংসারের অনিত্য বিভব।
শুনি না তোমার কথা,
গাহি না তোমার গাথা,
ভণ্ডতার আবরণে মিথ্যা কলরব ॥

(৭)

বদ্ধ আমি মায়া-ফাঁদে,
মত্ত আমি মোহ-মদে,
ভক্তি, স্তুতি, জ্ঞান, ধ্যান গেছি পাশরিয়া।
বিবিধ পাপেতে নাথ,
মগ্ন আমি দিন রাত,
শুনি না তোমার ডাক কভু মন দিয়া ॥
যোগ, যাগ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
বুঝি না কিছুর মর্ম্ম,
কেবল সুখের স্বপ্নে আছি দিন রাত।
দেখিছ সকলি তুমি,
কি আর বলিব আমি,
সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী নিখিলের নাথ ॥

(৮)

নাহি কি উপায় মোর,
এ বিরহ বিঘ্ন ঘোর,
হবে না কি কভু দূর পতিত-পাবন ?
প্রিয়তম সুহৃদেরে,
রাখি মোর হৃদি পরে,
হব না কি তৃপ্ত কভু আমি নরাধম ?
এই ঘোর বিভাবরী,
ত্বরা নাথ দূর করি,
দিবে না কি পাপিষ্ঠেরে কভু দরশন।
অসহ্য বিরহ ঘোর,
হবে না কি কভু দূর,
যাবে না কি দরিদ্রতা দারিদ্র্যভঞ্জন ?

(৯)

তবে কেন দয়াময়,
সর্ব্ব স্থানে পরিচয়,
সতত তোমার নাম দয়া নাহি হ'লে ?
কাঙ্গালের বন্ধু তুমি,
অনাথ জনের স্বামী,
কেন তব নাম যদি না রাখ দুর্ব্বলে ?
ভক্ত যারা নিজ গুণে,
লভে তাঁরা নিত্য ধনে,
পাপী যারা হয় তারা কৃপায় বঞ্চিত।
পাতকী-তারণ তবে,
কেন তোমা বলে সবে,
পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ বলে তুমি খ্যাত ?

(১০)

সকলি কি ভিত্তিহীন,
বুঝে না কি কিছুই দীন,
কেবা তুমি মহাজন জগত-রচক ?
নাহি জ্ঞান, ভক্তি, বুদ্ধি,
কেমনে গো উপলব্ধি,
করিব তোমায় আমি নিখিল-পালক ?
জ্বাল দীপ অন্ধকারে,
তুমি প্রভো দয়া করে,
টেনে লও অভাগারে তোমার চরণে।
তুমি জগতের গুরু,
তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
রক্ষ নাথ দয়া করে পতিত অভাজনে ॥

(১১)

সংসার সমুদ্র পার,
তুমি বিনা কেবা তার,
কবে নাথ অবিরাম যদি নাহি থাক।
অসহায়ে দয়া করে,
কে আর সাহায্য করে,
কে আর ঘুচায় সদা দরিদ্রের দুঃখ ?
মাভৈঃ মাভৈঃ নাদে,
জাগ নাথ এই হৃদে,
বিরহ বিষাদ মোর কর নাথ দূর।
যবনিকা নাটকের,
স্বপ্ন, দুঃখ প্রমোদের,
ফেলে দাও দীনবন্ধু কর সব চূর।

শ্রীশীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পুরোহিত।

বৈশাখ মাস, দুপুর বেলা, মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গরুগুলা সব মাঠ-ঘাট পরিত্যাগ করিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া জাবর কাটিতেছে। রাস্তায় কচিৎ দু-একজন লোক যাতায়াত করিতেছে। এমন সময় শিরোমণি মহাশয় জীর্ণ ছত্র মাথায় দিয়া গৃহা-ভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত নাম কি তাহা গ্রামের অনেকে জানে না। তাঁহাকে সকলে শিরোমণি মশায় বলিয়াই ডাকে। শিরোমণি উপাধিটী তিনি কোথা হইতে পাইলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তিনি উহা কোনও ব্রাহ্মণ-সভা হইতে প্রাপ্ত হন নাই। শিরোমণি মহাশয় ভট্টাচার্য্য মানুষ, নামাবলী গায়ে, চটিজুতা পায়ে দুর্গাপুর গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন। কি এক গভীর চিন্তার ছায়া তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখখানিকে বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি চিন্তায় বিভোর হইয়া একমনে চলিতেছেন,—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। দুর্গাপুরের জমিদার-বাটির দেওয়ান যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে ডাকিলেন, উত্তর নাই। দেওয়ান যদুনাথ বৃদ্ধ; ভোজ-নাদি সমাপন করতঃ বাহিরের ঘরে বসিয়া বিশ্রামলাভ ও তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। কোনও কাজ নাই, সুতরাং শিরোমণি মহা-শয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল। পুনরায় একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন "ও শিরোমণি ম'শায়, বলি কদ্দূর!" এবার শিরোমণি মহাশয়ের কর্ণে আওয়াজ পৌঁছিল। তিনি দাঁড়াইলেন; দেখিলেন দেওয়ান যদুনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়া। তিনি কষ্টে মুখে হাসি আনিয়া কহিলেন,—"দেওয়ান জী ম'শায় যে, বলি কি হয় ?"

যদুনাথ। আসুন আসুন, তামাক ইচ্ছে করে যান।

শিরো। আর তামাক ইচ্ছে করে যান; আজকাল মান-রক্ষা করাই ভার হয়ে উঠ্‌ল।

মান বাঁচান ভার হইলেও তামাক ইচ্ছার লোভ-সংবরণ করা শিরোমণি মহাশয়ের পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে দেও-য়ানজীর নিকট আসিয়া বসিলেন, এবং আম্র-পত্রের এক নল প্রস্তুত করিয়া হুকা গ্রহণ

করিলেন। শিরোমণি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অপরের হুকায় তাম্রকূট সেবন নিষিদ্ধ; তাই বোধ হয় এই আম্র-পত্রের নলের ব্যবধান প্রয়োজন। তিনি একমনে ধূমপান করিতে লাগিলেন, মুখে কোনও কথা নাই। অগত্যা দেওয়ানজীকে প্রথমে কথা আরম্ভ করিতে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি শিরোমণি ম'শায়, মান-রক্ষা করা ভার হয়ে উঠ্‌ল কেন? শিরোমণি মশায় আরও কিয়ৎকাল ধূমপান করিয়া জবাব দিলেন, "ও পাড়ার কেদার চাটুজ্যের ছেলে নবীন আমায় আজ তার বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্য বলেছিল।"

"আপনি বুঝি তাই এখন সেখান থেকে শ্রাদ্ধাদি সেরে আসছেন।"

"আমায় শ্রাদ্ধ করাতে দিলে ত সেরে আসব, তবে আর বল্‌ছি কি।"

যদুনাথ সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম?"

শিরোমণি মহাশয় কিয়ৎকাল নীরবে ধূমপান করিয়া কহিলেন, "নবীন শ্রাদ্ধ করিতে বসিল, আমি মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলাম— "ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্যং", উদ্ধত যুবক মন্ত্রপাঠ করিল না, মন্ত্রের ব্যাকরণ ভুল ধরিয়া বসিল, বলিল, "নমস্কৃত্যং! যপ্‌ প্রত্যয়ান্ত পদে অনুস্বার কি করিয়া আসিবে!" আমি ত অবাক্‌! আমার জীবনে কখনও এরূপ প্রতিবন্ধক পাই নাই। ভাল কথায় বুঝাইলাম "একমনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করিতে হয় বাবা, যা বলি তা বল।" ফল কিন্তু ইহাতে বিপরীত হইল। নবীন অবজ্ঞাভরে কহিল "তা বলিয়া কি তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতন যা বলিবেন তাই বলিতে হইবে।" আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

যদু। আপনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন না কেন?

শিরো। আমার রাগ করিয়া আর চলিয়া আসিতে হইল না, এমনিই উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল।

যদু। কি রকম?

শিরো। আমাদের দেবেন সেখানে উপস্থিত ছিল। নবীন তাহাকে বই দেখিয়া মন্ত্র পাঠ করাইতে বলিল। দেবেনও তার কথা মত 'হিন্দুসৎকর্ম্মমালা' লইয়া শ্রাদ্ধ করাইতে বসিল। আমার অপমান চরম সীমায় উঠিল, আমি গাত্রোত্থান করিলাম।

যদু। নবীনের কার্য্যে দেবেনেরও সহানুভূতি ছিল?

শিরো। তাই ত বোধ হ'ল।

জমীদার দেবীপ্রসাদ মৃত্যুকালে যদুনাথের দুইটি হাতে ধরিয়া বলিয়া যান,—যদু, আমার দেবেন রইল, আর জমীদারী রইল, দেখো। দেবেন তখন স্কুলে প্রবেশিকা পড়ে। তখন হইতে যদুনাথ জমীদার-বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং দেবেনের অভিভাবকস্বরূপ। শিরোমণি মহাশয়ের ঈদৃশ অপমানে দেবেন লিপ্ত থাকায় যদুনাথ বাস্তবিকই ব্যথিত হইল। আর নবীন, তাহাকে ত যদুনাথ উচ্চশিক্ষিত সৎযুবক বলিয়াই জানেন। সে দেবেনের বাল্যবন্ধু, শুধু তাই নয়, জমীদার-বাটীর পরিবারবর্গের মধ্যেও

গণ্য ; সম্প্রতি দেবেনের সহিত একত্রে সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষা দিয়া দেশে আসিয়াছে এবং সংস্কৃত-শিক্ষা-বিস্তারকল্পে নানা স্থানে টোল স্থাপন করিবার জন্য দেবেনকে অশেষ প্রকারে উৎসাহ দিতেছে। সে কেন আজ শিরোমণি মহাশয়ের উপর অযথা অত্যাচার করিল, তাহা বৃদ্ধ যদুনাথ অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

শিরোমণি মহাশয় বৃথা বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এখন আসি দেওয়ান জী ম'শায়, দেরী হইয়া যাইতেছে। আমার এখনও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করা হয় নাই।"

"তবে আসুন আর কি বল্‌ব বলুন।"

শিরোমণি মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার সেই জীর্ণ ছত্রটী মাথায় দিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বাল্যকালে শিরোমণি মহাশয় বাচস্পতির টোলে প্রাণপণে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আবৃত্তি করেন। "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী" এই ভাবিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তিনি ব্যাকরণের অর্থবোধ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাকে দশ কর্ম্ম বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার ব্যাকরণ-জ্ঞান আবৃত্তি পর্য্যন্ত থাকায়, মন্ত্রাদির উচ্চারণ স্থানে স্থানে অশুদ্ধ হইত এবং সেই ফলে আজ তিনি অবমানিত।

শিরোমণি মহাশয় চলিতে চলিতে কত কি ভাবিতেছেন। মান-রক্ষার চিন্তা, অন্ন-চিন্তা, কন্যাদায়-চিন্তা, আরও কত কি চিন্তা তাঁহার মনে একে একে উদয় হইতেছে। তাঁহার ভাবনার শেষ নাই, কিন্তু তাঁহার গন্তব্য-পথের শেষ আছে। তিনি ভাবিতে ভাবিতে নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে তাঁহার কন্যা অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়া ছিল; পিতাকে বিষণ্ণ বদনে রিক্তহস্তে ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এমন ভাবে শুধু হাতে?" শিরোমণি মহাশয়ের উত্তর দিবার কি আছে? তিনি নীরবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(২)

দেবেন তাহার পাঠাগারে বসিয়া নবীনের সহিত সংস্কৃত-ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। ব্রত-পূজাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর দুই বন্ধুর বাল্যকাল হইতেই অনুরাগ। কিন্তু হইলে কি হয়, কতকগুলি ভাষাজ্ঞানরহিত পুরোহিতের কার্য্যে ইহারা একেবারে বীতশ্রদ্ধ। পূজার মন্ত্র অশুদ্ধ হইলে অনুষ্ঠিত কার্য্য পণ্ড হয় এবং সেই হেতু যে ক্রমে ধর্ম্মের অবনতি ঘটিতেছে, ইহাদের মধ্যে এই ধারণাটা বদ্ধমূল। তাই আজ ইহারা গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পুরোহিত গঠন ও সঙ্গে সঙ্গে মূর্খ ভট্টাচার্য্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে ব্যস্ত।

দেবেন বলিলেন "আমাদের এলেকায় আপাততঃ মোট এগারটী টোল স্থাপন করা হয়েছে ; তার মধ্যে দেখ্‌ছি ৩।৪টা বড় সুবিধা রকম হচ্ছে না।"

নবীন। তা আজ বি াালে চল না, অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু করা যাক্।

দেবেন। হাঁ, আর একটা কথা। কাল যদু কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা হ'ল। তিনি বলেন, কুল-পুরোহিত ত্যাগ করে অনেকে হয়ত টোলের শিক্ষিত পণ্ডিতগণকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌তে চাইবে না।

নবীন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির এক্ষণে সবই ত গিয়েছে; সে বেদধ্বনিও নেই, সে যাগ-তপাদিও নেই। আছে কি! আছে কেবল—কোনও কোনও স্থানের পুরমহিলাগণের মধ্যে পৌরাণিক ব্রত-নিয়মাদি ও কতিপয় নিষ্ঠাবান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের মধ্যে পিতৃ-তর্পণাদি এবং মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে প্রতিমা-পূজাদি। তাও যদি শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য ভাষাজ্ঞানরহিত মূর্খ ভট্টাচার্য্যগণের উপর নির্ভর করে, তা হ'লে এ জাতির অধঃপতনের আর বাকি কি?

দেবেন। সে কথা তুমি আমি বুঝলুম, সকলে ত বুঝবে না।

নবীন। যা'তে বোঝে তা কর্‌তে হবে।

নবীন হয়ত আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেবেনের মা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"বাবা দেবেন!"

"কেন মা!"

"মল্লিকপুরের কার্ত্তিক মুখুজ্যে তার মেয়েকে দেখিয়া আসিবার জন্য দেওয়ানজীকে চিঠি লিখেছে।"

"আর কিছুদিন দেরী কর মা, পরীক্ষার ফলটা বাহির হয়ে যাক্ তারপর যা হয় করো।"

"আমার কি আর বৌ নিয়ে দু'দিন সাধ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায় না; আমি আর কদ্দিন আছি বল।"

নবীন আর থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে কহিল—"না জেঠাই মা, তুমি অনেক দিন আছ; তোমায় আমরা মরতে দেবই না।"

"দুর পাগলা ছেলে, মরণ কি কারো হাত-ধরা?"

এমন সময়ে তথায় একজন পরিচারিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ডাক্‌ছ?"

"হাঁ, একবার দেওয়ানজীকে আমার নাম ক'রে ডেকে নিয়ে আয়।"

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল—"এমন সময়ে দেওয়ানজীকে কেন মা?"

"পরশু যে আমার অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত। তার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে, শিরোমণি মহাশয়কে খবর দিতে হবে।"

শিশুপুত্রকে আগুনে হাত দিতে যাইতে দেখিলে, তাহার মাতা যেমন আর স্থির থাকিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, দেবেন ও নবীনও সেইরূপ ব্রতকার্য্যে শিরোমণি মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; অন্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দিয়া ব্রতকার্য্য করাইবার জেদ ধরিয়া বসিলেন। দেবেন মাতৃভক্ত; স্বয়ং বাটীর কর্ত্তা হইলেও মাতার বিনানুমতিতে কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। অশেষ প্রকারে মাতাকে তাহার উদ্দেশ্য

বুঝাইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেওয়ান যদুনাথও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে শিরোমণি মহাশয়কে ত্যাগ করিতে আপত্তি করিলেন; কিন্তু দেবেন ও নবীনের বিশেষ জেদ দেখিয়া আর কথা কহিলেন না। নীরবে বসিয়া রহিলেন। একদিকে কুলপুরোহিত-ত্যাগ এবং অপরদিকে ছেলেদের জেদ, দেবেনের মা এ ক্ষেত্রে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তাঁহার বিবেক বলিতেছে—শিরোমণি মহাশয়কে বিনাদোষে ত্যাগ করা ভাল কাজ হইবে না। তিনি এ ক্ষেত্রে কোনও অভিমত প্রকাশ না করিয়া কেবল কুলপ্রথার দোহাই দিতে লাগিলেন।

নবীন ও দেবেন আজ যে কার্য্য করিতে উদ্যত, সামান্য কুলপ্রথা তাহাদিগকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারে না। নবীন দেবেনের মাকে বুঝাইতে লাগিল যে, পূজার মন্ত্র ভুল হইলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হয়, দেবতা রাগ করেন এবং ইহারই জন্য তাহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া গ্রামে গ্রামে টোল খুলিয়া ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে।

দেওয়ান যদুনাথ এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, ভক্তিই দেবার্চ্চনার প্রধান উপকরণ। ভক্তি থাকিলে মন্ত্রের ব্যাকরণাশুদ্ধিতে কিছু আসে যায় না।"

নবীন উত্তর করিল—"যদি কোনও প্রজা আসিয়া আপনাকে বলে—খাজানা এবার মাপ করিলাম। তাহা হইলে তাহার বক্তব্য আপনি কি করিয়া বুঝেন, এবং তাহার উপর কিরূপই বা ব্যবহার করেন? সে ত বেশী কিছু ভুল করেনি, কেবল 'করুন' এর বদলে 'করিলাম' বলেছে।"

যদু। যা কিছু ভগবানকে বলবার দরকার তা যদি কেহ প্রাণের সহিত বলে, ভাষার দোষ থাকিলেও, ভগবান অন্তর্যামী মনের কথা বুঝতে পারেন।

নবীন। কিন্তু যা কিছু ভগবানের কাছে বলব, তার যদি অর্থ না বুঝি, তা হ'লে সেই ভাবটা প্রাণের সহিত বলব কেমন করে? আর যা বলব তার যদি অর্থ বুঝি তবে ভাষার ভুল হবে কেন?

যদু। মুখে আমি যাই বলি না কেন, মনে মনে যদি আমি আমার প্রার্থনা জানাই, তা হলে কি ভগবান তাহা শুনেন না?

নবীন। পুরোহিত তাহার নিজের প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানায় না, যজমানের প্রার্থনা তাঁহার কাছে জানায়। কোন কাজে কিরূপে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, আর্য্য ঋষিগণ তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। সুতরাং পুরোহিত তাঁহার নিজের মনের কথা ভগবানের কাছে জানালে ত চল্‌বে না, তাঁকে শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করতে হবে।

যদুনাথ দেখিলেন তর্কে ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিবেন না, সুতরাং নীরব হইলেন। দেবেনের মা ইহাদের যুক্তি-তর্ক যে ভাল বুঝিলেন এরূপ বোধ হইল না। তবে তিনি ভাবিলেন, ছেলেরা এখন উপযুক্ত,—লেখাপড়া শিখিয়াছে, যাহা করিতেছে হয় ত তাহা ভালই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও, সম্মত হইলেন, কহিলেন, "আমি মেয়ে মানুষ,

আর কি বুঝি বল ; তোমরা যা ভাল বুঝ কর, আমার ব্রতটা সুসম্পন্ন হলেই হ'ল।"

মাতাকে সম্মত হইতে দেখিয়া দেবেন সাহ্লাদে কহিল "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক মা খুব ভাল পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করা হবে।"

স্নেহবশতঃ হউক বা জেদে পাড়য়াই হউক বাটীর গৃহিনী যখন সম্মত হইলেন, তখন দেওয়ান যদুনাথ আর কি বলিতে পারেন। বিশেষতঃ দেবেন এখন শিক্ষিত জমীদার এবং তিনি বৃত্তিভোগী ভৃত্য মাত্র। কাজেই তিনি আর আপত্তি করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না, কহিলেন, "কা'কে পুরোহিত করা হবে স্থির করা হ'ল ?"

দেবেন উত্তর করিল "কল্যাণপুরের টোলের অধ্যাপক পঞ্চানন ন্যায়রত্নকে ডাকিলে হয় না ?"

"তা বেশ কথা" বলিয়া যদুনাথ গাত্রোত্থান করিলেন।

(৩)

"ও'মা, শুনছ ?"

"কি ?"

"হাঁড়িতে যে আর এক খুঁচির বেশী চাল নেই।"

"তা ভূতোর মার বাড়ী থেকে আর এক খুঁচি ধার করে নিয়ে আয়। আজকের দিন ত চলুক, তার পর যা হয় হবে।"

কন্যা প্রতিবেশীর বাটীতে চাল ধার করিতে চলিল। শিরোমণি মহাশয় প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। পথে কন্যাকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে আনি ?" কন্যার নাম অন্নপূর্ণা হইলেও সকলে তাহাকে আনি বলিয়া ডাকে।

আনি উত্তর করিল, "ভূতোর মার বাড়ী থেকে চাল ধার করে আনতে যাচ্ছি।"

"ঘরে কি একেবারে চাল নেই ?"

"না এক খুঁচির বেশী আর নেই।"

ঘরে অন্ন নাই শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় চারিদিক শূন্য দেখিলেন। আর অন্ন কোথা হইতেই বা আসিবে; তাঁহাকে আজ মাসাবধি কাল কোনও যজমান ডাকে নাই। যোগেশ রায়ের ছেলের অন্নপ্রাশন গেল, হরিপদ চক্রবর্ত্তীর মেয়ের বিবাহ গেল, কেহই ত তাঁহাকে মুখের কথাও বলিল না। তাঁহার সংসার এ ভাবে আর কতদিন চলিতে পারে।

এখন তাঁহার সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও একটী কন্যা বর্ত্তমান। কন্যা বয়স্থা, প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়। সমাজের কঠোর শাসন,—কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই, নতুবা লোকলজ্জা ও জাতিপাত অবশ্যম্ভাবী। পণ ব্যতীত কেহ যে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত নয়, এ কথা সমাজ শুনিবে না। সমাজ শাসন করিতে জানে কিন্তু উপায় বলিয়া দিতে জানে না। শিরোমণির ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যাহার অতি কষ্টে দিনপাত হয়, তিনি কি করিয়া কন্যার বিবাহ-পণের সংস্থান করিবেন, সে কথা সমাজ বলিয়া দিবে না। সমাজ কাহারও দৈন্য ভাবিবে না, কেবল বলিবে,—যদি সমাজে থাকিতে চাও, তবে আমার শাসন মানিয়া চল। শিরোমণি মহাশয় এতদিন কন্যা-

দায়-চিন্তায় বিভোর ছিলেন। উপস্থিত অন্ন চিন্তা তাঁহাকে আরও অধীর করিয়া তুলিল। তিনি চিন্তিত মনে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সমাজ কি ?

বর্ত্তমান সময়ে এই ঘোর সমাজ-বিপ্লবের দিনে এমন কে আছেন বলিতে পারি না যার মনে একদিন না একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও "সমাজ কি ?" এই প্রশ্নের উদয় হয় নাই—যিনি ব্যাকুলচিত্তে নিভৃতে বসিয়া সমাজের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত ক্ষণেকের জন্যও চিন্তান্বিত হন নাই। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে প্রশ্নটী যত সরল ও সুখাধিগম্য বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহার প্রকৃত উত্তর পাইতে হইলে দর্শনের গহন কাননে প্রবেশ করিতে হইবে। এই যে বিপুল সমাজ অট্টালিকা, ইহার প্রধান উপাদান কি ? মনুষ্য। সুতরাং মনুষ্য কি, মনুষ্য-জীবন কি, মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য কি না জানিলে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। আবার মানব-তত্ত্ব ভাল রূপে বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানা একান্ত আবশ্যক। অতএব প্রথমেই আমরা সৃষ্টিরহস্য অথবা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইলে জগৎ-স্রষ্টার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ তাহাই অবধারণ করিবার প্রয়াস পাইব।

জগৎ-স্রষ্টা ও জগতের বা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্বন্ধ ? প্রথমতঃ, "সৃষ্টি"—(সৃজ+ক্তি) কথাটার প্রকৃতিগত অর্থ "প্রবাহ" অর্থাৎ 'অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ'; যেমন, নদীর বহিয়া যাওয়ারূপ কার্য্যটার মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যাহার সৃষ্টি হইতেছে (অর্থাৎ 'জগৎ') এবং যিনি, সৃষ্টি করিতেছেন (অর্থাৎ 'জগৎ-স্রষ্টা' বা 'ব্রহ্ম') উভয়ের মধ্যে একটা 'অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ' বর্ত্তমান আছে।

দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের শেষ ফল বেদান্ত এই ভাবটাকেই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন যে,—"কার্য্যকারণাভেদঃ" অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ নাই। 'কার্য্য' অর্থে 'জগৎ' ও কারণ অর্থে 'জগৎ-স্রষ্টা' বুঝিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, উপনিষদের সার গীতায় ভগবান স্বয়ং জলদগম্ভীর স্বরে এ অভেদাত্মক সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা স্পষ্ট বলিলেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥"

(৯ অঃ। ৪)

অর্থাৎ,—"আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। ভূতগণ (সৃষ্ট বস্তুগণ) আমাতে অবস্থিত; আমি সে সকলে অবস্থিত নহি।"

চতুর্থতঃ, কেবল আমাদিগের দার্শনিক ঋষিকুলই যে ঐ সত্যটী বার বার উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা নহে। গ্রীক দর্শনের শীর্ষ মণি 'প্লেটো' (Plato) তাঁহার 'টিমিয়স' (Timœus) নামক গ্রন্থে 'ব্রহ্ম'কে (Creative Idea) 'সূর্য্য' (the sun of the intelligible world) ও

'জগৎ'কে (sensible world) তাহার 'রশ্মি' (reflections) করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ জ্ঞান ঘুচাইয়াছেন। এবং জর্ম্মণ দর্শনের উজ্জ্বল প্রদীপ 'হেগেল' (Hegel) তাঁহার "panen-theism" ('pan'='all', 'theos='God' ; i, e, 'all is in God') অর্থাৎ সর্ব্বভূত ব্রহ্মে অবস্থিত' মত দ্বারা গীতার উপরোক্ত শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণই যে শুধু ওই সিদ্ধান্তটীকে তাঁহা-দিগের নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন এমন নহে। প্রাচীন ভার্জিল (Virgil) অবধি বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কবিকুলতিলকগণও ঐ অভেদাত্মক সম্বন্ধকে গানের ধুয়া করিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। কোন এক অতীত যুগের কোন ঘনতমসাবৃত কোলে বসিয়া ভার্জিল (Virgil) তাঁহার 'ঈনিডে' (Eanied) কি বলিতেছেন শুনুন,—

"One life through all the universe creation runs,"

অর্থাৎ,—"এই অনন্ত জগতের মধ্য দিয়া একটী জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছে।"

এখন হয় ত অনেকে মনে করিবেন যে কেবলমাত্র "আপ্তবচনের" উপর কোন মত তিষ্ঠিতে পারে না। যুক্তির দ্বারা ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আপ্ত-বচন ছাড়িয়া একটী যুক্তি দর্শান নিতান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্ম যে ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, এই অনন্ত জগতের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যে তাঁহার অনন্ত সত্তায় স্পন্দিত হইতেছে—ইহা একটী জাগ্রত শাশ্বত সত্য। ইহার মূলে একটী কেন অসংখ্য যুক্তি নিহিত আছে। এখানে কেবলমাত্র সংক্ষেপে বিজ্ঞান-চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত একটী প্রমাণের কথা বলা যাইতেছে।

জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একটা শক্তির (Energy) পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই শক্তির দুইটী প্রকার-ভেদ করিয়া থাকেন, যথা—" Potential " বা "সম্ভব্য" এবং "Actual" বা "প্রকৃত"। প্রথম-টীর কোনও কার্য্য যদিও আমরা অনুভব করি না বটে কিন্তু তা বলিয়া তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতার অভাব হয় না। যখনই সময় আসে তখনই সে দ্বিতীয় প্রকার শক্তিতে (Actual Energy) পরিণত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। মনে করুন একখানি পুস্তক একটী টেবিলের উপর রাখা হইয়াছে। তখন পুস্তকখানির অন্তর্নিহিত শক্তির কোন কাজই আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। তারপর মনে করুন টেবিলখানি সরাইয়া লওয়া হইল। তখন পুস্তকখানি নিশ্চয়ই মাটীতে পড়িয়া যাইবে। এই সময় উহার ঐ ভূ-পতন-রূপ কার্য্যটী আমরা নয়নেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি। এখন ঐ ভূ-পতনরূপ কার্য্যটী কাহার? না, পুস্তকান্তর্গত শক্তির। এতক্ষণ সে শক্তিটী 'সম্ভব্য' (potential) ছিল এইবার সময় পাইয়া 'প্রকৃত' (Actual) রূপে পরিণত হইল। এই উদাহরণ হইতে এটিও বুঝিতে পারা যাইতে পারা যাইতেছে যে যদিও

শক্তির প্রকার (aspect) দুইটী কিন্তু শক্তি দুইটী নহে। একই শক্তি কখনও 'সম্ভব্য' (Potential) কখনও 'প্রকৃত' (Actual)। আমরা আমাদের উপমায় যদি বলি তাহা হইলে প্রথমটী শক্তির সুপ্তাবস্থা, দ্বিতীয়টী তাহার জাগ্রতাবস্থা।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে শক্তির কখনও সুপ্তাবস্থা নাই। শক্তি সর্ব্বদাই জাগ্রত। ঐ যে পুস্তকখানি নিষ্কর্ম্মা হইয়া টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে যখন উহার উপর হাত রাখিয়া চাপিয়া ধরি, তখন কি উহার অন্তর্য্যামী শক্তি আমার হাতে প্রতিঘাত (Re-action) করিয়া বাধা দেয় (resistance) না? ঐ যে অচল পাষাণস্তূপ পর্ব্বত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আমি যখন আমার দেহের সমস্ত বল একত্রিত করে উহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি তখন কি উহার অন্তরস্থিত শক্তি আমার অঙ্গে প্রতিঘাত করিয়া বাধা দেয় না? নিশ্চয়ই দেয়। তাহা হইলে কি করিয়া বলিতে পারি যে, উহাদের শক্তি 'সুপ্ত' বা 'সম্ভব্য' (Potential)? মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীব-জগতের বা চেতন জগতের (Animate world) প্রত্যেক অধিবাসীই সচল ও পরিবর্দ্ধনশীল সুতরাং এখানে সহজেই 'প্রকৃত' বা 'জাগ্রত' শক্তি (Actual Energy) কে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু জড় জগতের বা অচেতন জগতের (Inanimate world) অধিবাসীরা অচল ও অপরিবর্দ্ধনশীল বলিয়াই কি তাহাদিগের মধ্যে 'প্রকৃত' বা 'জাগ্রত' শক্তি (Actual Energy) নাই? নিশ্চয়ই আছে। ঐ 'বাধা' দেওয়া (Resistance) বা 'প্রতিঘাত করা' (Re-action) যে সে জগতের ধর্ম্ম। আর এইটাই যে 'প্রকৃত' শক্তি (Actual Energy)। যদি এই "বাধা দেওয়া" রূপ (Resistance) প্রকৃত শক্তি (Actual Energy) না থাকিত তাহা হইলে জড় জগতের কোন বস্তুরই অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। এই যে লেখনী, যাহার দ্বারা আমি লিখিতেছি, ইহার অস্তিত্ব-জ্ঞান আমি কি উপায়ে পাইলাম? যখন আমি অঙ্গুলির দ্বারা ইহাকে টিপিয়া ধরি তখন সে আমার অঙ্গুলির উপর 'প্রতিঘাত' (Re-action) করিয়া 'বাধা' (Resistance) দেয় বলিয়া। যদি সে ঐরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা না দিত তাহা হইলে আমি কি তাহার সত্বা (existence) অনুভব করিতে পারিতাম? কখনই না। ঐ যে দূরে একটী কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে উহার অস্তিত্ব-বোধ আমার কিরূপে আসিল? আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর 'প্রতিঘাত' করিয়া দৃষ্টির পথে বাধা জন্মায় বলিয়া অর্থাৎ তাহার অন্তরালে অবস্থিত জিনিসগুলি দেখিতে দেয় না বলিয়া। সে যদি ঐরূপ 'বাধা' না দিত তাহা হইলে আমি কি তাহাকে জানিতে পারিতাম? কখনই না। এই জন্যই হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিতেছেন,—

"Matter is known to us only through its manifestations of Force: abstract its resistence mediately or immediately offered and there remains

nothing but empty extension,"

'[First Principles' Vol, I, p, 43,]

অর্থাৎ শক্তি-প্রকাশের দ্বারাই জড় জগৎ আমাদের কাছে পরিচিত। যদি ইহার ব্যবহিতভাবে বা অব্যবহিতভাবে প্রদত্ত 'প্রতিরোধ'কে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন কর তাহা হইলে শূন্যময় বিস্তার ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না অর্থাৎ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না।"

তারপর আর একটি কথা বলি শুনুন। নিউটন (Newton) প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বলেন যে, এই বিপুল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাকে তাঁহারা বিশ্ব-বিধান (Universal Law) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্বতরাং, ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব।

আবার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সমস্বরে বলিতেছেন যে. এই অনন্ত জগৎ একটী অনন্ত সমরাঙ্গন। এখানে অহোরাত্র একটী সংগ্রাম চলিতেছে। তাহার নাম জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence)। কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি খেচর, কি ভূচর সকলেই রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া অহোরহ তাহাদিগের স্ব স্ব বহির্মণ্ডলের (environment) সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। যিনি বিজয়ী তিনিই জীবন ধারণে সক্ষম (survival of the fittest) আর যিনি বিজিত তিনি জীবন ধারণে অক্ষম সুতরাং মরণ আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বিজিত হইয়া জীবিত এ যুদ্ধে কেহ থাকে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি এই যে, বিরাট শক্তি যাহার দীপ্তিমান আলোকের অরুণ কিরণে আজ আমরা ঐ ঘনান্ধকার পরিবেষ্টিত বিশাল দেহ নির্জীবপ্রায় জড় জগতকে চিনিতে পারিয়াছি—যার মহাকর্ষণের মোহন শৃঙ্খলে (Universal law of Attracfion and Gravitation) শৃঙ্খলিত হইয়া আজ এই সীমাহীন বিশ্বের সীমাহীন কান্তারে উচ্ছৃঙ্খলগতি বস্তুনিচয় দূরদূরান্তস্থিত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না—যার হৃদয়োন্মাদকারিণী সঞ্জীবনী ধারায় অবগাহনান্তর উজ্জীবিত হইয়া আজ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু প্রত্যেক পরমাণু ও কালান্তব্যাপী জীবন-আহবে মাতিয়া চলিয়াছে—ইহা কি উন্মাদ মস্তিষ্কের অসম্বন্ধ প্রলাপ? না, ভাবাবিষ্ট কবির মনোপ্রসূত কল্পনা? তা কখনই নহে। ইহা জাগ্রত—অতি জাগ্রত সত্য। হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) কথায় বলিতে গেলে ইহা চরমের চরম—"ultimate of ultimates"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম-এ, বি-এল।

সমালোচনা।

রবি বাবুর গোরা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হারাণ বাবু (পানু বাবু)

পানু বাবু ব্রাহ্ম; বিদ্বান কিন্তু বড় কলহ-প্রিয় ও স্বার্থপর। ব্রাহ্মসমাজে বেশ প্রতিপত্তি আছে। কলিকাতায় কোন স্কুলে মাষ্টারি করেন; একখানি পত্রিকার সম্পাদক। পরেশ বাবুর বাড়ীতে এর গতিবিধি আছে। পরেশ বাবুর পালিতা কন্যা সুচরিতার সঙ্গে পানু বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। চেনাপরিচয় হবার পর গোরা ও বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। পানু বাবু ভাবলেন,—"I am the monarch of all I survey, my right there is none to dispute." সুতরাং পানু বাবুর রাগ ও হিংসা হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে পানুর সঙ্গে গোরা ও বিনয়ের তুমুল তর্ক যুদ্ধ হইত। পানু গোরাকে একেবারেই দেখতে পার্ত্তনা, গোরা তার চক্ষুশূল। পরেশ বাবুকে পানু দোষ দিতে লাগিল; লোকের কাছে পরেশ বাবুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন পানু তাঁর মুখের সামনে বলে ফেল্লে,—"পরেশ বাবু! আপনি বড় দুর্ব্বলচিত্ত; আপনার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। আপনি কোন্ সাহসে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিদের আপনার অন্দরমহলে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন? এটা ভাল নয়।" যখন গোরার সঙ্গে সুচরিতার এবং বিনয়ের সঙ্গে ললিতার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে তখন পানু বাবু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শত্রুতাচরণ করেন। বিবাহটা যাতে না ঘটে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খলস্বভাব বশতঃ পানুর মন হিংসা ও দ্বেষে পূর্ণ; দলাদলি গণ্ডগোলের মূলে পানু বাবু। প্রতিহিংসা লওয়াতে পৌরুষ আছে—এটা তার দৃঢ়বিশ্বাস।

দাদা, পানু বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের কলঙ্ক, কেমন না? রাগ, দ্বেষ, পর-শ্রীকাতরতা এগুলি সব পানু বাবুতে ছিল।

ঠিক বলেচ।

মাধব চাটুয্যে।

মাধব চাটুয্যে নীল কুঠির নায়েব। এ লোকটার ভেতরে একখানা, বাইরে একখানা, বড় কপটী। গোরার কাছে তার মন যোগান কথা বল্লে আবার দারগার কাছে তার মনরাখা কথাটী বলে এল। আড়ালে যেমন গোরার নিন্দা করলে দারগারও তেমনি নিন্দা করলে। শেষে গোরার সমূহ অনিষ্ট করলে। গোরার জেল হওয়াটা মাধবের কুপরামর্শেই ঘটেছিল।

দারগা।

দারগা বড় দুর্ম্মুখ লোক, ভাল কথা বলতে জানে না। গোরাকে অনেক গালমন্দ দিলে বিস্তর অপমানও করলে। পরে মেজেষ্টার সাহেবকে গোরার বিরুদ্ধে লিখে পাঠালে, তার ফল হল এই মেজেষ্টার বাহাদুর খাপ্পা হয়ে গোরাকে জেল দিলেন।

সতীশ।

সতীশ বরদারাণীর সহোদর। পরেশ বাবুর

বাড়ীতে দুই ভাই বোনে প্রতিপালিত। সতীশ বালক—বালকসুলভ চপলতা দেখিয়েচে। বিনয়ের বড় বন্ধু। সকল মেয়েরা সতীশকে বক্তিয়ার খিলিজী বলিয়া ডাকিত, তার কারণ সতীশ একবারও মুখের বিশ্রাম দিত না।

সুরেশ।

ছোকরাটী বি-এ পড়ে, সোণার চষমা চোখে পরে মেয়েদের ফায় ফরমাস খাটে। পরেশ বাবুর স্ত্রী ও মেয়েরা সুরেশকে বাড়ীর ছেলে জ্ঞান করে। দাদা, সতীশ ও সুরেশ যেন বাজে লোক বলে বোধ হয়।

স্ত্রীচরিত্র।

আনন্দময়ী।

আনন্দময়ী একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের কন্যা ও পৌত্রী। পূর্ব্বে এর খুব আচার বিচার ছিল; পরে স্বামীর অনুরোধে সে সব জলাঞ্জলী দেন। আনন্দময়ী রমণীকুলের আদর্শ, দয়া-মায়া-ক্ষমা-লজ্জা এ সমস্ত গুণে ভূষিতা। আনন্দময়ীর সদাই হাস্যবদন। পরের দুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখী; তাঁর চক্ষে সকলেই সমান—তাঁর আত্মপর ভেদ ছিল না। গোরার গর্ভধারিণী জনৈক ইংরেজ মহিলা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ব্রাহ্মণের গোয়ালঘরে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তিনি প্রাণ-ত্যাগ করেন। সেই মাতৃপিতৃহীন দুগ্ধপোষ্য সদ্যজাত শিশুকে আনন্দময়ী আপন স্তন্য দিয়া কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করেন। আনন্দময়ী এই সময় হতে তাঁর হিন্দু আচার-নিষ্ঠা ত্যাগ করেন। একা গোরার মা নহেন, আনন্দময়ী সমগ্র ভারতবাসীর মা। ইনি জননীর আদর্শস্থল—যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্ম্মিষ্ঠা, আবার তেমনি দয়াময়ী, বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতিকৃতি। গোরা আনন্দময়ীকে জীবন্ত ভারতবর্ষ জ্ঞান করিত আর সকলের কাছে বলিত ইনি আমার ভারতমাতা।

গোরা বলিতেছে,—"আমার মার (আনন্দময়ীর) মুখ আমার মাতৃভূমির প্রতিমা স্বরূপ হইয়া আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক এবং দৃঢ় রাখুক।

একদিন সন্ধ্যার সময় গোরা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল আনন্দময়ী তাঁর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন। গোরা আসিয়া ইহাঁর দুই পা টানিয়া লইয়া তদুপরি আপনার মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুহাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া চুম্বন করিলেন। গোরা কহিল,—"মা তুমি আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। মা, তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ" অপর একস্থলে গোরা বলিতেছে—

"আমি যখন আমার মাকে দেখচি, মাকে জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রী-লোককেই এক জায়গায় দেখচি এবং জেনেছি।"

দাদা, বল দেখি আনন্দময়ীর চিত্র কেমন অঙ্কিত হয়েচে?

বেশ হয়েচে। শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেশ-দিমোনার চরিত্র সুন্দর কিন্তু মা আনন্দময়ীর চরিত্র আরও সুন্দর, অতি মনোহর। আনন্দ-ময়ী সাক্ষাৎ আনন্দময়ী ভগবতী।

বরদাসুন্দরী।

ইনি পরেশ বাবুর স্ত্রী, ব্রাহ্মিকা। ইনি বেশভূষা জাঁকজমক বড় ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মসমাজে এর নিয়মিত যাওয়া ছিল। মেয়ে-দের সকলকে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যেতেন। বাড়ীতে কোন অপরিচিত পুরুষ এলে বরদাসুন্দরী তাঁকে খাতির অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আপনার মেয়েদের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় করে দিতেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের সম্মুখে তিনি আপনার মেয়েদের গুণের প্রশংসা করিতেন। ডাক্তার প্রিয়রোজের স্ত্রীর ন্যায় ইহার স্বভাব ও প্রকৃতি—উভয়েই বিলাসপ্রিয়। লোকে বলিত তার দোষেই মেয়েদের চাল চলন বিগড়ে গেছে। বরদাসুন্দরী কখন কখন স্বামীর উপরে কখন কখন মেয়েদের উপরে রাগ করিতেন। হরিমোহিনীর প্রতি তাঁর বড় বিদ্বেষ। হরিমোহিনীর প্রতি বরদা ভাল ব্যবহার করেন নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিনয়ের প্রতি বড় সদয় ছিলেন। পরে ললিতার সহিত বিনয়ের বিবাহ হিন্দুমতে হইবে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল খাঁটি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হয়, তা হ'ল না। তাঁর কোট্‌ বজায় রহিল না, সেজন্য তিনি বিবাহে গেলেন না। কাজে কর্ত্তব্যে, কথায় বার্ত্তায় আচারে অনুষ্ঠানে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। একটু নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই সর্ব্বনাশ! যাহোক দোষে গুণে বরদাসুন্দরী মন্দ লোক ছিলেন না।

হরিমোহিনী।

হরিমোহিনী—পরেশ বাবুর আত্মীয়া, বহু কাল পরে পরেশ বাবুর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন। বাড়ীর উপর তালায় এক খানি ছোট ঘরে থাকেন আর সেই খানেই আপন ইষ্ট-দেবতার পূজা অর্চ্চনা করেন। রাধারাণী ও ললিতা তাঁকে বড় ভালবাসে, তিনিও তাহাদের বড় ভালবাসেন। বরদাসুন্দরীর সে সব ভাল লাগিত না; তিনি বিরক্ত হতেন। অবশেষে একদিন স্পষ্টই বলে ফেল্লেন,—"তোমার ভাই! এ বাড়ীতে থাকা হবে না। তুমি হলে হিন্দু, আমরা হলাম ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম বাড়ীতে বসে হিন্দুর দেবদেবী পূজা করাটা ঠিক নয়। আমি তা সহিতে পারি নে। এইরূপ মাঝে মাঝে দুজনার ঠিকিমিকি হইত আর হরিমোহিনী চক্ষের জল ফেলিতেন। ক্রমে একদিন কলহ এত বাড়িয়া উঠিল যে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিমোহিনী পরেশ বাবুর বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেলেন। পরেশ বাবু সুচরিতার নামে একখানি বাড়ী কিনিয়া-ছিলেন। সেই বাড়ীতে গিয়া হরিমোহিনী বাস করিতে লাগিলেন। সুচরিতা ও তার ভাই সতীশও এখন আপনাদের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। এখানে এসে হরিমোহিনী বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাই বোনের সামান্য ত্রুটী দেখিলেই তিনি তাদের ধমক দিতেন ও তিরস্কার করিতেন।

বিনয় ও গোরা মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে সুচরিতার সহিত দেখা করিতে যাইত। তারা দেখা করিতে আসিলেই নির্জ্জনে বসে কথা কহিতে থাকিলেই হরিমোহিনী রাগভরে তাহাদের অনেক অকথা কুকথা বলিয়া অপমান করিতেন। হরিমোহিনী ব্রাহ্ম মেয়েদের আচার ব্যবহারের বিস্তর নিন্দা করিতেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা রাধারাণীর বিবাহ গোরার সহিত না হইয়া তাঁরই এক দেবরের সঙ্গে হয়। পত্র লিখিয়া দেবরকে বাড়ীতে আনান হইল। সুচরিতা সে বিবাহ পছন্দ করিল না। কাজেই সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

দাদা, বরদাসুন্দরী গোঁড়া ব্রাহ্ম, হরিমোহিনী গোঁড়া হিন্দু, contrastটা বেশ দেখান হয়েচে নয়?

হাঁ।

লাবণ্য ও লীলা।

লাবণ্য ও লীলা পরেশ বাবুর দুটী কন্যা। এ দুটী মেয়েই তার কথার বশ, সেজন্য তার বড় প্রিয়। লাবণ্য অপেক্ষা লীলা চতুরা।

গাছের ডালপালা না থাকিলে গাছের শোভা হয় না, নেড়া নেড়া দেখায়। এ দুটী চরিত্র গল্পের ফেকড়া বলেই বোধ হয়।

ঠিক বলেচ।

ললিতা।

ললিতা পরেশ বাবুর মেজ মেয়ে; খুব বুদ্ধিমতী, জিদ্দিবাজ, একগুঁয়ে, যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না। ললিতার মহৎ গুণ এই, প্রাণ গেলেও সে লোকের অনিষ্ট করিবে না। ললিতার কাছে সত্যের আদর ও মিথ্যার অনাদর চিরকাল। কোন কাজটা ন্যায় আর কোন কাজটা অন্যায় এ বিচার ললিতা সততই করিত; অন্যায় বর্জ্জন ও ন্যায় গ্রহণ করিয়া সত্যের ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। ললিতা চপলা ও চতুরা, আপন মনের ভাব অপরকে জানিতে দিত না। সুতরাং ললিতা যে কার উপর তুষ্ট ও কার উপর রুষ্ট অথবা কখন তুষ্ট ও কখন রুষ্ট ইহা বুঝে উঠা ভার। কেহ দিন রাত সেবা করেও তার মন পেত না; আবার কেহ বিনা সেবাতে তার উপর আধিপত্য করিত। এ রহস্য বোঝা কঠিন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১। আমরা মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর প্রণীত দুই খণ্ড ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী, আত্মদর্শন ও স্বপ্নদর্শন নামক পুস্তকগুলি উপহার পাইয়াছি। রায় বাহাদুরের সঙ্গীতে ভাবের এবং ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, এরূপ ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীত আমরা বহুদিনপাঠ করি নাই। আত্মদর্শন ও স্বপ্নদর্শন পুস্তকদ্বয় সাধকত্বের পরিচায়ক, বাহিরে জমিদার হইলেও ভিতরের জমীদারী তিনি অনেক অংশে আয়ত্ত করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "স্তবক ও কোরক" পুস্তকখানির অধিকাংশ কবিতাই মধুর ও মনোরম—পাঠে অরুচি হয় না।

৩। নিরুপমা পুরস্কার। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেশনার মেসার্স শর্ম্মা ব্যানার্জ্জীর এণ্ড কোংর আবিষ্কৃত নিরুপমা কেশ তৈলের সংক্রান্ত গল্প পুস্তক, কেবল আবর্জ্জনাপূর্ণ নহে পড়িবার মত হইয়াছে। ইহাদের "নিরুপমা" ও সুন্দর কেশ তৈল।

ESTABLISHED 1303 B. C.

একবিংশ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৪। [৯ম সংখ্যা।

হিন্দু সমাজের মুখপত্র।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১৷০ টাকা।

1918.

হাওড়া, ৩ নং তেলকল ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলোচনার পরিচালকবর্গ।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৪ সাল ।

ওক্‌লার কাল্‌কা মন্দির ।

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে মহামায়া আদ্যা-শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমে এই শক্তি-পূজা জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সময়ে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সময় হইতেই সম্ভবতঃ প্রস্তরাদিতে দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা হইতে থাকে। মধ্যযুগে শক্তি-পূজার এত অধিক প্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর্য্যগণ যখন যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইস্থানেই শক্তিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগের অনেক দেবদেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া দেন,—অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্ট শক্তি-মূর্ত্তির মধ্যে ওক্লার কালিকামূর্ত্তি অন্যতম। ইহা তন্ত্রে লিপিবদ্ধ পীঠস্থানের অন্তর্গত না হইলেও বহুদিন হইতে পীঠস্থানেরই ন্যায় সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

ওক্লা, বর্ত্তমান দিল্লীসহরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সহর হইতে, পূর্ব্বে এখানে গোশকটাদি যানে যাইতে হইত; কিন্তু প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের আগ্রা-দিল্লী শাখা, এই স্থানের নিকট দিয়া লইয়া যাওয়ায় দেবী দর্শনার্থিদিগকে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানকার দেবীমূর্ত্তিকে এতদ্দেশীয়গণ 'কালূকাজী' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। "কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া" কাল্কা শব্দটী বোধ হয় এই কালিকা শব্দেরই অপভ্রংশ। কাল্কাদেবীর মন্দিরটী রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা উচ্চতায় নিতান্ত ছোট নহে। যাত্রীদিগের দেবীপ্রদক্ষিণ ও দর্শনের সুবিধার জন্য মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত বারাণ্ডা এবং বৃহৎ বৃহৎ দ্বার নির্ম্মিত আছে। উৎসবাদির সময় সকল দ্বার-গুলিই খুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য সময় দুই একটী মাত্র খোলা থাকে। মন্দিরটী পাহাড়ের এরূপ নিভৃত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত যে,

দেখিলেই মনে হয় অতি প্রাচীনকালে কোনও সাধক জনশূন্য পর্ব্বত গুহায় সাধনা করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানটী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগদ্বিখ্যাত কুতবমিনারের পার্শ্বস্থ যোগমায়ার মন্দিরের কথা ছাড়িয়া দিলে, এই প্রাচীন কালিকাদেবীর মন্দির ব্যতীত ইন্দ্রপ্রস্থ মহানগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এমন কোনও দেবালয় বা দেবদেবীর মূর্ত্তি নাই—যাহা পুরাকালের হিন্দুকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। এরূপ নিভৃতস্থানে এই মন্দিরটী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; নতুবা যে স্থান পাঁচ শত বৎসর যাবৎ মুসলমানগণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, তথায় হিন্দুর দেব-মন্দির রক্ষা পাওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

শিব-পূজা ব্যতীত শক্ত্যুপাসনা সর্ব্বাঙ্গীন হয়না। ভারতের তীর্থক্ষেত্র সমূহে দেখা যায়—যেখানে শক্তিমূর্ত্তি সেখানে দু'একটী শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে। ওকলার কালকা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে যে প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা আধুনিক। পূর্ব্বে এখানে কিরূপ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই।

এই মন্দিরটী এত পুরাতন, যে, কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইতিহাসবেত্তা সৈয়দ আমেদ খাঁ বলেন, এরূপ জানা যায়, প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দ্বাপর যুগের শেষভাগে এই দেবীমূর্ত্তি এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানে কিরূপ মন্দির ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে উর্দ্দু ও পার্শী গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ 'রোয়াক' মার্ব্বেল ও লাল পাথরের (granite) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮১৬ খৃঃ অঃ ২য় আকবর সাহের রাজত্বকালে রাজা কেদারনাথ নামক তাঁহার একজন হিন্দু-কর্ম্মচারী এই মন্দির সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করেন। সেই অবস্থাতেই এখন ইহা সংরক্ষিত হইতেছে।

এতদ্দেশের পূজা-পদ্ধতি বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তান্ত্রিক উপাসকেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বীরাচারী ও পশ্বাচারী। বীরাচারী উপাসকেরা মদ্য-মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্বাচারী শাক্তেরা রাজসিক মতে উপাসনা করেন; ইঁহারা মদ্য-মাংস গ্রহণ করেন না;—কেবল মন্ত্রজপ ও পঞ্চ উপচার দ্বারা শক্তিপূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পশুবলির বিধান আছে। পূর্ব্বে ওকলার কালিকাদেবীর কিরূপ পদ্ধতিতে পূজা হইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পশ্চিমাঞ্চল বহুদিন যাবৎ মুসলমান শাসনাধীন থাকায় অধুনা বঙ্গদেশের ন্যায় এতদ্দেশে দেবদেবী পূজায় সেরূপ আড়ম্বর নাই। এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম এতদ্দেশে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই সময় হইতে এখানে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের

মধ্যে,—প্রাণিহিংসা অত্যন্ত ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। সুতরাং কালিকাপূজা তান্ত্রিকপূজা হইলেও, বলি যে শক্তিপূজার একটী প্রধান অঙ্গ, একথা ইহারা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা এখন কেবল পুষ্প, বিল্বপত্র ও মিষ্টান্নাদি উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বাসন্তী ও শারদীয় পূজা শক্তি-পূজার প্রধান উৎসব। এই দুই উৎসবে এখানে তিন দিন অহোরাত্রব্যাপী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় এত জনতা হয় যে, অষ্টমী ও নবমীর দিন, দিল্লী ষ্টেশন হইতে অনবরত special train যাতায়াত করিয়াও যাত্রিদিগের অভাব মোচন করিতে পারে না; গোশকট ও অশ্বযানে এই ছয় মাইল রাস্তা নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে। এই মেলা এত আড়ম্বরপূর্ণ হয় যে, হিন্দু ত দূরের কথা অত্রস্থ মুসলমান অধিবাসিগণও মসজিদ্‌ এবং মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তী বাগানে নাচগান ও উৎসবাদির আয়োজন না করিয়া থাকিতে পারে না। উৎসবে মুসলমানগণের যোগদান করাটা আশ্চর্য্যের কথা বটে এবং ইহার কারণও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে দেখা যায় এই দেশ বহুকাল মুসলমান শাসনাধীন থাকায়, কত অহিন্দু-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ হিন্দু-অনুষ্ঠানে এবং কত হিন্দু-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অহিন্দু-অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বাসন্তী ও শারদীয় উৎসবে এখানে এত আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয় যে, অত্রস্থ মুসলমানগণ, উহা হিন্দুর উৎসব একথা বোধ হয় একেবারে ভুলিয়া যান এবং এই আনন্দোৎসবে নিশ্চেষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

মন্দিরটী পাহাড়ের উপরে অবস্থিত থাকায়, উহা হইতে দূরস্থিত বস্তুগুলি অতি সুন্দর দেখায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র (binocular) সাহায্যে দূরস্থিত কুতবমিনার, হুমায়ুনের কবরস্তম্ভ প্রভৃতি দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্য ও উপভোগ করিতে পারা যায়। এই স্থানটী যেন প্রকৃতির রম্য-স্থল। ইহার স্বাভাবিক শোভায় আকৃষ্ট হইয়া দিল্লীনিবাসী কতকগুলি ধনীলোক এখানে বাগানবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই তাঁহারা এখানে বাস করিয়া থাকেন। এখানে যে কেবল বাগানবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহা নহে; কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ সঙ্গতিপন্ন মহাত্মা দেবী দর্শনার্থিগণের সুবিধার জন্য অনেকগুলি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল যে উৎসবের সময়েই এখানে জনসমাগম হয়—তাহা নহে, ওক্‌লার স্বাভাবিক দৃশ্য এত মনোহর যে, ইহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দেবীদর্শনার্থী ব্যতীত অপর অনেকানেক লোকের প্রায়ই এখানে সমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে যমুনা নদী প্রবাহিত। সরকার বাহাদুর প্রস্তর সাহায্যে যমুনার জল অবরোধ করতঃ দুই হাত উচ্চ কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা এক বাঁধ প্রস্তুত করিয়া, তাহার পার্শ্ব দিয়া, কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য এক খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। এই কাষ্ঠ প্রাচীরের কিয়দংশ বার মাস খোলা থাকে

এবং তথায় যমুনা ক্ষীণ গতিতে প্রবাহিত হন। বর্ষাকালে ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। নদী জলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে যখন কাষ্ঠ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন এই জলপ্রপাতের দৃশ্য বাস্তবিকই অতি উপ-ভোগ্য। ইহার শব্দ প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়াই হউক অথবা দেবীদর্শনার্থী হইয়াই হউক অন্য সময় অপেক্ষা বর্ষাকালেই এখানে অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীকিশোরীমোহন সরকার।

"দিল্লীর বাঙ্গালী" সম্বন্ধে প্রকৃত কথা।

কিছুদিন হইল আমার কোন বন্ধুর লিখিত অত্র মাসিক পত্রের ফাল্গুন ও চৈত্রের যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত "দিল্লীর বাঙ্গালী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা" নামক আমার একটী প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে আমার বিশেষ গ্লানি করিয়াছেন। তিনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু—একই আফিসের কর্ম্মচারী। তিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমরাও কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। এ সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত তাহা না দেখিয়া ও আমাকে অতি অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন,তাহা সত্য হইলে আমার মনস্তাপের কোনই কারণ থাকিত না। যাহা হউক এরূপ প্রবন্ধের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া এত দিন উহার কোন প্রতিবাদ করি নাই কিন্তু যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া যাইবে ভাবিয়া যোগেন্দ্র বাবুর কোন্ কথা সত্য ও কোন্ কথাগুলি আপত্তিজনক তাহাই এখানে প্রকাশ করিতেছি।

(১) যোগেন্দ্র বাবুর প্রথম কথা এই যে, আমি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে দিল্লী সম্বন্ধে ২১টী ভ্রম দেখাইতে গিয়া বলিতে চাহিয়াছি যে আমি ও আমার কতিপয় বন্ধু দিল্লীতে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের নামের পরি-বর্ত্তে আমার নাম উক্ত পুস্তকে স্থান লাভ করুক। প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া আর কেহই বোধ হয় এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের নাম "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে বান্ধব-সমিতির সংশ্রবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কখনই অসুখী হইতে পারি না বরং উক্ত সমিতির সংশ্রবে আর একজনের নাম প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম ও প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধে যতীন্দ্র বাবুর নামের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় তিনিই আমাকে গালি দিয়া "আলোচনায়" প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য-সভা "বান্ধব-সমিতির" শাখা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে. এই ভ্রম সংশোধনের জন্য এবং বান্ধব-সমিতির সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, ইহা প্রদর্শনের জন্য উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রবাসীতে প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। আমার ও আমার বন্ধুগণের নাম উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত হইবে এরূপ কল্পনা কখনও করি নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন,—"এখানে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা নামক যে একটী পুস্তকালয় আছে, তাহা কোন কালেও সাহিত্য সভা নহে, তথায় এমন একটু স্থান নাই যে, সেখানে বাঙ্গালী গিয়া সাহিত্যালোচনা করে। ঐ পুস্তকালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজের বাড়ীর একটী ক্ষুদ্র ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাই এখনও উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, নচেৎ উহার এমন অর্থ নাই যে, একটি ঘর ভাড়া করিয়া সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে।"—— বঙ্গ সাহিত্য সভার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরটী বঙ্গ-সাহিত্য-সভার ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন—ইহা সত্য কিন্তু তিনি স্থান দান না করিলে উহার অস্তিত্ব লোপ পাইত একথা সত্য নহে। পূর্ব্বে অনেক কাল ভাড়া দিয়া সভার জন্য গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং সে সময় অপেক্ষা এখন সভার অবস্থা অধিকতর স্বচ্ছল। যোগেন্দ্র বাবুর মতে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য-সভা কোন কালে সাহিত্য-সভা নহে?' কিন্তু তিনি ভিন্ন অন্য সকলের মতে যদি উহা "সভা" বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাতে তাঁহার দুঃখিত হওয়া উচিৎ নহে। আর যখন তিনি কখনও বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সাধারণ অথবা বিশেষ অধিবেশন কালে কিংবা অন্য কোন সময়ে উক্ত সভায় পদার্পণ করেন নাই, তখন তাঁহার মতই যে অভ্রান্ত এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। হীরালাল বাবুর প্রদত্ত গৃহটী ক্ষুদ্র হইলেও এখনও সেখানে সাহিত্য-রস-পিপাসু সভ্যগণের সমাগম ও সাহিত্য-চর্চ্চা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে তাহারও ব্যবস্থা হইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ, তিনি লিখিয়াছেন,—"যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের মৃত্যু উপলক্ষে এখানে শোকসভা আহূত হইয়াছিল, তাহা দিল্লীস্থ বাঙ্গালীগণের সমবেত চেষ্টায়, বঙ্গ-সাহিত্য-সভার তাহাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব ছিল না"—— এ কথাও সত্য নহে। আমি প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম যে, বঙ্গ-সাহিত্য-সভা দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপাত্র হইয়া, এই সকল শোক সভার আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাতে অবশ্য সাধারণের সহানুভূতি ছিল—ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু যখন বঙ্গ-সাহিত্য-সভার উদ্যোগে এই সকল সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং যখন বঙ্গ-সাহিত্য-সভা এই সকল সভার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন (কোন কোন সভার

ব্যয় ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্ত সভ্যেরা চাঁদা করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন) তখন ইহাতে কাহাদের কৃতিত্ব সূচিত হইতেছে,তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(৪) চতুর্থতঃ, যোগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"উক্ত সভার সাধারণ অধিবেশনে কোনও কালে বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি পাঠ হইত না।" কিন্তু তাহার পরেই আবার স্বীকার করিয়াছেন যে,—"স্থানীয় হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এক সময় অত্রত্য বাঙ্গালা স্কুলে গুটিকতক বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।" ধীরেন্দ্র বাবু ভিন্ন আরও অনেকে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার তালিকা বঙ্গ-সাহিত্য-সভার কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। যখনই কোন বক্তা বা প্রবন্ধ-লেখকের সম্মতি-লাভ করা গিয়াছে, তখনই তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা বা প্রবন্ধ-পাঠ বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সাধারণ অধিবেশনই হইয়াছে। বিগত বৎসরেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল দিল্লী-ভ্রমণে আসিয়া "বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, উপযুক্ত লোকের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা বাঙ্গালীদিগের হৃদয়ে প্রীতি ও সদ্ভাব সঞ্চার করিতে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা চিরদিনই যত্নশীল রহিয়াছে কিন্তু যোগেন্দ্রবাবু তাহার কোন পরিচয় পান নাই এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সভায় কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে বলিয়া তিনি জানেন না। আমি পর্য্যন্ত লিখিয়াছি যে তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-সভার কোন অধিবেশনে কখন পদার্পণ করেন নাই সুতরাং তিনি জানেন না বলিয়া কেহই জানে না বা তাঁহার নিকট কোন প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত না হইলে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না।

(৫) তারপর যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "গত বৎসর স্যার রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানকার বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা স্কুলে এক সভা করিয়াছিলেন কিন্তু সে সভায় বঙ্গ-সাহিত্য-সভার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হয় নাই। যদি বঙ্গ-সাহিত্য-সভা এখানকার সাহিত্য-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থলই হইবে, তবে সে সময় ইহা কি জন্য চুপ করিয়াছিল ?"

——এ সকল কথার অধিকাংশই সত্য। এখানকার মিসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য-সভার এক জন সভ্য। তাঁহারই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এখানকার বাঙ্গালীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাঙ্গালা স্কুলে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সভা করিয়া কেহ সম্বর্দ্ধনা করে বা অভিনন্দন দেয়—ইহা তিনি ইচ্ছা করেন নাই। বঙ্গ-সাহিত্য-সভা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে অভিলাষী হইলেও তাহার অনভিমতে করিতে পারেন নাই।

(৬) ইহার পর যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "এখন দিল্লীর বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ১০০০ ঘর। কিন্তু পুস্তকালয়ের পাঠকের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক হইবে না। ইতিপূর্ব্বে ৩০ জনের অধিক পাঠক কখনও হয় নাই, তবে শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়

সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করার পর হইতে অনেক অপব্যয় নিবারিত হয় এবং পুস্তকের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

বর্ত্তমানে দিল্লীতে ১০০০ ঘর বাঙ্গালী নাই। ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ভারত গভর্ণমেণ্টের দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের আবাস স্থলে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদিগকে এই তালিকাভুক্ত করিলে স্ত্রী, পুরুষ ও বালকের সংখ্যা বোধ হয় মোট ১০০০ হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্য সভার সভ্য সংখ্যা যে অধিক নহে, তাহা প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে হীরালাল বাবু সম্পাদক হইবার পূর্ব্বে অনেক অপব্যয় হইত এবং সভার পূর্ব্ব ইতিহাস ভাল নহে, ইহা নূতন সংবাদ বটে, তিনি ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? যাহা তিনি জানেন না, এরূপ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার উচিত হয় নাই।

(৭) তারপর তিনি বান্ধব-সমিতির কথা উল্লেখ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের যত্নে (আমরা বলি তাঁহারও যত্নে) এখানে প্রতিষ্ঠিত বান্ধব-সমিতি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যাত্রা, থিয়েটার ও ঐক্যতান-বাদন সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমান ঐক্যতান-বাদন সমিতি ও বঙ্গীয় নাট্যসমাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুস (Rev. Andrews) সাহেব কর্ত্তৃক প্রশংসা এবং শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম ও সত্যচরণ সরকার প্রভৃতি যুবকগণের অভিনয়লব্ধ অর্থ যুদ্ধ-তহবিলে প্রদান প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য কিন্তু ঐ সকল অবান্তর কথায় ইহা বুঝায় না যে, সেই প্রাচীন কালের বান্ধব-সমিতি এখনও আছে ও ঐকাতান-বাদন-সমিতি ও বঙ্গীয় নাট্য-সমাজের প্রাপ্ত গৌরব বান্ধব সমিতিরই প্রাপ্য। উক্ত দুই সমিতি বঙ্গ-সাহিত্য-সভার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যোগেন্দ্র বাবুর যুক্তি মানিয়া লইতে গেলে তাঁহার কথিত ঐকাতান-বাদন সমিতির সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয়-নাট্য-সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম ও সত্যচরণ সরকার ও আরও কেহ কেহ বঙ্গ-সাহিত্য-সভারও সভ্য বলিয়া উক্ত সমিতিদ্বয়কে বঙ্গ সাহিত্য সভার অংশবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা ত সত্য নহে। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পুস্তকে বঙ্গ-সাহিত্য-সভাকে বান্ধব-সমিতির শাখা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এই ভ্রম সংশোধনের জন্য প্রবাসীতে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত প্রবাসীর যে পত্রের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবু পূর্ব্বোক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সেই পত্র যোগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল, এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সভ্য তাঁহার পুত্র উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র বাবু এ পত্র লেখেন নাই জানিয়া উক্ত পত্রের লেখককে কাল্পনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। এতদিনে যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্বোক্ত ধারণা স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হইল। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার পুত্র, জীতেন্দ্র বাবুর নামে উক্ত পত্র বেনামী করিয়া প্রবাসীতে

লিখিয়াছিলেন—ইহা প্রকাশ করিতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না। যোগীন্দ্র বাবুর পুত্র জীতেন্দ্র বাবু অনেক পরে বঙ্গ-সাহিত্য-সভায় যোগ দিয়াছেন। আলোচনার প্রকাশিত প্রবন্ধের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংশ্রব আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

তারপর যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বান্ধব-সমিতি যে সময় স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে সঙ্গীত-চর্চ্চা, সাহিত্য-চর্চ্চা, ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি সমস্তই হইত"——আমরা কিন্তু কেবল সঙ্গীত-চর্চ্চার কথাই জানি। সাহিত্য-চর্চ্চা, ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতির কথা আর কেহই অবগত নহে। যোগেন্দ্র বাবুর কথিত বান্ধব-সমিতি ও বর্ত্তমান ঐক্যতান-বাদন-সমিতির সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এ সকল কথা জানেন না। ইহা অবশ্য সত্য যে তদানীন্তন বান্ধব-সমিতির সভ্যগণের কেহ কেহ বঙ্গ-সাহিত্য সভা এবং বহু পরে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যতান-বাদন-সমিতি ও বঙ্গীয় নাট্যসমাজের উৎসাহী সভ্য কিন্তু তাহাতে ইহা বুঝায় না যে পূর্ব্বেকার বান্ধব-সমিতি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া এই সকল সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীদের যত্নে দিল্লীতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সভা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "বান্ধব-সমিতি" সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে কিন্তু তৃতীয় বৎসরে যখন তাহার সত্তা বিদ্যমান্ ছিল না, তখন উহার কাল্পনিক অস্তিত্ব সমর্থন করিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া যোগেন্দ্র বাবু যদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনীকান্ত সোম ও সত্যচরণ সরকার প্রভৃতিকে তাঁহাদের সমিতির নাম "বান্ধব-ঐক্যতান-বাদন-সমিতি" ও "বান্ধব-নাট্য-সমাজ" রাখিতে অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া বান্ধব-সমিতিকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইতেন। তখন উহার অস্তিত্বে আর কেহই সন্দিহান হইতে পারিত না এবং ঐরূপ নামকরণ দেখিয়া আমরাও প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম।

দিল্লীতে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একতা, প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিতে না পাইলেও তিনি যে দিল্লীর বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য পরলোকগত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়কে এ সকলের জন্য ধন্যবাদার্হ বিবেচনা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। প্রবাসীতে প্রকাশিত (প্রবাসী ১৩০৯, চৈত্র সংখ্যা, ৪২৭ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বোক্ত বেনামী চিঠিতে তিনি হেমবাবুর উৎকর্ষের কথা স্বীকার করেন নাই বরং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলেন।

পরিশেষে যোগেন্দ্র বাবু আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে আমি যেন ভবিষ্যতে বান্ধব-সমিতির সাকারত্বে অবিশ্বাসী না হই এবং প্রবাসীতে অযথা যা তা কতকগুলা লিখিয়া সত্যের অপলাপ না করি।

সত্যের অপলাপ কে করিয়াছে ও যা তাই বা কে লিখিয়াছে এবং প্রবাসীতে যা তা প্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধিগণের বিচার্য্য। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

কুমার দামোদর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাণী দুর্গাবতী।

রংপুর জেলায় ডিমলার দক্ষিণে ধর্ম্মপুর নগর। নগরটী দুর্গবেষ্টিত, এবং রাজা ধর্ম্মপালের রাজধানী। রাজা ধর্ম্মপাল পতিনা নগরের রাজা মাণিকচাঁদের মহিষী রাণী ময়নামতীর সহোদরা ভগিনী রাণী দুর্গাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং রাজ্যের কেহই তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিত না, কিন্তু সকলেই ভয় করিত। রাজা ধর্ম্মপাল কোন লোককেই বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি নিজের মহিষীর উপরও বিশ্বাস ছিল না। রাণী দুর্গাবতী অতি সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন।

রাজা ধর্ম্মপাল একদিন সন্ধ্যার সময় রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে সময় রাণী সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া বাতায়নে বসিয়াছিলেন। সুমিষ্ট বাতাস মৃদুমন্দভাবে বহিয়া রাণীর কেশপাশ লইয়া খেলা করিতেছিল। রাণী অত্য অন্যমনস্ক, কি যেন তাঁহার হৃদয়ে আলোড়িত হইতেছিল। রাজা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া রাণীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। ক্ষণেককাল সে সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তার পর সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এত চিন্তার কারণ কি?" রাণী চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন পশ্চাতে রাজা দণ্ডায়মান। তখন মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "রাজন্, সংবাদ পেলেম, রাজা মানিকচাঁদ পীড়িত এবং কুমারের বিবাহ হচ্ছে। বিবাহে আমায় যাওয়ার জন্য লিখেছে। দিদি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, অনেক দিন দেখি না। এখন মহারাজার অনুমতি হ'লেই হয়।" রাজার মুখ গম্ভীর হইল, তিনি উত্তর করিলেন "তা বুঝা যাবে, কবে বিবাহ হবে?" রাণী বলিলেন "এখনও দিন স্থির হয় নাই"। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় স্থির হ'ল? আমি যে কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না।" রাণী বলিলেন "সময়ে আপনি সব জান্‌তে পার্‌বেন। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের জগদ্বিখ্যাত কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে গোপীচাঁদের বিবাহ হবে।" রাজা চমকিয়া উঠিলেন, কি যেন তাঁহার হৃদয়ে তখন দংশন করিল। তিনি এ সংবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্র একজন শক্তিশালী নরপতি, তিনি যে রাজা মানিকচাঁদের আত্মীয় হইবেন ইহা সুবিধাজনক নহে। রাজা ধর্ম্মপাল মানিকচাঁদকে ভাল চক্ষে দেখেন না। বিশেষতঃ গোপীচাঁদের উপর তাঁহার বড় বিদ্বেষভাব। রাজা বলিলেন "আমাকে জানান আবশ্যক কি? আমি তাঁদের কে? রাজা গোপীচাঁদ একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কেন? রাণী জয়লক্ষ্মী—যিনি তোমার ভগিনী তিনি ত মাটিতে পা দেন না, মনে মনে বিশ্বাস তাঁর মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ধরাধামে নাই। রাণী "তুমি রাজা মানিকচাঁদকে জান না, তিনি একজন দেশহিতৈষী সর্ব্বজনপ্রিয় নৃপতি, আমার ভগ্নীর মত নারী আজকাল পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ, ইহাতে বিদ্বেষভাবের কি

আছে?" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বিদ্বেষ-ভাব কি? তোমার মনে বিশ্বাস আমি তাঁহাদিগকে হিংসা করি। তাঁহারা বড়ই হন বা ছোটই হন আমার তাহাতে কি? আমি ত তাঁহার প্রজা নই বা কোনরূপে দায়ীক নহি। তোমার ইচ্ছা হয় ভগিনীর নিকট যেতে পার, আমার অনুমতির আবশ্যক কি?" রাণী বলিলেন "তোমার অনুমতি ব্যতীত আমার যাওয়ার সাধ্য কি? যদি সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় দেও যাব, যদি না দেও যাব না।" রাণী ক্ষান্ত হইলেন। রাজা আর কথা বলিলেন না, কতক্ষণ কি ভাবিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মায়ের কোলে।

সুধা আজ বড় বিষণ্ণ, অদ্য তাহার শেষ দিন। হয় বিবাহে সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা—প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আজ আর কোন আপত্তি চলিবে না। দস্যু-সর্দ্দার বলিয়াছে যে, সহজে সম্মত না দিলে অদ্য জোর করিয়া পুরোহিত বিবাহ দিবে—ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। তাই আজ সুধা প্রস্তুত হইতেছে—আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে স্থির করিয়াছে। সুধার চক্ষে জল আসিল, একবার সেই হিতকারী যুবকের কথা মনে হইল, তিনি এই বিপদ জানিলে অবশ্যই উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দেবোপম কান্তি তাঁহার মানসে উদিত হইল। তারপর মায়ের কথা মনে হইল। মা যে কত চিন্তিত হইয়াছেন তাহা ভগবান জানেন। মা ব্যতীত তাহার আর কে আছে? সুধা একবার ভগবানকে স্মরণ করিল। মনে হইল যে সেই বিপদভঞ্জন ব্যতীত আর উপায় নাই। সে যুক্তকরে ঈশ্বরকে ডাকিল। সুধা ডাকিতে জানে না, সুধা কাঁদিতে জানে না, তবে প্রাণের বেদনা জগদীশ্বরকে জানাইতে জানে।

অদ্য দিনমান অস্ত হইল, সুধার চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাইল। সে উদ্ধারের কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিল না। কক্ষের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল, বড় বড় লৌহ-দণ্ড বাতায়নগুলি সুরক্ষিত। দ্বারটি বাহির হইতে বন্ধ। নৈরাশ্য তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে একস্থানে বসিল, চক্ষুর জলে গণ্ডস্থল সিক্ত হইল। সুধা শয়ন করিল, আহার্য্য দ্রব্য নিকটেই ছিল, স্পর্শও করিল না। গৃহে একটি আলো উপর হইতে জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রজনী এক প্রহর অতীত হইল, সুধার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল, হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, সুধার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিল তিনটি লোক প্রবেশ করিল। সুধা তখনই অনুমান করিল একজন সেই দস্যু-সর্দ্দার, একজন পুরোহিত ও একজন সাক্ষী, সম্ভবতঃ উহার সঙ্গী। দস্যু-সর্দ্দার বলিল "রূপসি, আজ কোন আপত্তি শুনবো না, পুরোহিত উপস্থিত, তুমি এখন সম্মতি দেও।" এই বলিয়া একগাছি বহুমূল্য হীরক হার তাহার সম্মুখে ধরিল। সুধা দুই হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিল, কোন কথা বলিল না। সর্দ্দার বলিল "সুন্দরি, একবার মুখ তোল, একবার

কথা বল, কি অনুমতি হয়। এ দাস ঐ চরণ-ভিখারী।” সুধা মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল “আপনি শুনেছি দয়ার সাগর, আপনি পিতা, আমি আপনার কন্যা, এ কন্যার প্রতি দয়া করুন, আমাকে মুক্তিদান করুন। আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, ভগবান আপনার উপর সদয় হবেন। দয়া পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্ম, এ দাসীকে কৃপা করুন।” সর্দ্দার বলিল “তুমি আমাকে জান না, আমি এ বনের রাজা। আমাকে শাসন করে এমন কেহ নাই। আমার নাম ব্রজনাথ সর্দ্দার, আমাকে না জানে পূর্ব্ববঙ্গে কেহ নাই। আমার ধন-দৌলতের সীমা নাই। তুমি রাজরাণী হবে। ইহাপেক্ষা সুখী কুত্রাপি হ’তে পার্‌বে না। ব্রজনাথের নামে ঢাকা জেলা কম্পবান্। আমার সৈন্যসংখ্যা কম নয়—প্রায় সহস্র লোক। আমি দেখিতেও কদাকার নই। অতএব আমাকে ভজনা কর্‌তে তোমার আপত্তি কি? তোমার রূপের মোহে আমি উন্মত্ত হয়েছি। তোমার কোন বিষয়ে কষ্ট হবে না।” সুধা দেখিল তাহার আর রক্ষার উপায় নাই, সে বুঝিল এই চতুর সর্দ্দারের হাত হইতে রক্ষা বড় কঠিন ব্যাপার। ব্রজনাথের নাম সে শুনিয়াছিল, সে সময়ে ব্রজনাথের নাম পূর্ব্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রজনাথ সহজে অত্যাচার করিত না। সে ধনীর ধন অপহরণ করিয়া দরিদ্রকে দান করিত। সময় সময় অনেক লোককে সে সাহায্য করিত। কেহ বিপদে পতিত হইলে তাহাকে আশ্রয় দিত।

ব্রজনাথ ক্রূর প্রকৃতির দস্যু ছিল না। সে কখনও প্রাণিহত্যা করিত না। ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিত। তাহার দলস্থ লোক সকলেই তাহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত, তাহার কথা উহাদের নিকট বেদবাক্য ছিল। ব্রজনাথ বৈষ্ণব ছিল, সে তুলসীতলায় প্রণাম না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইত না। দস্যুরা সাধারণতঃ শক্তির উপাসক, কিন্তু ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। সে বলিত,—“শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের নেতা, তিনি কংস প্রভৃতি অসুরকে স্বহস্তে বধ করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার উপাসক হ’য়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোক দিগকে শাসন কর্‌বো। তবে দেখবে—অযথা প্রাণি-বধ না হয়।” সর্দ্দার বৈষ্ণব, দলস্থ লোকেরা সব বৈষ্ণব, তাহাদের হরিধ্বনিতে বনভূমি প্লাবিত হইত। ব্রজনাথের এক দোষ ছিল, সুন্দরী স্ত্রীলোক হইলে তাহার হাত ছাড়া কঠিন হইত। সুধা সুন্দরী, তাই আজ সুধার প্রতি এত লক্ষ্য। ব্রজনাথের আড্ডা নানা স্থানে ছিল, সে যেমন দস্যুতার খবর পাইত, তেমনি সুন্দরী স্ত্রীলোকের সংবাদ পাইত। ব্রজনাথের আর এক গুণ ছিল—সে কড়া কথা বলিত না, মিষ্ট কথায় নিজ কার্য্যোদ্ধার কর্‌বেই। আজ কিন্তু সুধার নিকট সে পরাজিত হইতে চলিল। সুধার কথায় এক একবার তাহার মন বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কার্য্যোদ্ধার করিতেই হইবে, অতএব ব্রজনাথ উদ্দেশ্য ভুলিল না।

যখন সুধা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, তখন ব্রজনাথ পুরোহিতকে বলিল,—“ঠাকুর, আপনি

স্বকার্য্য করুন। এ বালিকা নিজের ইষ্টানিষ্ট বুঝতে পাচ্ছে না, একবার দুই হস্ত একত্র হ'লেই সব আপত্তি ঘুচে যাবে; সব মান, অভিমান, রাগ যাবে। আপনার পুরস্কার জানেন ত? এক শত মুদ্রা দক্ষিণা, আর—ব্রাহ্মণীর স্বর্ণ গহনা এক খানি। অতএব আর বিলম্ব কর্‌বেন না।" পুরোহিত বলিলেন,—"এ যে অসম্মত, কি ক'রে বিবাহ হবে?" ব্রজনাথ বলিল,—"কেন হবে না? ইহার আবার সম্মতি অসম্মতি কি? যদি পঞ্চম বৎসরের বালিকার হিন্দুমতে বিবাহ হয়, তবে সে কি সম্মতি দিতে সমর্থ? আপনি অগ্রসর হন। এই নিন অগ্রিম ৫ খানা মোহর। পুরোহিত ঠাকুর মোহরের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়া গেলেন, হাত পাতিয়া মোহর গ্রহণ করিয়া বস্ত্রে বেশ করিয়া বন্ধন করিলেন, তারপর সুধাকে বলিলেন,—"মা, রাজরাণী হবে আর আপত্তি করো না, তুমি এখন সব বুঝতে পাচ্ছ না। কত ভাল ভাল বস্ত্র, কত স্বর্ণ অলঙ্কার পাবে।" সুধা পুরোহিতের কথায় কোন উত্তর করিল না, ব্রজনাথের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল,—"তুমি কিছুতেই আমার মিনতি শুন্‌লে না? এ কাতরধ্বনি ভগবানের নিকট পৌঁছিবে, তিনি শুন্‌বেন। তুমি জান না ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার অসীম দয়া, তিনি তাঁহার দাসীকে দয়া কর্‌বেনই। আর কিছু না হ'ক আমি ত আত্মহত্যা কর্‌তে পার্‌বো, তথাপি দস্যুপত্নী হ'ব না।" দস্যু-সর্দ্দার হাসিয়া বলিল,—"সুন্দরি, যতই বল, যতই রাগ কর, আমি তোমাকে ছাড়্‌বো না। এখন আমি তোমার অভিভাবক, তোমার ভালমন্দ এখন আমি ভাল বুঝবো।" তারপর পুরোহিতকে বলিল,—"ঠাকুর, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।" পুরোহিত অগ্রসর হইলেন, তখনই পুষ্প ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনীত হইল, দস্যু-সর্দ্দার এক আসনে উপবেশন করিল, পুরোহিত বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে উদ্যত হইলেন। সুধা উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"দয়াময়, ভক্তাধীন, বিপদভঞ্জন, এ সময় কোথায় তুমি দাসীকে চরণে স্থান দেও।" তখন এক অপূর্ব্ব আলোক গৃহে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি শুক্লবসনা রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুধাকে কোলে করিয়া বসিলেন,—সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

অমাবস্যার রাত্রি, ভীষণ অন্ধকার। সাভা-রের উত্তর দিকস্থ মঠবাড়ী হইতে বংশাই নদীর ধার দিয়া বরাবর নিবিড় বন। পিঠালী পুকুরের চতুর্দ্দিকে বড় বড় পাদপ মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শাল, সেগুণ, দেবদারু, এই সব বৃক্ষই অধিক। কণ্টকযুক্ত বন বাঁশ ও বেতসকুঞ্জ স্থানে স্থানে থাকায় পথিকের পথ চলা কষ্টকর হইয়াছে। এ সব স্থানে লোকের গতিবিধিও কম, কারণ দস্যুভীতি অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ রজনী-যোগে কেহই এ রাস্তায় চলে না। এই অমাবস্যার রাত্রে এক জন পথিক একাকী অতি ধীরে ধীরে পিঠালী পুকুরের ধারে

উপস্থিত হইলেন ; সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র অশ্ব, এই বনে রাত্রিকালে চলিতে পারিবে না বলিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া আনা হইয়াছে। পুষ্করিণীর নিকটে প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ, সেই বৃক্ষে অশ্বটিকে বন্ধন করিয়া পথিক ঐ স্থানে বসিলেন। পথিকের যেন ভয় হইতে লাগিল, কারণ এক একবার সঞ্চালিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। পথিকের শুভ্র বসন পরিধান, একটি শুভ্র চাদর গাত্রে আছে ও একটি শুভ্র পাগড়ী মস্তকে বাঁধা। লোকটিকে সহজে চিনিবার উপায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর একটি লোক তথায় উপস্থিত হইল। দুই জনে নিঃশব্দে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটি ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে দুই জনে গিয়া একখণ্ড প্রস্তর সরাইল, এবং বাতি অন্বেষণে নিম্নে অবতরণ করিল। তথায় একটি সুন্দর কুঠারী, সে স্থানে দুজনে বসিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

১ম। আমি যে বিষয় বলেছিলাম, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

২য়। আমার স্মরণ,আছে সুবিধা হচ্চে না।

১ম। তোমার এত লোক আয়ত্তে আছে, তোমার অসাধ্য কি ?

২য়। যার কথা বল্‌ছ, তিনিও বড় সহজ লোক নন।

১ম। আমি তা জানি, তাই উপযুক্ত পাত্রে ভার ন্যস্ত হ'য়েছে।

২য়। আমি চেষ্টা কর্‌বো, তবে ফল কি হবে জানি না। সিংহের সঙ্গে লড়াই সহজ ব্যাপার নহে।

১ম। আমি শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার চাই। এই নেও বায়না। এই বলিয়া পঞ্চাশ টাকা তখনই গণিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"চাই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা, এত অল্প টাকায় কি হবে ? অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা অগ্রিম না দিলে আমার লোকেরা এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌বে না।"

১ম ব্যক্তি তখন কয়েক খানা মোহর বাহির করিয়া দিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির চক্ষু উজ্জ্বল হইল।

১ম। এখন হবে ত ? কবে আবার শুন্‌বো ?

২য়। শীঘ্রই আমার লোক যাবে, কোন চিন্তার কারণ নাই। আপনার আর আসা কোন দরকার নাই। চলুন, আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

উভয়ে আবার উপরে উঠিল, অবশেষে পুকুরধারে উপস্থিত হইয়া ১ম ব্যক্তি বলিলেন,—"এখন আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, আমরা চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারি নাই। এবং আরও বিপদে পতিত হ'য়েছিলেম। যা'ক সে কথা, এখন আশা করি, কৃতকার্য্য হ'ব।

২য় ব্যক্তি বলিলেন,—"কোন চিন্তা করবেন না, আমি শীঘ্রই শুভ সংবাদ দিব। কোন একটা বিষয়ে আমার মন খারাপ আছে, কিন্তু উপায় নাই, তাই চুপ করে আছি। আপনি যান।" ১ম ব্যক্তি অশ্ব-বল্গা ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং অশ্বারোহণে রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুষ্করিণী-তীরে।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় পা ছড়াইয়া দিয়া সরস্বতী এক পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া আছে। সরস্বতী সুন্দরী—জ্যোৎস্নার আলোক তাহার গাত্রে পতিত হওয়াতে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরস্বতীর লম্বা কেশ মৃত্তিকা চুম্বন করিয়াছে। সরস্বতী দুই পা জলে দিয়া এক একবার জল ছিটাইতেছে, আবার পদযুগল তুলিতেছে। সরস্বতী চাঁদের দিকে তাকাইতেছে, আবার জলের মধ্যে যে চাঁদ তাহাও দেখিতেছে। সরস্বতী গান ধরিল,—

"আমার কে ডাকে!
বাঁশীর গানে পাগলিনী ঘুরি ফাঁকে ফাঁকে।
'রাধা' 'রাধা' বলে বাঁশী, প্রাণ মন হয় উদাসী
কোথায় পাব কালশশী ভাবি যে তাঁকে।
বনে বনে বেড়াই আমি, দেখা দাও হে জগৎস্বামি
ভক্তিপুষ্প উপহারে পূজি যে তোকে।
এস হে পরাণ-সখা,
দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
শ্যাম মূরতি খানি হৃদয়ে আঁকা
অকারণে কেন নাথ, ক্লেশ দাও দিবারাত
আর যে সহেনা প্রাণে, ভাঙ্গিবে মোকে।"

সঙ্গীত তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। একে মধুর রজনী, তাহাতে মধুর সঙ্গীত, আবার সঙ্গিতকারিণীর মধুর মূরতিখানি মধু ঢালিতেছে, চারিদিকে যেন মধুর ছড়াছড়ি। সরস্বতীর কিন্তু জ্ঞান নাই, সে সঙ্গীতে তন্ময়। এক জন যুবক উপরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ সে দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন, পুনঃপুনঃ সে রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এমন সুন্দরী আর দেখেন নাই ও এমন সুন্দর সঙ্গীত আর শ্রবণ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, সরস্বতী আর উঠিতেছে না, তখন মনে হইল বুঝি বা পাগলিনী। তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাকিলেন,—"সুন্দরি!" সুন্দরি প্রথমবার শুনিল না, দ্বিতীয়বার ডাকাতে পশ্চাতে তাকাইল, এবং অবজ্ঞার ভাবে মুখ ফিরাইয়া আবার জলের দিকে তাকাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে লাগিল। যুবক অবাক হইলেন, একাকিনী রমণীর অন্য লোক দেখিলে ভীত হওয়ার কথা, এ সুন্দরী ভীত নয়। সে অবজ্ঞার ভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিল—মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিল না। নিশ্চয়ই এ রমণী পাগলিনী, কিন্তু পাগলিনী অনুমান করিতে তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি অগ্রসর হইলেন, জলের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"একাকিনী এ রাত্রে এখানে কেন? তোমার কি কিছু ভয় হয় না?" সরস্বতী হাসিয়া উত্তর করিল, "ভয়ের কারণ কি? মানুষ মানুষকে দেখিয়া ভয় করবে কেন? পশুকে ভয়ের কারণ আছে, মানুষকে আবার ভয় কি?" যুবক এ উত্তরে অবাক হইলেন, তবে ত উন্মত্তা নহে। তিনি বলিলেন—"সত্য বটে পশুকে ভয় করতে হয়, কিন্তু মানুষের মধ্যেও অনেক পশু আছে, তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম।" সরস্বতী

হাসিয়া বলিল,—"তুমি ত সেরূপ নও, তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝ্তে পেরেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই—এখানে এই নির্জ্জন স্থানে তোমার কি প্রয়োজন?" যুবক অপ্রস্তুত হইলেন, তিনি যে কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সরস্বতীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। সরস্বতী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল,—"আমার দিকে এত দৃষ্টি কেন? আমার মুখখানি কি বড় সুন্দর? আমার সৌন্দর্য্য কি উছ্‌লে উঠ্‌ছে?" যুবকের মুখে আর কথা নাই, তিনি এমন মুখরা স্ত্রীলোক আর দেখেন নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি যথার্থই সুন্দরী। চাঁদের দিকে লোকে তাকায় কেন? উদ্যানে প্রস্ফুটিত ফুল দেখ্‌লে লোকে সে দিকে দৃষ্টি করে কেন? তাই তোমার দিকে সকলেরই দৃষ্টি। তোমার সাহসকে ধন্য, বালিকা স্ত্রীলোক একাকিনী এমন স্থানে থাক্‌তে সাহসী হয় না। কতরূপ বিপদ হ'তে পারে।" সরস্বতী বলিল,—"আমি যে সাধারণ স্ত্রীলোক তাহার প্রমাণ কি? আমি দেবী হতে পারি, পেত্নী হ'তে পারি, ডাইনী হ'তে পারি, রাক্ষসী হ'তে পারি। তুমি কি ক'রে জান্‌বে আমি কে? আমি একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক, আমি কাকে ভয় কর্‌বো? আমাকে সকলে ভয় করে।" যুবক অবাক হইয়া গেলেন, এমন স্ত্রীলোক কখনও দেখেন নাই। তিনি বলিলেন,—"যুবতী, আমি তোমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি।' একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য, তুমি কে? এখানে কেন? বাড়ী কোথায়?" সরস্বতী বলিল—"আমি তোমার এত প্রশ্নের উত্তর দিতে কি বাধ্য? তুমি আমার কে?" যুবক উত্তরোত্তর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"উত্তর দিতে বাধ্য নয়, তবে ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিতে পার।" সরস্বতী হাসিয়া উত্তর করিল,—"এত ভদ্রতার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার কাজে যাও, আমি আমার কাজে যাই, আমাকে কি স্মরণ থাক্‌বে? আমি অনুসন্ধান কর্‌বো তুমি কে।" সরস্বতী বলিল,—"আমার ন্যায় লোকের অনুসন্ধানে কি ফল?" যুবক আর কিছু উত্তর না দিয়া উপরে উঠিলেন,—এবং এক বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ।

তুমি।

তুমি স্বর্ণ স্বপন কোলে তোল জাগাইয়া।
তুমি শৈশব-স্রোতে লও হাত ধরিয়া॥
তুমি ভাসাইয়া দাও দূরে, প্রেম-মলয়-সমীরে।
তুমি বারি রেণু হয়ে ঢাক নৌকা-তরীরে॥
তুমি আঁখির পলকে ডুবাও (সে) বসন্ত-তান।
ঘুমায়ে পড়ে গো যাহে আমার
(তরুণ) জীবন-গান।
আমার মদিরা-অলস-বিভোরা জীর্ণ দেহ।
নিভিয়া গিয়াছে যে গো সকল মমতা-স্নেহ॥
আমি ডুবিয়া রহি মিছে তোমা হ'তে আসিয়া।
স্বপ্নে খেলা করি পুনঃ তোমাতে যাই মিশিয়া॥

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

সমালোচনা।

রবিবাবুর গোরা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাষা ও ভাব।

দাদা, এ উপন্যাসের ভাষাটা কেমন? রবিবাবুর রচণাপ্রণালীই বা কিরূপ? শব্দ-বিন্যাসই বল আর পদ-রচনাতেই বল, ওজস্বিতাতেই বল আর প্রসাদ-গুণেই বল রবিবাবুর রচনাপ্রণালী অতি মনোহর। ভাষাটা পরিচ্ছদ বই ত নয়। সে পরিচ্ছদে পারিপাট্য থাকিলে সুন্দরকে অধিকতর সুন্দর দেখায়। ভাষার গুণে ভাবের কান্তি ফোটে ও সৌরভ ছোটে। রবিবাবু এক জন উচ্চ-দরের শিল্পী। গোরা উপন্যাসে তিনি বিলক্ষণ রচনানৈপুণ্য ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে এ জগতে নিখুঁৎ কোন জিনিষই নাই;—চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কুসুমে কীট আছে, রবিবাবুর লেখাতেও দোষ আছে।

দাদা রবিবাবুর ভাষাতে দোষ আছে বলচ; আচ্ছা দুচারিটা দোষ দেখিয়ে দাও দেখি।

উদাহরণ চাও, এই নেও—"জনতার চলাচল জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল; গোরা সকলকে খাপ-ছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠেচে; মুখের গড়ন অনাবশ্যক রকমের বড় ও অতিরিক্ত রকমের মজবুত; বিনয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মত নম্র ও উজ্জ্বল; গোরা উষ্ণ হয়ে কহিল; এমন বাঁদরামি তোমাকে না পেয়ে বসে; বিনয় কথা-হত ভাঙ্গা ঘোড়ার মত; মার কথা শুনে আমার মনের ভিতর কি রকম একটা নাড়া চাড়া হচ্চে; পল্লবিত চিক্কণতা দেখা যাইতেছে; অপূর্ব্ব মিষ্টতার সঙ্গে যেন ঈর্ষার বেদনা বহন করিয়া আনিল; আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানিবেন; সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল; তার মুখ ও কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল; শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিতেছিল; নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল; বিনয় খামকা এসে খাপছাড়া ভাবে কহিল; অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত বলিল; তার শক্তির পাড়টুকু অত্যন্ত সত্য ও অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল; প্রচুরভাবে হেসে উঠিল. কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততা; সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শুনিলেন; নির্দয় উৎসাহ; আপনার সহিত আলাপ করে আমার সন্ধ্যা খুব সুখে কাটিয়াছে।"

সাহেবরা বহুদিন বাঙ্গালাদেশে থেকে, বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশে, বাঙ্গালা ভাষা শিখে, বাঙ্গালীর সঙ্গে যে ছাঁদে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, এ সেই ছাঁদ সেই বুলি, সেই ভাষা। সহজেই মনে হয় এ বাঙ্গালা English Idiom এর অবিকল অনুবাদ।

রবিবাবুর লেখাতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা থাকি-বারই কথা; তা না হয়ে ইঙ্গবঙ্গ বা মিশ্র-ভাষার সমাবেশ কেন হইল?

এ প্রশ্নের উত্তর—রবিবাবু কবি। যাঁরা কবি তাঁরা দেখেন অন্য রকমে, শোনেন অন্য রকমে, বোঝেন অন্য রকমে, বলেন অন্য রকমে, লেখেন অন্য রকমে। সাধারণ লোকে

ক'রে দেখে না বা দেখ্‌তে জানে না, তেমন ক'রে শোনে না বা শুন্‌তে শেখে নি, তেমন ক'রে বোঝে না বা বুঝ্‌তে পারে না, তেমন ক'রে বলে না, বল্‌তে শেখে না বা বল্‌তে পারে না, তেমন ক'রে লেখে না বা লিখ্‌তে অভ্যাস করে না। সেইজন্য রবিবাবুর শব্দ-বিন্যাস ও পদরচনা স্বতন্ত্র রকমের। এ উপ-ন্যাসে চলিত ভাষার প্রয়োগ আছে—যে ভাষায় আমরা ঘরে ঘরে বাপ-মা ছেলে-মেয়ে ও ভাই-ভগ্নীর সহিত কথা কই। কেতাবি ভাষায় কথা কওয়াটা স্বাভাবিক নয়; সাধু ভাষায় কেহই ত আমরা কথা কই না। এটা নিতান্তই বিড়ম্বনা। এ বুলি বল্‌তে গেলে গলায় বাজে, কাণে কর্কশ লাগে; এতে সরলতাকে সময়ে সুময়ে গোপন কর্‌তে হয়। রবিবাবুর styleটী colloquial style, বড় মনোরম ও মর্ম্মস্পর্শী।

দাদা, রবিবাবুর ভাষার কথা বল্লে, রচনা প্রণালীর কথাও বল্লে, কিন্তু তাঁর ভাবের কথা কিছু বল্লে না তো?

তাঁর ভাবের কথা বলি শোন। রবিবাবুর লেখায় ভাষার ঔজ্জ্বল্য আছে, ভাবের গভীরতা আছে। তাঁর লেখায় যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস তেমনি ভাষার ছটা। মধুর ভাষায় মধুর ভাব প্রকাশ করা যার-তার কর্ম্ম নয়। গোরা উপন্যাস পড়্‌তে পড়্‌তে কতই কেঁদেছি, কতই হেসেছি। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, রাগ, দ্বেষ, বিস্ময় সময়ে সময়ে মনে উদয় হইয়াছে, আবার একে একে সেগুলি জলবুদ্বুদের মত মনেতেই মিলাইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত ভাব পাঠকের মনে উদ্দীপিত করিবার শক্তি রবিবাবুর বিলক্ষণ আছে। এই অপূর্ব্ব উপন্যাস হইতে দুচারিটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব। ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিতে চান নিম্ন-লিখিত কয়েকটী স্থান পড়িয়া দেখুন—

১। "পূর্ব্বদিকের উষার আভাস তার কাছে যেন একটা বাক্যের মত প্রকাশ পাইল; যেন প্রাচীন তপোবনে একটা বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া উঠিল, তার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণকালের জন্য তার মনে হইল তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটী জ্যোতিঃ-রেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় শতদল সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল। তার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।"

২। "অন্ত না থাকিলে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেন, নচেৎ তার প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নাই তার সম্পূর্ণতা নাই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।"

৩। "মনুষ্য ভুল করিবে, ব্যর্থও হইবে, দুঃখও পাইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিবে না; যাহা উচিত বলিয়া জানিবে তাহার জন্য আত্ম-সমর্পণ করিবে। এমনি করিয়াই পবিত্রসলিলা সংসার-নদীর স্রোত চিরদিন প্রবাহমান হইয়া বিশুদ্ধ থাকিবে।"

৪। "ঈশ্বর কোন এক অবস্থার মধ্যে

তাঁর সৃষ্টিকে শৃঙ্খল দিয়া আবদ্ধ রাখেন না। তাহাকে নব নব পরিণতির মধ্যে চির-নবীন করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন।"

৫। "ধর্ম্মের দুটো দিক আছে, একটা নিত্য দিক আর একটা লৌকিক দিক। ধর্ম্ম যেখানে সমাজের নিয়মে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেখানেও তাঁকে অবহেলা করতে পারা যায় না; তা করলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।"

৬। "প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটা বিশেষ অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় যে সকলের কাছে সুস্পষ্ট তাও নয়। কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করা ত মানুষের কাজ. গাছপালার মত অচেতন ভাবে নিয়ম মেনে যাওয়া তার সার্থকতা নয়।"

৭। "জীবনের একি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! বিনয় যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থটীকে হৃদয়ে পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে একি সকলে পায়? ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? এমন যদি সচরাচর ঘটিতে পারিত তবে বসন্তের একটী মলয় হিল্লোলে যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত, তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি আছে, স্বভাবতঃই নানা বর্ণে, নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম। এই প্রেমই বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের দিনে গোরার হৃদয়ের মধ্যে একটী অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু সে সঙ্গীত কোন মতেই থামিতে চাহিল না। সমুদ্রগামিনী দুই নদী এক সঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের ধারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল।"

৮। "গোরার কথাগুলি শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে, তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশ-প্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা যে মত নয়—তাহা সম্পূর্ণ মানুষ এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে।"

রবিবাবুর ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি অসামান্য। শেষ দুটী অংশে ভাব ও ভাষার কেমন সুন্দর সমাবেশ দেখেছ?

হাঃ, দাদা। বিশেষত শেষ কয়েক পংক্তি পড়িলে মনে হয় রবিবাবুর ভাষাতে অনবরত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে।

আমি বলি—নবীন নীরদ কোলে ক্ষণপ্রভা খেলে।

দাদা, রবিবাবুর humour সম্বন্ধে ত কিছুই বল্লেনা। তিনি কোন্ দরের humourist?

এইবার তাঁর রসালাপের কথার অবতারণা করিতেছি।

রবিবাবুর humour উচ্চ অঙ্গের; তিনি বড়দরের humourist বা সুরসিক। তাঁর humourএ গাম্ভীর্য্য আছে, চপলতা নাই। যাঁরা কেবল অসার আমোদপ্রিয় তাঁরা রবিবাবুর humour পড়ে রস আস্বাদন করিতে পারিবেন না। যারা সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন,

চিন্তাশীল ভাবগ্রাহী, স্থিরমতি ও গম্ভীর-প্রকৃতির তাহারাই এ রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ। সমাজ-সংস্করণের অনেক উপায় আছে, তার মধ্যে satire একটী। যিনি satirist তিনি satire লিখে চোখে আঙ্গুল দিয়ে, প্রাণে খোঁচা মেরে লোকের দোষ দেখিয়ে দিয়ে সে দোষ সংশোধন করে দেন। সুতরাং ব্যক্তিগত দোষ, সমাজগত দোষ, রাজনীতিগত দোষ বা ধর্ম্মনীতিগত দোষ, সর্ব্বপ্রকার দোষ সংশোধন করা সংস্কারকদের কর্ত্তব্যের ভিতর। শ্লেষ বা ব্যঙ্গোক্তি satireএর আত্মা। মিষ্টি মিষ্টি করে দু'কথা শুনান অথবা চিপ্ টেন করে দু'কথা বলা এ satiristএর স্বধর্ম্ম। Reformer বা সংস্কারকের হস্তে শ্লেষাত্মক বাক্য বা satire অমোঘ অস্ত্র। ইন্দ্রের বজ্র এ অস্ত্রের নিকট হারি মানে। এই satireএর মধ্যে irony আছে, sarcasm আছে, humour আছে, শ্লেষ আছে, চিপ্ টেন আছে, ব্যঙ্গোক্তি আছে, রঙ্গরস আছে। গোরা উপন্যাসে satireএর বিকাশ মাঝে মাঝে দেখা যায়। রবিবাবুর শ্লেষপূর্ণ বাক্য কুসুমের ন্যায় কোমল নহে, বজ্রের ন্যায় কঠিনও নহে। যখন সেই বাক্য-গুলি ও পড়ি তখন মর্ম্মস্থলে ব্যথা পাই, কথাগুলি তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় প্রাণকে বিঁধিতে থাকে; পরক্ষণেই সে ব্যথা জুড়াইয়া যায়, আমরাও সে বেদনা ভুলিয়া যাই। ইংরাজী সাহিত্যে Addison যে দরের satirist ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে রবিবাবু সেই দরের satirist; তাঁর লেখায় গাম্ভীর্য্যও আছে আবার রসাভাসও আছে। এই দুই গুণের সমাবেশ আছে বলিয়াই তাঁর লেখা একঘেয়ে নয়, একঘেয়ে হ'লে বিষম বিরক্তিকর হ'ত। তাঁর সুমিষ্ট রসালাপ আমাদের বড় ভাল লাগে। সকলেই জানেন তীব্র ঝালে মুখ জ্বালা করে কিন্তু একটু মৃদু ঝাল না দিলেও ব্যঞ্জনের আস্বাদ বৃদ্ধি হয় না। দু'চারিটা উদাহরণ দিলে কথাটা বেশ বোঝা যাবে। শ্রীহস্ত অসূর্য্যম্পশ্য নয়। পুরুষ সাধকের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড চলে। সেই পবিত্র করপল্লবের উল্লেখটী পর্য্যন্ত যখন তোমার সহ্য হচ্চে না "তদানাশংসে মরণায় সঞ্জয়।"

২। "শ্রীহস্তে যদি পরিবেশন করে, তবে ম্লেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ।"

৩। "কুরুপক্ষে নারায়ণী সেনাতে আমার কাজ নেই আর পাণ্ডবপক্ষে নারায়ণেও আমার দরকার দেখি না।"

৪। "হিন্দুদের প্রাণ নিতান্ত সৌখীন প্রাণ। অল্প একটু ছোঁয়া ছুঁয়িতেই শুকিয়ে যায়, ঠেকাঠেকিতে মারা পড়ে।"

৫। "এ দেশে সাম্য থাকিলেও নীচ জাতিকে দেবালয়ে পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রে সেই সাম্য না থাকে, শাস্ত্র মধ্যে সে সাম্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি?"

৬। বরদা—গৌরমোহন বাবু? আপনি এ সমস্ত খাবেন না বুঝি?

গোরা—না।

বরদা—কেন? জাত যাবে?

গোরা—হাঁ।

বরদা—আপনি জাত মানেন?

গোরা—সেকি! জাত কি আমার তৈরি যে মানব না? সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি।"

৭। "ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে? তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না? কম্পাসভাঙ্গা কাণ্ডারীর মত তোমার পূর্ব্ব পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে?"

৮। "আপনার ফুল দুটী যতই সুন্দর হউক তবু তাতে ক্রোধের রংটুকু আছে। আমার এ ফুল সৌন্দর্য্যে তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু শান্তির শুভ্র রঙে নম্রতা স্বীকার করে হাজির হয়েচি।"

৯। "রাগ কবোনা দাদা? তোমাকে যমের কিঙ্কর বল্লে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সেত জানা কথা। কি কোরবে তাকে খেতে হবে ত।"

১০। "খুব সম্ভাব নিষ্কৃতি পাবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আসন, কীর্ত্তি ও যশ।

দাদা সাহিত্যিকদিগের ভিতরে রবিবাবুর আসন কোথায় দেওয়া উচিত? সাহিত্য-সেবিদের মধ্যে তাঁহাকে কোথায় বসাবে? বাঙ্গালা সাহিত্যের গুরু বলিয়া রবিবাবুকে তাঁর দেশের লোকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন হইয়াছে ও হইতেছে একথা অবাধে বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালী-প্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বারিকা নাথ বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, সারদাচরণ মিত্র, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার এরা বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। এ নক্ষত্রগুলি এখন অস্তমিত। বর্ত্তমানে যাঁরা উদিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামদয়াল মজুমদার, শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজলধর সেন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি।

উপরে লিখিত দুটী নক্ষত্রপুঞ্জের একটী পুঞ্জেও রবিবাবুকে পাওয়া গেল না। তাঁর নাম ও প্রতিষ্ঠা কবিকুঞ্জে। যে সময়ে বঙ্গ-দর্শনের, আর্য্য-দর্শনের, বান্ধবের খুব পসার ও প্রতিপত্তি, সে সময়ে কোন খ্যাতনামা সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে "বঙ্গের উদীয়মান কবি" আখ্যা দিয়া অভিহিত করেন। তিনি গীতি-কাব্যেই সিদ্ধহস্ত, নাটক বা মহাকাব্যে তাঁর হাত খোলে নাই। এখন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কবিকঙ্কন, কাশীদাস, কীর্ত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত ইহ জগতে নাই। এখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাই, নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র বা গিরিশচন্দ্র ঘোষও নাই এখন কাব্য-জগতে কবিকুঞ্জমাঝে দেখি এই সকল নাম—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅক্ষয়-

কুমার বড়াল, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী দাসী প্রভৃতি। কাহার উপরে ও কাহার নিম্নে রবিবাবুর নাম করা যায় এ বিষম সমস্যা; তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া, তাঁর কলকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সমগ্র য়ুরোপ খণ্ড তাঁকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। "বঙ্গের উদীয়মান কবি" আজ ভারতের কবিদিগের রাজা।

দাদা, রবিবাবুর কীর্ত্তি ও যশ সম্বন্ধে কিছু বল্লে না?

হাঃ, ঐ দুটী কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করিব।

গোরা উপন্যাস হইতে যে যে স্থান বা অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই সেই স্থান পাঠ করিলে এই কথা প্রতিপন্ন হইবে যে, রবিবাবু সংস্কারকের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কি রাজনৈতিক দোষ, কি সমাজনৈতিক দোষ, কি ধর্ম্মনৈতিক দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে রবিবাবু সেইখানে সেই দোষের উল্লেখ করিয়া যে উপায়ে তাহার নিরাকরণ হইতে পারে সে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে কার্য্যভার লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে কর্ত্তব্য পালনে তিনি কখন ত্রুটী করেন নাই; এবং তাহার যে অংশ এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহা সম্পাদন না করিয়া তিনি নিত্যধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তাঁর জীবনের mission যে দিন শেষ হইবে, সেই দিন তাঁর জপা-জপ ফুরাইবে। তিনি সেই ধ্রুব তারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার পথে চলিয়াছেন। এতাবৎ তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই; আশা করি কখনও হইবেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। যেখানে কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ সেখানে অন্তর্দৃষ্টিরও স্ফুরণ দেখা যায়। যিনি bard তিনি seer। কবি রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি এমন অনেক কথা বলে গিয়েছেন, যে গুলিকে আমরা দূরদর্শী ভবিষ্যৎ বক্তার ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তাঁহাকে Sir Oracle বলিয়া পূজা করি। রবিবাবু একজন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত; গোরা উপন্যাসে তিনি স্বাভাবিক মধুর ভাষায় গভীর দার্শনিকতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকল স্থান পড়িতে পড়িতে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই, বুঝিতে পারি না আমরা দর্শন পড়িতেছি, কি উপন্যাস পড়িতেছি, কি কাব্য পড়িতেছি। এ শক্তি বড় সামান্য শক্তি নহে। এই অসাধারণ শক্তি বলেই না রবিবাবু য়ুরোপকে অথবা সমগ্র জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারিয়াছেন। নোবেল প্রাইজ কি যে-সে লোকে পায়; কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র এই প্রাইজ পাইয়া থাকেন। রবিবাবু সেই নোবেল প্রাইজ লইয়া গৌরব ও যশোলাভ করিয়াছেন। ইহাতে যে তাহারই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে এমন নহে, তাঁর কুলের গৌরব, তাঁর জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে কবি ধন্য, আমরা ধন্য আর আমাদের দুঃখিনী ভারত-মাতাও ধন্য হইয়াছেন। তিনি ভারতমাতার কৃতী সুসন্তান, বাঙ্গালা ভাষার

ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক। কবি অমর হউন, তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত হউক।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ।

সীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজমহিষী সুমিত্রা-জননী প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রণত পুত্রদ্বয়ের মুখচুম্বন ও তাঁহাদিগকে সস্নেহ মধুর সম্ভাষণ পূর্ব্বক গদ গদ বচনে বলিলেন,—বৎস রাম, অদ্য সত্যবদ্ধ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; আহা! আজ অযোধ্যার কি আনন্দের দিন! এক্ষণে রঘুকুল দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি নিষ্কণ্টকে আজীবন বধূমাতা সীতার সহিত এ বিরাট অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করত পরম সুখে রাজরাজেশ্বররূপে অযোধ্যার রত্ন সিংহাসনে অবস্থান করিতে থাক। প্রার্থনা অচিরে এ বিশাল বিশ্বে তোমার অনন্ত কীর্ত্তি-কথা বিঘোষিত হউক।

রাম কহিলেন,—"জননী এদিকে কি হইয়াছে, তাহা কি এখনও আপনি জানিতে পারেন নাই? মহারাজ ইতিপূর্ব্বে বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট দুইটি বর দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এখন তিনি পিতার নিকট এক বরে আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ও অপর বরে বৎস ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাকে পিতৃসত্য পালনার্থ অদ্যই জটাবল্কল ধারণ করিয়া সীতা সহ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইবে।

এই শোকাবহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্নেহশীলা সুমিত্রা-জননী অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, এবং শোকাকুলচিত্তে রামকে বলিলেন,—"বৎস রাম! আমি তোমাকে ভালরূপই জানি, তুমি যে মহারাজের সত্যধর্ম্ম-রক্ষার্থ অপরের শত অনুরোধেও গৃহে থাকিতে সম্মত হইবে না,—তাহাও বুঝি; তাই তোমাকে বনগমনসঙ্কল্প হইতে বিরত থাকিবার জন্য বৃথা অনুরোধ করিব না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে, তোমার নিত্য সহচর লক্ষ্মণকে তোমাদের বনসঙ্গী করিতে হইবে। লক্ষ্মণ যে তোমার চিরদাস; তুমি কিছুতেই আমার এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

অতঃপর তিনি লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বৎস লক্ষ্মণ! যদিও সকলের প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, তথাপি আমি তোমাকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনগমনে আদেশ দিতেছি। বৎস! রামচন্দ্র যখন যেরূপভাবেই থাকুন,—সুখে-দুঃখে তিনিই তোমার একমাত্র গতি। জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়া অনুজের পরম ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তুমি এখন হইতে রামকে তোমার পিতা দশরথের এবং সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিয়া বনবাস কালে তাঁহাদের সেবা-পরিচর্য্যা করিবে। আমি অনুরক্তি ও

আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে স্বচ্ছন্দ মনে রামের অনুগমন কর।

সুমিত্রা-জননী জানিলেন না যে, ভ্রাতৃ-ভক্ত লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই রামসহ বনগামী হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।" এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—"জননি! ভ্রাতা লক্ষ্মণ ইতিপূর্ব্বেই আমার বনসহচর হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। রামের বাক্য সমাপ্ত হইলে সুমিত্রা দেবী বলিলেন,—"বৎস! আমি তোমার মুখে লক্ষ্মণের শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা নিরাপদে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অরণ্যবাস করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ চিরযশস্বী চিরপ্রসিদ্ধ রঘুবংশের মুখোজ্জ্বল কর। এই বলিয়া জননী বিদায়প্রার্থী প্রণতঃ পুত্রদ্বয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষণের সহ পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। অপত্যবৎসল দশরথ পুত্র-পুত্রবধূ প্রভৃতির দর্শনে, অশ্রুপাত করিতে করিতে যেমন গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিতে যত্ন করিলেন, অমনি তিনি হা রাম! বলিয়াই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পিতৃ-ভক্ত রাম ও লক্ষণ দ্রুত গমনে পিতার সন্নিহিত হইয়া শোক-দুঃখ-কাতর মূর্চ্ছিত পিতাকে শশব্যস্তে ধরিয়া তুলিলেন। স্নেহাস্পদ পুত্র-দ্বয়ের শীতল হস্ত স্পর্শে রাজার মোহ অপনীত হইল। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজমহিষীরা সকলে নৃপতি সমীপে উপনীত হইয়া হা রাম! হা রাম! বলিয়া রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিষম আর্ত্তনাদে সে গৃহ পূর্ণ হইল। চির আনন্দ পূর্ণ রাজভবন মহাশোকের আধার হইয়া উঠিল।

উচ্ছ্বসিত শোকাবেশ—রমণীগণের ক্রন্দন ধ্বনি, কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রথমতঃ শোকবিহ্বল রাজা দশরথের পাদবন্দনা করিয়া অনন্তর সমাগত রাজমহিষীগণের চরণে অভিবাদন করতঃ তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পুরদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহসা অযোধ্যায় দারুণ শোকের বিষম ঝড় বহিল। বিরাট রাজভবন এক মহা রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধা কৈকেয়ী ও ক্রুদ্ধা মন্থরা ভিন্ন রাজপুরীর সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! অযোধ্যার রাজভবনের শোচনীয় দৃশ্য শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ কঠোর প্রাণ বজ্রময় পুরুষেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শোক-দুঃখে প্রাণে অনন্ত বিষাদের ঘোর কালিমা ঢালিয়া দেয়।

হায়! যিনি ক্ষণকাল অন্তে অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে অধিরোহন করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য ও অতুল রাজ সম্পদের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন, তিনিই এক্ষণ নিতান্ত অনাথের ন্যায় তপস্বীর দীন বেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতাসহ বনগমন করিতেছেন! অহো! কি বিষম করুণ দৃশ্য! যিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের

অধীশ্বর রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক দুহিতা, রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং মহাবীর মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী; যিনি সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী সম্রাজ্ঞী হইতে যাইতেছিলেন, সেই অলোকসামান্যা অনন্যসাধারণ অসূর্য্যাম্পশ্যা রূপিণী মহিয়সী মহিলা জানকী কি না আজ মহা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে রাজসম্পদ ও রাজভোগ-সম্ভার অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া তীর্থযাত্রা অভি-লাষিনী তাপসীর ন্যায় হীনবেশে বনগমন করিতেছেন। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে কার হৃদয় না শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়? কোন্ পাষাণ-হৃদয় নরনারী অশ্রুমোচন না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন?

অনন্তর সুমন্ত্র সারথি তথায় উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে রথারোহণে বনগমন করিবার জন্য মহারাজের আদেশ ও স্বীয় অনুরোধ জানাইলেন। রাম অগত্যা ভাগীরথী-তীর পর্য্যন্ত রথারোহণে যাইতে সম্মত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ রথা-রোহণ করিলেন। রাম বনবাস-বার্ত্তা শ্রবণে নগরবাসিগণ যারপরনাই শোকাভিভূত হইয়া অশ্রুমোচন ও হাহাকারধ্বনি করিতে করিতে দ্রুত গতিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাজভক্তপ্রজাগণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়া তাঁহাদের রাজাকে বনে যাইতে না দিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল।

রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের ক্রন্দন শ্রবণ ও কাতরতা দর্শন করিয়া করুণ-হৃদয় রাম রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দলে দলে মর্ম্মাহত প্রজাগণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অনবরত রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিল। অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ সকলে কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। অবিরত রোদন ও হাহাকার-ধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল। সকলেই শোকাভিভূত, সকলেই অশ্রুপ্লুত, কেহ কাহা-কেও সান্ত্বনা করিবার লোক নাই। সুখ-শান্তিপূর্ণ অযোধ্যানগরী ঘোর বিষাদ-মণ্ডিত ও গভীর শোক-দুঃখের আবাসভূমি হইয়া উঠিল।

এই শোচনীয় করুণ দৃশ্য—প্রজাগণের এই অতি কাতরতা ও আন্তরিক রাজভক্তি দর্শনে প্রজাবৎসল রাম যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি অশ্রুমোচন করিতে করিতে সস্নেহে ও মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—তোমরা ভরতের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ প্রদর্শন করিবে; ভরত আমার প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ এবং অতি ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতি-কুশল। ভরত রাজা হইলে তোমাদের কিছু-মাত্র অশুভ বা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাদিগকে সসম্ভ্রমে ও সস্নেহে অনু-রোধ করিতেছি যে, তোমরা আর আমার সহিত অগ্রসর না হইয়া সত্বর স্ব স্ব গৃহে প্রতি-গমন কর। আমার প্রতি তোমাদের এরূপ প্রাণের টান ও আন্তরিক কাতরতা দর্শনে আমার প্রাণ বড় আকুল হইতেছে। অতএব তোমরা আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমার প্রাণে আর ক্লেশ দিও না। তোমরা এরূপ করিলে আমি তোমাদের [illegible]

বড় কাতর হইব; সুতরাং তোমরা আমার হৃদয়ের বেদনা আর বৃদ্ধি না করিয়া—আমার কল্যাণ কামনায় এক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন কর।

রাজভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ শ্রীরামচন্দ্রের সে সনির্ব্বন্ধ করুণ আদেশ ও ঐকান্তিক অনুরোধ-বাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অগত্যা অজস্র রোদন, পরিতাপ ও [illegible] ধ্বনি করিতে করিতে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে করুণ-প্রাণ রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে দ্রুত-বেগে রথ চালাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে অযোধ্যানগরী তাঁহাদের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইতে লাগিল। রথ বহুদূরে চলিয়া গেল। বিষাদ-মণ্ডিত অযোধ্যাপুরী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। যখন রামের রথ আর কাহারও দৃষ্টি পথের পথিক হইল না, তখন উপস্থিত জনসঙ্ঘ রোদন করিতে করিতে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেদিন চির-সুখ-শান্তিপূর্ণ, চির হাস্যময় অযোধ্যায় এক মহাশোকের বিষম ঝড়—এক প্রবল অশ্রু-প্রবাহের মহা বন্যা প্রবাহিত হইয়া গেল। অরুন্তুদ শোক-দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া স্বর্গসম পরম শান্তিধাম অযোধ্যাভবন যেন শোক-দুঃখক্লিষ্ট মানব-মানবীর ন্যায়ই নিরন্তর হা রাম! হা সীতা! ধ্বনি পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল! রাম-সীতার শোকে যেন পাষাণ গলিল, বনের পশু-পাখী কাঁদিল এবং প্রকৃতির স্নেহ চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা বহিল; সোণার অযোধ্যা মুহূর্ত্তে মহা শ্মশানে পরিণত হইল। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

ভাগীরথী।

পুণ্য ভাগীরথী　　প্রবাহিতা তুমি
　পুণ্য করি কত দেশ.
শোভে তব বক্ষে　　বিবিধ তরণী
　লইয়া দব্য অশেষ।
পুণ্য-কথা তব　　বহুকাল ধরি
　আছে প্রচলিত ভবে,
করিতে প্রচার　　মহিমা তোমার
　সাধুজন গায় সবে।
পূতনীরে তব　　পবিত্র হইয়া
　সঞ্চিয়া অশেষ পুণ্য,
মহাজ্ঞানী কত　　গিয়াছেন চলি
　ভারত করিয়া শূন্য।
পাপীতাপী জন　　প্রসাদে তোমার
　তরিয়া গিয়াছে কত,
ধার্ম্মিক ঈপ্সিত　　মহনীয় পদ
　লভেছে কতেক শত।
স্থান দিও পদে　　এই মা মিনতি
　কি জানি কি আছে ভালে,
চলি যাব কোথা　　কিছুই না জানি
　সে দিন অন্তিম কালে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

দাঁড়াও।

তোমার বাঁশরী জীবন-কুঞ্জে
　বাজেগো শুধু বাজেগো!
মুরতি সেথায় পূত কিরণে
　রাজেগো শুধু রাজেগো!
অন্ধ আমি গো কেবলি অন্ধ,
রেখেছি আমার দুয়ার বন্ধ;—

গানটী তোমার শুনিনে শ্রবণে,
থাকি গো আন্ কাজে গো!
তোমারি গানের মাঝারে স্বামী,
(যেন) কোথায় হারায়ে গিয়েছি আমি,—
আপনার মন দিয়েছি তোমারে,
একি দায় মরি লাজে গো!
বল প্রিয়তম এ কেমন ধারা,
(কেন) বাঁশী গানে প্রাণ হয় মাতোয়ারা ;—
ব্রজাঙ্গনা-ধন,—বাঁশীটী তোমার
কেন গো এমন বাজে গো!
তবু, বাজুক বাঁশরী ;—বাজাও তেমনি,
যমুনা উজান করাতে যেমনি,—
(মম) হৃদয়-যমুনাকি-তীরে গোপাল,
দাঁড়াও তেমনি সাজে গো!
যেন, নন্দ দুলাল শিখি-পুচ্ছ-শিরে,
হাতেতে বাঁশীটী রাজে গো।
শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোথায় চলিলি, মাগো!
কোন দূর-ভবনে॥

[গত ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে লেখকের কোনও এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর অকাল-মৃত্যুতে তাহার স্মরণার্থ শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে লিখিত।]

(১)
একি রে নিদয় বাণী! তুই নাকি ফুল-রাণী!
তেয়াগিয়া যাবি আজ মোদের এ কাননে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(২)
সত্য কিগো এই কথা? শেলসম বাজে ব্যথা—
না—না—না, ছলনা, বুঝি, করিস্ কি কারণে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৩)
বহুদিন দেখি নাই, দেখিবারে সাধ তাই,
তোর সেই ফুল-খেলা আবার এ নয়নে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৪)
সংসারের উপবনে, নবীন ঊষার সনে,
সাজো, মা! আবার অঙ্গ সেই ফুলাভরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৫)
মধুর-অধর-হাসি, প্রীতি-ফুল রাশি রাশি
ছড়া, মা, সে বন-পথে সেইরূপে যতনে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৬)
স্বরগ-অমিয়পারা তরল-রূপের ধারা
ঢালি' ভরা সেই বন, অয়ি চাঁদ বরণে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৭)
আনন্দে বিভোর হ'যে নাচি' করতালি দিয়ে
মাতা গো সে বনভূমি পুনঃ ধীর-কম্পনে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৮)
মধু-ভরা আধ-স্বরে, আবার আবেগ-ভরে,
গাও মা সে বন-গীতি—জুড়াই এ শ্রবণে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৯)
(কে,রে,কে! সাধিলি বাদ!) না মিটিতে এই সাধ
যায় সত্য কোথা, বালা! বুঝি গো তা কেমনে!
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১০)
আসেনি সাঁঝের বেলা, সাঙ্গ করি' এই খেলা
তবে কেন যাস্, মাগো! তরুণ ও জীবনে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১১)
যাবি যদি দেখ্ চেয়ে, ওই—ওই—আসে ধেয়ে!
বিষাদিনী,কে রমণী! জ্যোতি-হারা নয়নে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১২)
ছিল সে গো রাজ-রাণী, এবে হায়! কাঙ্গালিনী
দুঃখিনী জননী তোর পড়ে নাকি স্মরণে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১৩)
সে যে ভুলি' নিজ-সুখ নিজ-ব্যথা, নিজ-দুখ,

স্নেহের কোলেতে তোরে পেলেছিল যতনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৪)

তুই তার হৃদি-নিধি, তারে ছেড়ে যাস যদি
পাগলিনী হ'য়ে যে গো খুঁজিবে সে গহনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৫)

জানিনা কেমন প্রাণ ! কেমন সে শক্তিমান্ !
ছিঁড়ে যেতে চায় ওই মমতার বাঁধনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে !

(১৬)

একি ! একি! একি হ'ল !— নিমেষে কোথায় গেল
না শুনি', না শুনি', বালা ! এত যে আকিঞ্চনে ॥
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৭)

সাধের কানন হায় ! দেখ্ গো শুকায়ে যায় !
বন-দেবী ! বন-দেবী ! ওগো ! তোর বিহনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৮)

না গো না করিব মানা, মিছে মোর এ শোচনা,
দেবেন্দ্র-নন্দিনী সে যে ! গেছে দেবাবাহনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৯)

কত তাপ, কত জ্বালা, হয় ত গো দেব-বালা,
পেতেছিল—কে জানে তা ? এই মায়া-কেতনে
কোথায় চলিলি. মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২০)

কাঁদিল দেবেন্দ্র-হিয়া, তাই বুঝি আহ্বানিয়া
ল'য়ে গেল তনয়ারে স্বরগের কাননে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২১)

নাহি সেথা ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি !
নাহি শীত, নাহি গ্রীষ্ম, নাহি তাপ তপনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২২)

মিশে সেথা জল, স্থল, বায়ু, ব্যোম, কি অনল,
জগতের যত ভেদ, এক মহা-মিলনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর ভবনে ॥

(২৩)

নাহি স্বার্থ-মলিনতা, এ কঠিন কুটিলতা,
ভাসে সেথা সরলতা প্রেম-ভরা কিরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৪)

সংসারের কোলাহল ছোঁয় না সে স্বর্গ-তল
সকলি ঘুমায় যেন নীরবতা-শয়নে।
কোথায় চলিলি মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৫)

নাহি মৃত্যু-জরা-ক্লেশ, সীমাহীন সেই দেশ,
রচিত যেন বা সত্য ভাবময় স্বপনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৬)

নাহি মায়া-সুখ-খেলা, আছে নিত্যানন্দ-মেলা,
শান্তির হিল্লোল উঠে সুরভিত পবনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৭)

ত্রিদিব-সুষমা মাখি', পঞ্চমেতে গায় পাখী,
চির-বসন্তের প্রাতে মাতায়ে সে নন্দনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর ভবনে ॥

(২৮)

নিতি ফুটে কত ফুল, মিলি' দেবাঙ্গনাকুল
কুঞ্জে কুঞ্জে নাচি' যায় পারিজাত-চয়নে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৯)

তুই (ও) মা তাদের সাথে তুলি' ফুল সাজি হাতে
রচি' ভক্তি-মালা দিবি দেব-দেব-চরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(৩০)

থাক্ মা, থাক্ গো সেথা, আর না আসিস্ হেথা,
কি ছার ! এ দেশ ওগো ! সে দেশের তুলনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর ভবনে ॥

(৩১)

কোন্ দিন ? বল্ মোরে, মোরাও এম্নি ক'রে,
জীবনের সফলতা লভিব গো মরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর ভবনে ॥

শ্রীগদাধর সিংহ রায়।

পুরোহিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ অক্ষয়-তৃতীয়া, কই জমীদার-বাটীতে ত কেহ ডাকিল না? এবার শিরোমণি মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল। শিরোমণি মহাশয় সাত আট ঘর যজমান যাজন করিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করেন। এই মুষ্টিমেয় যজমান ঘরের মধ্যে প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ; কেবল একমাত্র জমীদার বাটীতেই ব্রত পার্ব্বণাদি বিশেষ রকমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং ইহাতেই কোনরূপে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আজ যদি জমীদার বাটীর পৌরহিত্য যায়, তাহা হইলে তাঁহার মনের ক্ষীণ আশা-দীপটীও এইখানে নিভিয়া যায়। শিরোমণি মহাশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন। একবার মনে করিলেন, হয় ত তাঁহার অনুপস্থিতিতে কেহ বাটীতে বলিয়া গিয়া থাকিবে। হায় আশা! বার বার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, তবু আশা ছাড়ে না। ভাবিলেন জমীদার বাটীতে যাইবেন; কিন্তু বিনা আহ্বানে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? আশা কাণে কাণে বলিল দোষ কি? বিশেষ তিনি যখন তাহাদের কুল-পুরোহিত। যাহার গৃহে অন্ন নাই, তাহার আবার মান-সম্ভ্রমই বা কি আর লোক-লজ্জাই বা কোথায়?

আজ জমীদর বাটীতে নূতন পুরোহিত আসন গ্রহণ করিয়া নব যুগের সূচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দেবেনের মা স্থিরনেত্রে নূতন পুরোহিতের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে সকলই যেন বে-বন্দোবস্ত। প্রত্যেক বৎসর যেমনটী হয় ঠিক যেন তেমনটী হইতেছে না। ঘটের উপর সিন্দুরের টিপগুলি যেন যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই। শিরোমণি মহাশয় কেমন সুন্দরভাবে সিন্দুরের টিপ্‌গুলি লাগাইতেন। কৈ নৈবিদ্যের উপর ফুল দেওয়া হয় নাই। শিরোমণি মহাশয়ের এসব কার্য্যে কখনও ত ত্রুটী হইত না। পুরোহিতের কার্য্যে দেবেনের মার তৃপ্তি হইতেছে না। তাঁহার মনে সকল কার্য্যেই খুঁৎ রহিয়া যাইতেছে। বিস্তৃত দালানের এক পার্শ্বে বসিয়া দেবেন ও নবীন ধূনা দিতেছে এবং মনোনিবেশ সহকারে পূজা দেখিতেছে। এমন সময় শিরোমণি মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদন বিষণ্ণ—সকরুণ কাতর দৃষ্টিতে তিনি দেবেনের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত করুণ, কত বেদনা পীড়িত। সে দৃষ্টির দিকে দেবেন চাহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া লইল। সে দৃষ্টি দেবেনের মাব মর্ম্মস্থল ভেদ করিল, তিনি বিচলিত হইলেন। শিরোমণি দেখিলেন—তাঁহার সকল আশা ভরসা এইখানেই শেষ। তিনি তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস আর সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না কহিলেন,—"দেবেন" কি করুণ স্বর! দেবেন চমকিয়া উঠিল। শিরোমণি মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন, এ গরীব ব্রাহ্মণ তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে, যে আজ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ। শুধু তার মুখের গ্রাস নয়, তার স্ত্রী-কন্যাও সেই সঙ্গে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করতে বসেছে। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাস

কেড়ে লওয়াই কি তোমাদের ব্রত! সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, কাহারও মুখে কথা নাই,—নীরব। শিরোমণি মহাশয় ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি কোথায় যাইবেন, তাহা তিনি জানেন না; লক্ষ্যহীন-ভাবে পথে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল গ্রামের সকলেই যেন তাঁহার দুঃখে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, সকলেই যেন তাঁহাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে একে একে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পথিমধ্যে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি কাহারও বা প্রশ্নের জবাব দিলেন, কাহারও উত্তর দিলেন না, নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আবার কেহ বা প্রশ্ন করিল না,—তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। শিরোমণি সে চাহনিতেও উপহাস দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল জগৎ নিষ্ঠুর, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন কেহ নাই। তিনি ভাবিলেন গৃহে যখন অন্ন নাই, অন্ন সংস্থানেরও তিনি যখন উপায়-হীন তখন তাঁহার পক্ষে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাওয়া বিড়ম্বনা; বরং অন্য জমীদারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটা বিহিত করাই কর্ত্তব্য। উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাহানা-বাদের পথ ধরিলেন। গৃহ হইতে জীর্ণ ছত্রটী লইতেও তাঁহার বিলম্ব সহিল না।

(৪)

শিরোমণি মহাশয়ের কথাগুলি দেবেনের মার অন্তস্থল ভেদ করিয়া মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়াছে। তিনি নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন;—কেন তিনি ছেলেদের প্রথায় পুরোহিত ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, এ দোষ ত তাঁহারই। তিনি যে ব্রত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই উপাখ্যানটী তাঁহার মনে বাড়িল। এক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের পত্নী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কোনও তৃষ্ণাতুর ব্রাহ্মণকে জল দান করায়, তিথি-মাহাত্ম্যে তাঁহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছিল এবং তিনি ও তাঁহার স্বামী বিষ্ণুর প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। ব্রতকথা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, দেবেনের মার মনের মধ্যে কি একটা ভাব তড়িত প্রবাহের মত সঞ্চারিত হইয়া হৃদয় স্পন্দিত হইল। অজ্ঞাত ব্যাধির ন্যায় তাঁহার বেদনা-পীড়িত অন্তর বিদীর্ণ হইয়া সহসা নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্রাহ্মণকে সামান্য জলদান করায় এত পুণ্য, সেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তিনি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের,—বিশেষতঃ কুলপুরোহিতের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছেন। দেবতারা নিশ্চয়ই তাঁহার অন্যায় আচরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার ব্রত পণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; পুরোহিতের অনুসন্ধানে ধাবিত হইলেন।

বালক যেমন কুকর্ম্ম করিলে অভিভাবকের নিকটে আত্ম গোপন করিতে চেষ্টা করে, নবীন ও দেবেন সেইরূপ লজ্জায় মার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইতেছে না, দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের কার্য্যের ফল যে এরূপ অপ্রীতিকর হইবে, ইহা তাহারা কখনও স্বপ্নেও আশা করে নাই। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তাহাদের কখনও ইচ্ছা ছিল না; ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মূর্খ ভট্টাচার্য্যগণের হস্ত হইতে পৌরহিত্যভার কাড়িয়া লইতে গেলে, তাহাদের যে মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইবে, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকে অনশনে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে, একথাটা তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও ভাবে নাই। এখন তাহারা তাহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত; ইহার প্রতি-বিধানের জন্য চিন্তিত। নবীন কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে কিন্তু দেবেন কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতেছে না। দেবেনের শয়নকক্ষে বসিয়া দুই বন্ধুতে জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, এমন সময় সহসা দেবেনের মা তথায় আসিয়া উপস্থিত; ডাকিলেন,— "দেবেন"।

"কেন মা"

"কাজটা কি ভাল হ'ল? যাও এখনই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে এস।"

"তাঁর দেখা পাচ্চি না, মা। সেই সকালে যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, আর ফেরেন নি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠাচ্চি, আমরা নিজেরাও ২ | ৩বার গেছি, কিন্তু দেখা পাই নি।"

"সন্ধ্যা হয়ে এলো এখনও তিনি বাড়ী ফেরেন নি! তাঁর খোঁজ করবার কি বন্দোবস্ত করেছ?"

"চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি।"

"বল তা হলেই কর্ত্তব্য হয়ে গেল। না, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না; যা করবার আমিই করছি। তোমরা কেন যে লেখাপড়া শিখেছিলে তা বুঝতে পারছি না।"

(৫)

আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল, শিরোমণি মহাশয়ের দেখা নাই। দেবেন সংবাদ-পত্রাদিতে উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও যখন শিরোমণি মহাশয়ের কোনও উদ্দেশ পাইল না, তখন স্বয়ং একবার অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার জন্য নবীনের নিকট প্রস্তাব করিল। নবীন বলিল,—"আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াই ত নিশ্চিন্ত হই নাই, উপযুক্ত লোক বাছাই করে চারিদিকে পাঠিয়েছি। এক্ষেত্রে তুমি নিজে গিয়ে আর বেশী কি করবে।"

দেবেন বিরক্ত হইয়া কহিল,—"এ তর্কের কথা নয় নবীন, মা যে প্রাণে কতটা ব্যথা পেয়েছেন তা বুঝছ না।"

"বুঝছি সব কিন্তু—" নবীন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেওয়ান যদুনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন. কহিলেন,—"বাচস্পতি মহাশয় বাহিরে অপেক্ষা করছেন, টোল সম্বন্ধে কি কথা বল্‌তে চান।"

দেবেন।—আর টোলে কাজ নেই কাকা, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন একে একে টোলগুলি তুলে দিবার চেষ্টা করুণ।

যদু।—অধীর হয়ো না বাবা, অধীর হ'লে কি কোন কাজ হয়। তোমরা যা করছ

তাতে এক সময়ে দেশের একটা মহৎ উপকারই সাধন হবে। তবে এখন যাঁরা পুরোহিতের কাজ কর্‌ছেন, তাঁদের সেই কাজ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়াটাই তোমাদের ভুল হচ্ছে। কুলধর্ম্মও ত একটা ধর্ম্ম। তোমরা ত সব বোঝ বাবা। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও কুলাচারের উপর আর কোনও বিধান খাটে না বলে গিয়েছেন। নবীন বলিল,—"আজ্ঞে সে কথাটার মানে আলাদা। তবে অজ্ঞ পুরোহিতগুলিকে তাঁদের কাজ থেকে অবসর দেবার আগে একটা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল। সেইখানেই হচ্ছে আমাদের ভুল।

এত কথা কাটাকাটি দেবেনের ভাল লাগিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল "যা কর্‌বার হয় আপনি করুন কাকা, আমি আর কিছুতেই হাত দিচ্ছি না।" অগত্যা দেওয়ান চলিয়া গেলেন।

আজ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্য করিয়া জমীদার-গৃহিণী শিরোমণি মহাশয়ের কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রী শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, জীবনের সুখ দুঃখ যা কিছু সবই বরাতে করে। তাহা না হইলে আজ জমীদার-গৃহিণী তাহাদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন, কিছুদিন আগে তিনি যদি ইহার কণামাত্রও করিতেন, তাহা হইলে ত তাহার এ সুখের সংসার এরূপে ছিন্ন হইয়া যাইত না। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, চিন্তাস্রোত ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

জমীদার-গৃহিণীর খাস দাসী ভোলার মা এখন শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। ভোলার মা কহিল "বসে বসে ভেবে আর কি হবে মা, চল রান্না চড়াও।"

"না ভোলার মা আমার আজ ক্ষিদে নেই" এমন সময় দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। ভোলার মা দ্বার খুলিয়া দিয়াই অবাক; বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল "দাদা ঠাকুর!"

শিরোমণি মহাশয় অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীকে গৃহাগত দেখিয়া শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রী কি একটা ভাবে জড়ীভূতা হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। আনন্দোচ্ছ্বাস অশ্রুরূপে প্রকাশ পাইয়া কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া দিল; শত চেষ্টাতেও তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, অনিমেষ লোচনে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের বস্ত্র জীর্ণ মলিন, কেশগুলি রুক্ষ, মুখখানি শুকাইয়া পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় উন্মাদ। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ সাশ্রুনয়নে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "জাহানাবাদের জমীদারীতে ১০৲ টাকা মাহিনার একটী চাকরী জোগাড় করেছি, আনির বেরও কতকটা ঠিক করে এসেছি। এখন গুছিয়ে লও, আজই জাহানাবাদ রওনা হই।"

শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রী কি জবাব দিবেন ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আনি কোথায়?"

"জমীদার-বাটীতে।"

"সেখানে কেন?"

"আজ গিন্নি মা নিয়ে গেছেন।"

"তবে আমি এখনই তাকে নিয়ে আসি।" শিরোমণি মহাশয় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জমিদার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

জমীদার-গৃহিণী সবে মাত্র সান্ধ্য আহ্নিক সমাপন করিয়া প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় সম্মুখে শিরোমণি মহাশয়। এরূপ আকস্মিক শিরোমণির আবির্ভাবে জমীদার-গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি সহসা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না; গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা নিমেষ মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। যদুনাথ,

দেবেন, নবীন প্রভৃতি সকলে একে একে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথমে শিরোমণি মহাশয় কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আনি এখানে আছে?"

জমীদার-গৃহিণী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, সে উপরে পান সাজছে।"

শিরো।—"তাকে ডেকে দিন, আজই আমি বাড়ী-ঘরের মায়া কাটিয়ে সকলকে নিয়ে জাহানাবাদে যাব মনে করেছি।"

জমীদার গৃহিণী।—"আমি বেঁচে থাকৃতে তা হ'তে পারে না। আমি এতদিন কেবল ছেলেদের বিদ্যার দৌড়টা দেখছিলুম। দেবেন লেখাপড়া শিখলে কি হয়, সে এখনও ছেলে মানুষ। তার উপর কি অভিমান করা আপনার সাজে?"

শিরো।—"অভিমান! অভিমান কিসের? দায়ে পড়ে যে আমায় সবই কর্ত্তে হচ্চে।"

জমীদার গৃ।—"দায় কিসের? আনিকে আমি বাড়ীতে এনেছি, তাকে আমি ঘরেই রাখতে চাই। আমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, এটাও সহ্য করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শাশ্বত রূপ।

শাশ্বত যাঁর রূপের মাধুরী
শাশ্বত যাঁর জীবন-দীপ,
সবার মাঝারে যাঁরে পাওয়া যায়
তাঁহারে চাহিয়া দেখে না জীব॥
পদ্মের মাঝে গন্ধ রূপেতে
যাঁর রূপ-বাস বদ্ধ
ফাল্গুন বায় মৃদু মৃদু বয়
তাঁহারি মধুর ছন্দ॥
কুসুমের মাঝে নানারূপে রাজে
প্রতি পাপড়ির গাত্রে,
তাঁরি শাশ্বত মহান দেহটী,
প্রকাশে দিবস রাত্রে॥
নিশিথ হিমানী দিবস রৌদ্র
প্রভাতে নীহার-কণা,
সে যে তাঁরি রূপ—তাঁরি রূপ সে যে
জানে কি এক জনা॥
কোকিলের সেই পঞ্চম রাগ
জাহ্নবী-স্রোত ধ্বনি
শিশু অধরের আধ আধ স্বর
সেও তাঁরি বাণী গণি।
বিরহীর সেই হৃদয়ের মণি
যামিনী মাঝারে চন্দ্র।
নব প্রস্ফুটীত প্রভাতি ফুলের,
মনোজ্ঞ মোহন গন্ধ॥
প্রভাত-মিহিরে শোণিত-ঝলক,
হৃদয় রক্ত তাঁর;
সকলের মাঝে শাশ্বত রূপে
বিরাজে তাঁহারি সার॥
মরুভূমে তিনি তপ্ত বালুকা
সাগরে লবণ জল,
পর্ব্বত মাঝে বিদারিয়া তিনি
ঝোড়া রূপে নিরমল॥
দেহীর শরীরে রক্তমাংস,
কণ্ঠের তিনি শব্দ,
কাম, ক্রোধ, ভয়, ষড়রিপু আদি
তাঁহারি হৃদয় লব্ধ॥
শরতের মাঝে ছড়া ছড়া মেঘ,
মাঠ ভরা সব শস্য
সে যে তাঁরি ওগো মূরতি শুধুই
নহে কিছু আর অন্য॥
আলোক আঁধারে উষায় সাঁঝেতে
তাঁহারি মূরতি রাজে।
এত দেখে নর শিখিল না কিছু
শির নিচু হয় লাজে॥

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ।

ESTABLISHED 1898.

একবিংশ বর্ষ। মাঘ ১৩২৪। [১০ম সংখ্যা।

হিন্দু সমাজের মুখপত্র।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১॥০ টাকা।

1918.

হাওড়া, ৯ নং ফেলকম ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগল কৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩২৪ সাল।

বাঁধনের দায়।

---

(১)

খুলে দে বাঁধন আজ,
ছুটে যাই কেঁদে আসি।
বহিতে পারি না আর,
এ মায়া মমতা রাশি॥

(২)

একি ভয়! একি ভুল!
একি মিছে হাসা কাঁদা?
ফিরিতে পারি না পাশ,
অযুত বাঁধনে বাঁধা।

(৩)

সকলি ফুরায়ে যায়,
আকাশ-কুসুম আশ।
কেবলি দুরাশা ঘোরে,
ছুটা ছুটি বারো মাস॥

(৪)

শুনিতে চাহি না আর,
গরবের গরজন।
প্রবোধ নাহিক মানে,
আকুলিত প্রাণ-মন॥

(৫)

প্রলয় আঁধারে আজ,
ডুবে যাও শত কাজ।
যে যাহার ব্যবহার,
যেথা সেথা পড়ে থা'ক॥

(৬)

চাহি না তোমারে আজ,
সোহাগের তৃণ-বাস।
বিশ্বগ্রাসি' হুতাশন,
ছাড়ুক অনল শ্বাস॥

(৭)

সংসারের কোলাহল,
সহিতে পারি না আর।
অবসাদ জাগিয়াছে,
শিথিল জীবন ভার॥

(৮)

কত দিন আঁখি জলে
ভেসে গেছে বুকখানি॥
এথা যে সান্ত্বনা নাই,
মনে মনে অনুমানি'॥

(৯)

পথ ভুলি' আনমনে,
পথিকের যেন লাজ।
ছেড়ে যায় সেথা তার,
থাকিলেও শত কাজ॥

(১০)

তেমতি আমায় আজ,
যেতে দাও সব ভুলি।
অতীত এ পথিকের,
এথাকার দিনগুলি॥

(১১)

বুঝি ঐ যায় ভেসে,
ইঙ্গিতে অয়ন পথ।
থাকিতে পারি না আর,
জড় পুত্তলিকাবৎ॥

(১২)

আশা বা দুরাশা মোর
বুঝিতে সময় নাই।
ছেড়ে দেরে আজ আমি
একটানে চলে যাই॥

(১৩)

ওই শোন ঝঞ্ঝাবাহী,
শুনাইছে কল-গান।
সুদূর আকাশ ভেদি'
উঠিল কি মহা তান॥

(১৪)

ডাকিছে মধুর সুরে,
পাপী-তাপী আয় আয়।
বাঁধনে—বিষম দায়!
ঘটা'ল প্রমাদ হায়!!

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এল, এম, এস।

সমাজ কি? *

সমাজের আধ্যাত্মিক বা নৈতিক ভিত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একটা জগৎ-জোড়া শক্তির (Energy) আভাষ না হয় জগতের সর্ব্বত্রই পাওয়া গেল কিন্তু এ শক্তির স্বভাব (nature) সম্বন্ধে আমরা কতদূর অবগত হই? অর্থাৎ উহা কি চিৎ না অচিৎ—সচেতন (conscious) না অচেতন (unconscious)?

আমরা যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয়—যেন জগৎ দ্বিধা হইয়া রহিয়াছে, কিংবা, আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে, জগৎ একটী নহে দুইটী। একটী মনোজগৎ (Microcosm) অপরটী জড়জগৎ (Macrocosm)। আপাততঃ না হয় ধরিয়াই লওয়া যাউক যে যাহা দেখিতেছি তাহাই সত্য—জগৎ একটী নহে দুইটী। তাহা হইলে এইবার দেখা যাক যে তাহাদিগের অন্তরস্থ শক্তির যে পরিচয় পাই তাহার ধর্ম্ম কি।

* সমাজ কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আমি সৃষ্টি-তত্ত্ব, মানব-তত্ত্ব ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ কথার অবতারণা করিয়া ফেলিলাম এবং কতকাংশে তাহাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ইহা যেন অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনেকের কাছে প্রতিপন্ন হইতে পারে। অবশ্য আমার মত নবীন লেখকের সে ত্রুটী তাঁহাদিগের মার্জ্জনীয়। তত্রাচ একটা কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করি যে "আলোচনার" সাধারণ পাঠকবর্গকে সমাজের ভিত্তিটী প্রথম ভালরূপে বুঝাইতে না পারিলে সমাজ জিনিষটা কি বুঝান কঠিন হইয়া উঠিবে। আবার বর্ত্তমান যুগে যে স্বাধীন চিন্তার ধারা বহিতেছে, তাহাতে একেবারে অবিচারে কেহ কোন সত্য লইতে রাজী নহেন, পূর্ব্ব-প্রকাশিত-অংশে এই প্রবন্ধের যে দোষ ছিল এবার তাহা পরিবর্জ্জিত হইল।

প্রথমে মনোজগতের শক্তি। হয়ত কেহ কেহ ঘোর জড়-বাদিত্বের মলিন চশমা পরিয়া এই শক্তির চিদ্ভাব বা চিন্ময়তা (consciousness) নাও দেখিতে পারেন সুতরাং তাহাদিগের নির্ম্মল দৃষ্টির জন্য একটী কথা বলা আবশ্যক। চিন্ময়তাকে আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাই না কারণ উহা গুণ (quality) অতএব উহা অব্যক্ত (abstract)। তবে উহাকে কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়? ব্যক্ত অভিব্যক্তির (concrete expression) দ্বারা। সেই ব্যক্ত অভিব্যক্তিটী (concrete expression) উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্য্য (purposive action) ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থাৎ, যে কার্য্যের মধ্যে একটী উদ্দেশ্য (purpose) দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই কার্য্যের কারণ-স্বরূপ যে ব্যক্তি, তাহাকে চিন্ময় বা চেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কেন না অচেতন (unconscious) শক্তির উদ্দেশ্যপূর্ণ (purposive) কার্য্য বন্ধ্যা নারীর পুত্রের মত অসম্ভব। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মনোজগতের মধ্যে যে অনন্ত কার্য্যপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কি উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না? যে মন একদিন দূর-হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বরে বসিয়া মহাসত্যের অন্বেষণে ত্রিভুবন আলোড়ন করিয়াছিল—যে মন একদিন পুণ্যভূমি ভারতের মনোহর তপোবন স্বর্গীয় সামগানের মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিয়াছিল, যে মন একদিন বীরদর্পে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার একমাত্র অধীশ্বর হইবার কামনায় সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে বিজয়-ঝঙ্কারে কম্পিত করিয়াছিল—যে মন একদিন মানব-জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিবার মানসে রামায়ণ, মহাভারত, মাঘ, নৈষধ, উত্তর-রামচরিত, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, ইলিয়াড্ (Illiad), ওডিসী (Odyssey) হ্যাম্লেট্ (Hamlet), ওথেলো (Othelo) প্রভৃতি কত শত রত্ন-গ্রন্থ প্রসব করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল—যে মন একদিন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই প্রকাণ্ড সৌরজগতের ছবি মানব-সমাজের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল—যে মন এই বর্ত্তমান মহাসমরে স্বার্থের দাবানল জ্বালাইয়া সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে পুড়াইতে উদ্যত হইয়াছে—সেই মনকে অন্ধ উদ্দেশ্যহীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে কোন্ সাহসী সাহস করিতে পারেন তাহা বলিতে পারি না, আমাদের ত সাহসে কুলায় না। অতএব এই মনোজগতের অসীম কার্য্যাবলীর কেন্দ্রীভূত যে শক্তি তাহাকে চিন্ময় না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এইবার জড়জগতের শক্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যদি কার্য্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য পাওয়া যায় তবেই সেই কার্য্যের কারণ-স্বরূপ শক্তিকে চিন্ময় বলা যাইবে, নচেৎ নয়। এখন এই জড় জগতের কার্য্যের মধ্যে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি? হাঁ পাওয়া যায়। জড়বিজ্ঞান (Physics) উচ্চৈঃস্বরে প্রতিমুহূর্ত্ত সেই কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যখন সে তাপ (Heat) ও আলো (Light) সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান (Laws) * দেখায় তখন কি সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া

* অবশ্য জড়-বিজ্ঞানে শুধু যে তাপ ও আলো সম্বন্ধেই

বলে না,—"হে মানব! চাহিয়া দেখ, ঐ তাপ ও ঐ আলো কেবল মাত্র এক অন্ধ ভৌতিক শক্তির বিশৃঙ্খল কার্য্য নহে—উহাদের মধ্যেও এক শৃঙ্খলতা আছে—এক নিয়ম আছে।" যদি কার্য্যের মধ্যে উদ্দেশ্য না থাকিত তবে কার্য্যপরম্পরার মধ্যে ঐ নিয়ম-শৃঙ্খল আসে কোথা হইতে? উদ্দেশ্য-হীন কার্য্যের নিয়ম থাকা অসম্ভব। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে জড় জগতের কার্য্য-ধারার মধ্যে এক নিয়ম আছে, আর যেহেতু এক নিয়ম আছে, অতএব এক উদ্দেশ্যও আছে এবং যেহেতু এক উদ্দেশ্য আছে অতএব ঐ জগতান্তর্গত শক্তির এক চৈতন্যও আছে। §

তবু যেন এখনও আমাদিগের মন জড়-শক্তির চিন্ময়তা স্বীকার করিতে চায় না। ইহার কারণ কি? ইতঃপূর্ব্বে মনোজগৎ ও জড়-জগতের যে দ্বৈতভাবের বা ভেদজ্ঞানের কথা বলিয়াছি—তাহাই ইহার কারণ। আমরা কল্পনা করিয়া থাকি যেন মনোজগৎ ও জড়-জগৎ দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য, আর তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিদ্বয় দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন রাণী। দুই জনের মধ্যে গঠন-গুণের এত প্রভেদ এবং ব্যবধানও এতদূর যে পরস্পর পরস্পরকে আদৌ চেনে না এবং চিনিতেও পারে না। এক একটী আপনার স্বতন্ত্র কার্য্য-স্রোতের মধ্যে আপনি ভাসিয়া চলিয়াছে। যদি কখনও পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, তবে সে শত্রুতার বেশে—মিত্রতার বেশে নয়। সুতরাং এতই যখন পার্থক্য তখন যদি মনোজগতের রাণী চিন্ময়ী হয়, তবে জড়-জগতের রাণী চিন্ময়ী হইতে পারে কিরূপে? ইহা আমাদিগের চরম দ্বৈতের (Absolute duality) কল্পনা কিন্তু, বাস্তবিক কি তাই? না—তাহা নহে। এই যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পরিদৃশ্যমান চরাচর (World of experience), যাহাকে লইয়া আমরা সারা জীবন ধরিয়া অহোরাত্র 'কারবার' করিতেছি, ইহার জন্ম হইল কি প্রকারে? কিরূপে আজ ঐ প্রচণ্ডতেজোপুঞ্জ সূর্য্যকে সূর্য্য—ঐ অতলজলগর্ভ সমুদ্রকে সমুদ্র—ঐ অনন্ত প্রসারী নভোমণ্ডলকে নভো-মণ্ডল বলিতে সমর্থ হইতেছি? সে কেবল ঐ দুইটী শক্তির সম্মিলন-ফলে। মনে করুন জড়জগৎ ও তাহার শক্তি আছে কিন্তু মনো-জগৎ ও তাহার শক্তি নাই (অর্থাৎ আপনার বা আমার বা অন্য কাহারও একটীও 'মন' নাই) কিংবা মনোজগৎ ও তাহার শক্তি আছে কিন্তু জড়-জগৎ ও তাহার শক্তি নাই, তাহা হইলে ঐ সূর্য্য—ঐ সমুদ্র—ঐ নভোমণ্ডলের অস্তিত্ব কি সম্ভব হইত? কখনই না। এই দুই শক্তির সম্মিলনকেই লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের শাস্ত্র-কারগণ তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়" (পাশ্চাত্ত্য) দর্শনের কথায় ("Knower and known") বা ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র" সম্বন্ধ নিরূপন করিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা শুধু আমার কথা নহে, বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের

কতকগুলি বিধান আছে—তাহা নহে। এখানে কেবলমাত্র ঐ দুই চার কথাই বলা হইল।

§ বাস্তবিক পক্ষে অচেতন জগৎ বলিয়া কোন জগৎ আছে কিনা সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানরাজ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

(Psychology) গবেষণার একটী শ্রেষ্ঠ ফল। বেন্ (Cr. Bain) বলেন,—"We are incapble ever of discussing the existence of an independent material world: the every act is a contradiction We can speak only of a world presented to our own minds"

("Senses and Intellect—P. 329)

অর্থাৎ—"একটী স্বাধীন জড়-জগতের অস্তিত্বের কথা আলোচনা করিতেও আমরা অক্ষম; ঐ কাজটাই একটী বিরোধ বা বৈপরিত্য। আমরা কেবল মাত্র আমাদিগের মনের সম্মুখে উপস্থিত (অর্থাৎ, মনের সহিত সম্মিলিত) জগতের কথাই বলিতে বা আলোচনা করিতে পারি।"

James Word (জেম্‌স্ ওয়ার্ড)ও বলেন—"What a subject without objects, or what object without subject, would be, is indeed unknowable; for in the truth the knowledge of either apart is a contradiction"

(Naturalism and Agnosticism, Vol. II. P. 112) *

অর্থাৎ,—"জড় পদার্থ ব্যতীত মন বা মন ব্যতীত জড়পদার্থ কি হইতে পারে—ইহা বাস্তবিকই অজ্ঞেয়; কারণ, উভয়ের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকের জ্ঞান সত্য সত্যই একটী বিরোধ।"

ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্যও বলিতেছেন,—"অনুভাব্য (জড়পদার্থ) ব্যতীত অনুভূতি থাকিতে পারে না।—

[বেদান্তের ১ম অঃ। ১ম পাঃ। ১ম সূত্র—"শারীরিক মীমাংসাভাষ্য"]

অতএব যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ঐ দুই রাজ্যের রাণী যদিও বিভিন্ন বটে তবে একেবারে বিভিন্ন নয়, তাহাদিগের চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও চির-মিলন আছে—চির দ্বন্দ্বের মধ্যেও চির-সন্ধি আছে এবং এমন কি তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তই এক বিপুল প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সখিভাবে পরস্পর পরস্পরকে আকুল-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ একই লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন কি আমরা বলিতে পারি যে ঐ দুয়ের মধ্যে একটী শুধু চেতন, একটী শুধু অচেতন—একটী শুধু কাঞ্চন, একটী শুধু মৃত্তিকা—একটী শুধু আলোক, একটী শুধু অন্ধকার? এরূপ ঐকান্তিক বৈষম্যধর্ম্ম (qualitative difference) থাকিলে কি তাহাদিগের মধ্যে কখনও কোনও যুগে ঐরূপ মহামিলনের সম্ভাবনা থাকিত? কিছুতেই না। সুতরাং উভয়েই চৈতন্যময়—উভয়েই এক অনন্ত শক্তির দুইটি বিভাগ (aspect) মাত্র।

এইবার জিজ্ঞাসা করি এই যে, এক দ্বৈতাদ্বৈতভাব (*unity-in-duality*) (১)—সম্পন্ন চিন্ময় শক্তির চিরন্তন বিকাশ কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় ইহার কি কোন আধার নাই? আধার ব্যতীত ইহা কি থাকিতে পারে? পারে না? যেমন এই স্থূল প্রাকৃতিক জগতে এক উজ্জ্বল তরল কিরণ-জালে বিশ্ব-চরাচরের যাবতীয় পদার্থকেই মাত দেখিতে পাইয়া মানব-মন

* এই গ্রন্থখানি খুব আধুনিক।

স্বতঃই ঐ যে এক দীপ্তিমান সূর্য্য আকাশের এক প্রান্তে জ্বলিতেছে, উহাকেই তাহার আধারস্বরূপ জ্ঞান না করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগতে ঐ এক জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির অসীম স্ফুরণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইয়া এক চির-চিন্ময় চির-ভাস্বর অধ্যাত্ম-ভাস্করকে উহার আধাররূপে ধারণা না করিয়া মানব-মন থাকিতে পারে না; কেন না আধার আধেয় সম্বন্ধ মানব-চিন্তার একটী মূল নীতি (fundamental principle)। এই অধ্যাত্ম-ভাস্করকেই আমরা সেই অনন্ত-শক্তিমান মহাপুরুষ বা পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারি।

তাহা হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় এত দূর যাহা বলা হইল সংক্ষেপে তাহার পুনরুক্তি করিলে এই দাঁড়ায়। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করি যে ঘড়ি-নির্ম্মাতা যেমন ঘড়ির বাহিরে অধিষ্ঠিত সেইরূপ জগৎ নির্ম্মাতাও জগতের বাহিরে অধিষ্ঠিত—তাহা ভুল। জগৎ-নির্ম্মাতা জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই আছেন! এ সত্যটী প্রথমতঃ "আপ্তবচনের" ভূমি হইতে দেখা হইল, পশ্চাৎ বিজ্ঞানসম্মত একটী যুক্তির ভূমি হইতে দেখা হইল। সে যুক্তিটী এই যে, এই সৃজ্যমান জগতের কুত্রাপি কোনও বস্তু শক্তিশূন্য নহে, যেখানে সেই শক্তি সেইখানেই তাহাকে চিন্ময়ী ধরিতে হইবে, সেই বিরাট চিন্ময়ী শক্তির একটী অনন্ত চিন্ময় আধার আছে, আর সেই আধারই পরব্রহ্ম, অতএব যেখানেই শক্তি সেইখানেই পরব্রহ্মের বিলাস (manifestation) বুঝিতে হইবে; সুতরাং জগতের সর্ব্বত্রই তিনি পরিব্যাপ্ত আছেন।

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের পরিব্যাপ্তিটুকু বলিলেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সব কথা বলা হইল না। ইহার আর একটি ধার আছে। সেটীও জানা আবশ্যক, যেহেতু পরে তাহার প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি আমাদিগের এই বিশ্ব-চরাচরের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই আছেন বলিয়া তাহাতেই নিঃশেষিত হইয়া যান নাই। তিনি অনন্ত ও অসীম; সুতরাং এই একটী মাত্র বিশ্বের মধ্য দিয়া তাঁহার সেই অনন্ত ও অসীম সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। কে বলিতে পারে এখনও কত বিশ্ব, কত গ্রহ-নক্ষত্র, কত সৌর জগৎ বর্ত্তমান আছে। অতএব তিনি যে মুহূর্ত্তে আমাদিগের এই বিশ্বের অধীন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি এই বিশ্বের অতীত (Transcendent)। পূর্ণব্রহ্ম বলিলে শুধু আমাদিগের এই বিশ্বের আত্মাকে বুঝায় না, যিনি সেই অসংখ্য বিশ্বের আত্মা তাঁহাকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণরূপী পূর্ণব্রহ্ম ভগবানই স্বয়ং তাঁহার এই বিশ্বাতীত ভাব (Transcendental aspect) বুঝাইবার জন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসি॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১১ অঃ। ৭ শ্লোক।

অর্থাৎ,—

"হে গুড়াকেশ! (অর্জ্জুন!) এই আমার দেহে একাংশমাত্র স্থাবরজঙ্গম সহিত সমস্ত জগৎ—অদ্য দেখিয়া লও; এবং আরও যদি

কিছু দেখিবার থাকে তাহাও দেখিয়া লও।”

এইবার আমাদিগের দ্বিতীয় প্রশ্ন—মানুষ কি? বা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি? ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম, এ, বি, এল।

সই।

(গল্প)

(১)

একটু বৃষ্টি হইলে প্রায় সমস্ত বাটীর সম্মুখে জল জমে, রাস্তায় এক হাটু কাদা হয়, একদিন বৃষ্টি হইলে এক সপ্তাহ জুতা চলে না। গ্রামের নাম পাহাড়পুর; এমন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পুষ্করিণীর ধারে তাল-বৃক্ষের নাম গন্ধ না থাকিলেও, পুকুরের নাম “তালপুকুর”, গ্রামের মধ্যে রাজার নাম গন্ধ না থাকিলেও গ্রামের নাম “রাজাপুর”। আমাদের পাহাড়-পুরের শত ক্রোশের মধ্যে পাহাড়ের চিহ্নমাত্র না থাকিলেও ইহার নাম পাহাড়পুর। গ্রামটী ক্ষুদ্র, কাজেই গ্রামবাসীর সংখ্যাও যে ক্ষুদ্র হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এক সময়ে এই ক্ষুদ্র গ্রামের শ্রীছাঁদ যে ভালই ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রামের ছোট বড় সকলেই এক সময়ে পরস্পর সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; একের বিপদে অপরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে দেখা যাইত। এখন আর সেদিন নাই, সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই। এখন গ্রামের অধিকাংশ লোক নিঃস্ব, স্ব স্ব অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির।

(২)

গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঁড়ুজ্যে বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত; বৎসরান্তে গ্রামের ছোট বড় সকলে পূজার সময় তাঁহার বাটীতে কয়েকদিন পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। কিন্তু তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল বলিয়া ক্রমশঃ তাহাকে ঋণ-গ্রস্ত হইতে হইল, কিন্তু চাল-চলনের কিছুই কমিল না। অনেক বড় লোকের ঘরে দেখা যায় যে, যখন তাহাদের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহারা সেই মলিনতা ঢাকিবার জন্য পূর্ব্বের চালচলন বজায় রাখিতে গিয়া, অধিকতর দায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন। গোপী-নাথের একমাত্র পুত্র হরিনাথের বিবাহের পর, তিনি যে পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, ততদিন সমান ভাবেই সমস্ত খরচ পত্র চলিয়া গেল; হরিনাথ উপযুক্ত হইলও কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন না, বড় মানুষের ছেলেরা যাহা করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিয়া দিন কাটাইয়াছেন; এবং বোধ হয় ভাবিতেন চির-দিন একভাবেই কাটিবে। তারপর একদিন গোপীনাথের উপর হইতে তলপ হইল; তিনি সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন, পুত্র, পুত্র-বধূ ও একমাত্র সোহাগের আদরিণী পৌত্রী সুমতী কেহই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। দুই দিন যাইতে না যাইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল, গোপীনাথ দেনায় ডুবিয়া বহু কষ্টে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। হরি-নাথ এতকাল বড় আনন্দেই কাটাইয়াছিলেন,

কিন্তু তিনি যে পর্ব্বতের পশ্চাতে ছিলেন, সে পর্ব্বত সুরিতেই চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিলেন; পাওনাদার, মহাজন, দোকানদার ও জমিদারের লোকে তাঁহার বাড়ী প্রায় সদর রাস্তায় পরিণত করিল। পিতৃশোক অপেক্ষা পাওনাদারের নির্ম্মম তাগাদা তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত করিতে লাগিল। গ্রামের লোকের মধ্যে এক মাত্র হারাণ ঘোষ সকল বিষয়ে তাহার সাহায্য করিতে লাগিলেন, আর তাহার যুক্তিমত তিনি মাত্র পৈত্রিক ভদ্রাসন ও সামান্য একটী জোত রাখিয়া, বাকী সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। অবস্থা শোচনীয় হইলেও পূর্ব্ব নাম-ডাকের খাতিরে পিতৃশ্রাদ্ধ তাঁহাকে ভাল করিয়াই করিতে হইল, এবং এই ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার স্ত্রীর ও কন্যার সমস্ত অলঙ্কারগুলি একে একে বিক্রয় করিতে হইল, রহিল মাত্র ঐ সামান্য জোতটী, ইহারই আয় তাহার একমাত্র ভরসা ও শেষ সম্বল।

(৩)

গোয়ালা হারাণ ঘোষ হরিনাথের প্রতিবেশী, হারাণ ঘোষের এবং হরিনাথের বাটীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটী ছোট পুষ্করিণী। দুইটী গৃহস্থের মধ্যে বরাবর বেশ সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছে। মুখুজ্যে বাড়ীর মধ্যে বাল্যকাল হইতে হারাণ চন্দ্রের অবাধ গতি! কর্ত্তা গোপীনাথ হারাণকে নাতি সম্বোধন করিতেন এবং সেই হিসাবে হারাণচন্দ্র হরিনাথকে বাবাঠাকুর বলিয়া ডাকিতেন। হরিনাথের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন হারাণচন্দ্রের সাদা প্রাণে বড়ই দাগ দিয়াছিল। কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর শ্রীছাঁদ যে এভাবে চলিয়া যাইবে, হারাণ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, তাহার ধারণা ছিল না যে একটীমাত্র লোকের অভাবে এরূপ পতন হইতে পারে। হারাণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেনকা হরিনাথ-কন্যা সুমতীর "সই"; দুই জনের মধ্যে বয়সের কিছু প্রভেদ থাকিলেও, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট প্রণয় লক্ষিত হইত। কেহ কাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, ঘরে কোন একটী সামান্য জিনিষ হইলেও মেনকা সুমতীকে না খাওয়াইয়া সুখী হইতেন না। গ্রামের মধ্যে হারাণ ঘোষের অবস্থা মন্দ ছিল না; একটা প্রবাদ বহুকাল হইতে শুনা যাইত যে, হারাণ ঘোষের অনেক অর্থ ছিল, তিনি নাকি কোন দৈববলে সাত ঘড়া মোহর পাইয়াছিলেন; তাঁহার চালচলন সাদা সিধা ও মোটা রকমের হইলেও, তাহার খরচের কৃপণতা ছিল না; নিজের পাঁচ হাত ধুতি এবং স্ত্রীর হাতে এক জোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত শাঁখা ছাড়া অন্য কোন প্রকার বাহুল্য লক্ষিত হইত না। গ্রামের মধ্যে এখনো কেবল হারাণ ঘোষের বাড়ীতেই বৎসরান্তে দুই একখানি প্রতিমা আসিয়া থাকে; পিতার সময় হইতে যে নিয়মে সমস্ত কার্য্য কলাপ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। বৎসরান্তে তাহার বাড়ীতে গরিব লোক এখনো পেট ভরিয়া আহার করিয়া থাকে; সময়ে সময়ে এক আধখানা নূতন বস্ত্রও যে তাহারা মাথায় বাঁধিয়া আনন্দে চলিয়া না যায়, এমনও নয়।

(৪)

ভগবান মানুষকে বোধ হয় সর্ব্বসুখে সুখী হইতে দেন না, হারাণচন্দ্রের—ছিল না কি ? গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর পোরা মাছ, এ সমস্ত থাকা সত্বেও, একটীর অভাবে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বড়ই বিষণ্ণ করিয়া তুলিত। হারাণচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী সৌদামিনীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তিনি মেনকাকে স্ত্রীরূপে ঘরে আনিয়াছেন; আশা ছিল মেনকা তাঁহাকে পুত্রমুখ দর্শন করাইতে পারিবে, কিন্তু কৈ ? ভগবান না দিলে মেনকা কোথায় পাইবে ? হারাণ ঘোষ সে আশায় এখন নিরাশা হইয়াছেন। মেনকা নিঃসন্তান হইলেও, তাহার আদর যত্নে হারাণকে সুখী করিতে পারিয়াছিলেন; মেনকা হারাণচন্দ্রের হৃদয়ের শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ করিয়া সমস্ত হৃদয়টা যেন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

(৫)

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না; পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে সকলের যেমনভাবে দিন কাটে হরিনাথের কষ্টের দিনগুলি সেইভাবে কাটিয়া যাইতেছিল; হরিনাথের বাল্যকাল ও বর্ত্তমানের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও, নিরুপায় হরিনাথ অগত্যা বর্ত্তমানকেই সুখের বলিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া কি করেন ? হরিনাথের সকলই গিয়াছে, আছে মাত্র তাঁহার "ঈশ্বরে-বিশ্বাস।" অবস্থার বিপর্য্যয়ে ও সাংসারিক অশান্তিতে যখন তিনি প্রপীড়িত হইতেন, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চিন্তার বোঝাটা তখন ভগবানের স্কন্ধে চাপাইয়া, নিজে নিশ্চিন্ত হইতেন। কন্যা সুমতী ক্রমশঃ বিবাহযোগ্যা হইতে চলিল; সংসারের অভাব-অভিযোগের উপর স্ত্রীর নিকট হইতে এ সম্বন্ধেও অনুযোগ শুনিতে হইত, এবং স্ত্রীর নিতান্ত আগ্রহে তাঁহাকে এ সম্বন্ধের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইত,—"ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে", অবশ্য হরিনাথ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; বিবাহের চেষ্টা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তেমন কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না, কন্যার রঙ কিঞ্চিৎ ময়লা, পয়সাও তেমন খরচ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে,সেই রকমই হইল।

(৬)

"সই, ও সই, সই ?" মেনকা ডাকিল; সুমতী আসিয়া বলিল—"কেন সই, আমায় তুই ডাকছিস্ ?" "হাঁ, এই তোর জন্য একটু ছানা এনেছিলাম, খেয়ে দেখ্ তো কেমন হয়েছে ? বেশী টক হয় নি তো ?" সুমতী মেনকার হাত হইতে ছানার তালটী লইয়া চিনি সহ প্রায় সমস্তটাই শেষ করিয়াছেন,—এমন সময় সুমতীর মা আসিয়া বলিলেন,—"মা মেনকা, তোর সইকে তো দুধ, ছানা খাইয়ে খুব মোটা করছিস্; কিন্তু মা বিয়ের কি হবে ? এখনও কোন স্থানে ঠিক হলো না।" মেনকা হাসিয়া বলিল,—"মা ঠাকরোন্, সইয়ের বিয়ে যেন দেরিতেই হয়, বিয়ে হলে সই তো আমায় ছেড়ে চলে যাবে ?" ব্রাহ্মণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন;—"না মা

অমন কথা বলিস্ নি, এই তো ১৩ বছর পেরুলো, কে জানে ভগবান কত দিনে কূল দিবেন"।

(৭)

প্রায় দুই বৎসর হরিনাথ সুমতীর বিবাহের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিলেন; কিন্তু তিনি কোথাও সুবিধা করিতে পারিলেন না। কন্যা ক্রমশঃ বড় হইতে চলিল; হরিনাথও অস্থির হইতে লাগিলেন, আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন; যতদূর তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতেছেন; আহার-নিদ্রা, প্রায় তিনি ভুলিয়াছেন; লোকের মুখে কোন নূতন সংবাদ পাইবামাত্র সেই স্থানে হাজির হইতেছেন, কিন্তু মানবের শরীর কত সহ্য করিতে পারে? একে তো তাঁহার চেষ্টার সাফল্য সুদূরপরাহত, তাহার উপর দারুণ পরিশ্রম; আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের অনিয়মে, তাঁহার দেহ ক্রমশ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িল; স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময় একদিন হরিনাথ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী প্রবেশ করিলেন; তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন, জ্বরের প্রকোপে অস্থির; তাঁহার মুখের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় তিনি আজ সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন; বাটী প্রবেশ করিয়াই অবসন্ন দেহে দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন; ব্রাহ্মণী সাংসারিক কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, হরিনাথের গলার আওয়াজে মা ও মেয়ে উভয়েই উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ জ্বরে ছটফট করিতেছেন; ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্রপদে এক ঘটী জল আনিয়া হরিনাথের ধূলিপূর্ণ পদদ্বয় ধৌত করিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন; এবং একটী শয্যায় হরিনাথকে শয়ন করাইয়া তাঁহার নিকট বসিলেন, হরিনাথ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"বোধ হয় সুমতীর বিবাহ দেওয়া আমার দ্বারা হইল না, এত চেষ্টাতেও কোন ফল ফলিল না, আমার দেহও ভগ্ন হইল, আর আশা নাই।" তাহার অবস্থা দেখিয়া মাতা ও কন্যার চক্ষে জলধারা বহিল; ব্রাহ্মণী ধীর-ভাবে স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বলিলেন,—"তুমি এত হতাশ হইও না, তোমার মুখেই না শুনিতাম, ভগবান যাহা ইচ্ছা করিবেন? ভগবানে বিশ্বাস তুমি হারাইতেছ কেন? তিনিই আমাদের ভরসা।"

হরিনাথের জ্বর ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিল, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন; সুমতী বালিকা, পিতার অবস্থা, পিতার রোগ-যন্ত্রণা, মাতার চক্ষের অবিরল ধারা,—তাঁহাকে বড় ব্যথিত করিল; মেনকা এই ব্রাহ্মণ পরিবারের এবং তাঁহার প্রাণাধিক সইয়ের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; সেই দিন হইতে তিনি বাড়ীতে থাকিয়া গেলেন।

হরিনাথ প্রায় একমাসকাল শয্যাগত; দূর গ্রাম হইতে একজন ভাল চিকিৎসক আনান হইয়াছে; মেনকার আগ্রহে ও অনুরোধে তাহার স্বামী হারাণ ঘোষ এ বাড়ীতে রাত্রিদিন হাজির থাকেন, ডাক্তার আনয়ন, ঔষধ লইয়া আসা প্রভৃতি সমস্ত বাহিরের কাজ হারাণচন্দ্র সমাপন করিতেছেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে চলিল, ডাক্তার হারাণচন্দ্রকে

রোগীর সঠিক অবস্থা জানাইলেন। এই ক্ষুদ্র সংসারের প্রত্যেক লোক বিষণ্ণ; কন্যা সুমতী শয্যাগত, হরিনাথের স্ত্রী বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সংসারের চিন্তা এক রকম ত্যাগ করিয়া অনিমিষ নয়নে স্বামী-শয্যায় সমাহিতা; কোন দিকে তাঁহার দৃকপাত নাই; একাগ্রচিত্তে সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান স্বামী-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় অনিমেষলোচনে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিতেছেন। আর মেনকা? সুমতীর সই মেনকা কি করিতেছেন? এই সংসারের সমস্ত কর্ম্ম, রোগীর পথ্যাপথ্য, চিকিৎসকের আবশ্যকীয় দ্রব্য, যখন যাহা দরকার তদ্দণ্ডেই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, তাঁহার মুখে বাক্য নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, কর্ম্মে অবসাদ নাই, এবং দেহে ক্লান্তি নাই। কোন এক মহৎভাবের প্রেরণায় আজ তাঁহার দেহ-মন পূর্ণ, আন্তরিক যত্ন এবং প্রাণান্ত-পরিশ্রমে এই দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যে তিনি ব্যস্ত।

আরও তিন সপ্তাহ এইভাবে কাটিয়া গেল, ব্রাহ্মণীর কাতর প্রার্থনা, মেনকার অদম্য পরিশ্রম, সুমতীর চক্ষের অবিরল ধারার, বোধ হয়, কিছু মূল্য ছিল; ভগবান বোধ হয় কৃপা করিলেন; অদ্য ডাক্তার বলিয়া গেলেন, "আর কোন ভয় নাই, আশা হইয়াছে"। হরিনাথ পূর্ণ দুই মাস শয্যাগত থাকিয়া এখন সুস্থ হইয়াছেন, দেহ এখনো বড়ই দুর্ব্বল, একদিন কথায় কথায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"যদি এ যাত্রা আমি বাঁচিয়া যাই, তবে একমাত্র ভগবানের কৃপা এবং মেনকার গুণে"। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন; সুমতীর বিবাহের চিন্তা আবার তাঁকে অস্থির করিল; স্ত্রীর মুখে একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার বহু কষ্ট সঞ্চিত তিন শত মুদ্রা তিনি কন্যার বিবাহের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই চিকিৎসার জন্য ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কথাটা তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে বড়ই বাজিল; একবার আকুল নয়নে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন,—"হা ভগবান!" ইতিপূর্ব্বে যে চিন্তায় তাহাকে শয্যাগত করিয়াছিল, সেই চিন্তাই পুনর্ব্বার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। অনেকক্ষণের পর স্থির করিলেন, যে কোন উপায়ে অচিরে বিবাহ দিতেই হইবে; উপস্থিত অর্থচিন্তা অপেক্ষা পাত্রের চিন্তাই তাঁহার প্রধান জ্ঞান হইল; আবার তিনি পাত্রের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

(৯)

ঐকান্তিক চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল নিশ্চয়ই আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা বোধ হয় এতদিন পরে ভগবানের দ্বারে পৌঁছিল, পাত্র স্থির হইয়া গেল। পাত্রের পিতার অর্থাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় থাকিলেও, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতর মিনতি তিনি একেবারে অবহেলা করিতে পারিলেন না; অবশেষে সহস্র মুদ্রা পণে পুত্রের বিবাহ দিবেন স্বীকার করিলেন, ১৭ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তিনি হরিনাথ-কন্যা সুমতীকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, কন্যাটী ময়লা হইলেও তাঁহার অপছন্দ হয় নাই। হরিনাথ নিজ

অবস্থা বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকিলেও এ সুযোগ ত্যাগ করিতে তাঁহার সাহস হইল না, কারণ যতদূর তিনি জানিয়াছেন এ ঘরে কন্যা পড়িলে কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব হইবে না।

বেলা প্রায় ১০টা, রৌদ্রের দারুণ তাপে পল্লীগ্রামের লতা-বৃক্ষ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বেলা দশটার মধ্যেই লোক ঘরের বাহির হইতে ভয় পাইতেছেন ;ঘরের দাওয়ায় হরিনাথ একখানি জলচৌকিতে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন, কন্যা সুমতী এক বাটী তৈল লইয়া পিতার দেহে মাখাইয়া দিতেছেন, সম্মুখে স্ত্রী পান প্রস্তুত করিতেছেন। পাত্র স্থির করিয়া হরিনাথ ২।৩ দিন হইল বাড়ী ফিরিয়াছেন। সুমতীর মাতা বলিলেন "পাত্র তো ঠিক করিলে কিন্তু হাজার টাকা? এত টাকার যোগাড় কোথা হইতে হইবে?"

হরিনাথ।—টাকা কিছু বেশী লাগিবে বটে, কিন্তু ঘর ভাল ?

ব্রাহ্মণী।—ঘর ভাল, বরও ভাল, কিন্তু টাকার কি হইবে ?

হরিনাথ বাস্তবিক আসল কথাটী এখনও ভাল করিয়া মনের ভিতর স্থান দিতে সাবকাশ পান নাই; তিনি যে পাত্রটী স্থির করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই যেন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল, স্ত্রীর দুইবার প্রশ্নে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল; বাস্তবিক এইবার তিনি অর্থ চিন্তায় মন দিলেন, বলিলেন—"তাইতো, এত টাকার যোগাড় কি করিয়া হয়?" "ভগবান ভরসা মাত্র।" স্নান করিয়া আহার করিলেন; গ্রামে ২।১টী স্থানে টাকার যোগাড় হইবার আশা ছিল; সকলের নিকট স্তুতি মিনতি জানাইলেন, কিন্তু কৈ? প্রত্যেক স্থানেই—যে তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল; নিজ গ্রাম ছাড়িয়া ক্রমে গ্রামান্তর অবধি বহু চেষ্টা করিলেন, প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কোন ফল হইল না। আবার এই ক্ষুদ্র সংসারটী যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; সকলেই চিন্তামগ্ন, বিবাহের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে চলিল, ততই যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল! মেনকা সমস্তই শুনিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর, সুমতীর মনোকষ্টের কারণ তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন।

(১০)

বৈশাখের বারটা বেলা, আর আগুনের হল্‌কা দুইটাই সমান; এই রকম সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় হারাণ ঘোষ বাড়ী প্রবেশ করিল; তাহাকে দেখিলে বোধ হয় অনেকক্ষণ হাঁটিয়া আসিতেছেন; বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পুকুরে পা দু'টী ধুইয়া আসিয়াছেন, মেনকা অন্ন ব্যঞ্জন থালায় রাখিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, আসিবামাত্র অন্নপূর্ণ থালাখানি লইয়া আসনের-সম্মুখে রাখিলেন; সমস্ত সামগ্রী দিবার পর,একখানি তালবৃন্ত হস্তে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, আর হারাণ চন্দ্র সময়ের অপব্যয় না করিয়া মোটা মোটা হাতে থাবা থাবা অন্ন গলাধঃকরণ করিতেছেন; তাড়াতাড়ি আগমনের দরুণ মধ্যে মধ্যে গলায় ভাত আটকাইয়া যাইতেছে, আবার ঘটী হইতে জল লইয়া সে বাধাটি সরল করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে মেনকা বলিলেন—"কিছু করিতে

পারিলে কি?"

হারাণচন্দ্রের এ সময়টী বড়ই মূল্যবান, তিনি ইহার অপব্যয় করিয়া যে কথা কহিবেন, সে পাত্র তিনি নহেন। প্রায় অর্দ্ধেক অন্ন উদরে স্থান পাইবার পর, বলিলেন,—কিসের কি?

মেনকা।—কি রকম লোক তুমি? তোমায় চেনা ভার!

হারাণ।—কেন? এতকালেও আমায় চিন্‌তে পারিলে না?

মেনকা।—তামাসা এখন রেখে, কাজের কথাটী বল দিকি।

হারাণ।—কোন্ কাজের?

মেনকা।—সুমতীর বিবাহের টাকার কি হইল?

হারাণ।—ও তোমার সইয়ের? বিয়ের টাকার কথা? এতক্ষণ বল্‌তে হয়? আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম।

মেনকা।—নাও, তোমার সব সময়ই তামাসা, আসল কথাটা কি হলো বলে ফেল না।

হারাণ।—তবে শুনবে? টাকার যোগাড় শুধু হাতে হ'তে পারে না, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হ'ল না।

মেনকা।—খালি হাতেই হোক আর পূর্ণ হাতেই হোক, যে কোন প্রকারে টাকার যোগাড় করা চাইই, বিয়ের আর কয়দিন বা আছে?

মেনকা এবার বাস্তবিক যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিল—"দুনিয়ার লোকের উপকারে তুমি থাকিতে পার, কিন্তু আমার সইয়ের জন্য টাকার দরকার কিনা, তাই তোমার গ্রাহ্য হয় না; কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি যে, তোমাকে যে কোন উপায়ে টাকা আনিয়া দিতেই হইবে, ইহা মেনকা রাণীর হুকুম জানিবে।"

হারাণচন্দ্র যেন একটু অপ্রস্তুত। একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন—"হুকুম শিরোধার্য্য, টাকার যোগাড় কল্যই করিব।" মেনকা বলিল—"কাল যদি না টাকার যোগাড় করিতে পার, তবে আমার যাহা আছে আমি সইকে সব দিয়া আসিব, আমার টাকার উপর তো আর তোমার জোর নাই, আর এক কথা, তোমার সহিত কাল হইতে আমার কথা বন্ধ হইবে ইহাও জানিয়া রেখো।"

(১১)

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হরিনাথ বাটীর বহির্ভাগে একটী বটবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন; দক্ষিণ পবন তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তকের উপর দিয়া হু হু করিয়া বহিতেছিল, দারুণ গ্রীষ্মের সময় পল্লীগ্রামের মাঠের হাওয়া সন্ধ্যাকালে যে কত মিষ্ট কত স্নিগ্ধ, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। এমন সময় সুমতী আসিয়া বলিলেন—"তোমায় হারাণদা কেন খুঁজিতেছেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হারাণ, কখন আসিল? আমি তার কথাই ভাবিতেছিলাম! সে কোথায়? কন্যা বলিল—"মায়ের কাছে বসিয়া আছেন, আমার সইও আসিয়াছেন।"

হরিনাথ বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, হারাণচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া রহিয়াছেন; হরি-

নাথকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণচন্দ্র বলিলেন "বাবাঠাকুর, প্রণাম হই।" হরিনাথ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া নিজেও বসিলেন। "বাবাঠাকুর, বিবাহের টাকার যোগাড় হইল কি?"

হরিনাথ।—কোথা হইতে হবে বাবা? কেহই দয়া করিল না।

হারাণ।—তবে উপায় কি? বিবাহের দিন তো সংক্ষেপ শুনিলাম।

হরিনাথ।—সবই তো জানি কিন্তু ভগবান দয়া না করিলে, আমার দ্বারা তো কিছুই হইল না।

হারাণ।—শুধু হাতে টাকা পাওয়া আজকাল মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। আপনার জোতের দলিলখানি, আমায় যদি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করিব মনে করিতেছি।

হরিনাথ।—কোন আপত্তি নাই, স্বচ্ছন্দে দলিলখানি তুমি লইয়া যাইতে পার, আমি তো ঐ দলিল লইয়াও অনেক স্থানে ফিরিলাম, অত টাকা কেহ দিতে স্বীকার হয় না। এই কথাগুলি বলিয়া হরিনাথ একটী ছোট হাতবাক্স হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়া হারাণের হস্তে দিলেন;

হারাণ।—এই জোতটী মাত্র আপনার সম্বল, পরে কি করিয়া সংসার চলিবে।

হরিনাথ। বাবা, পরের চিন্তা পরে হইবে, এখন উপস্থিত দায় হইতে আমায় উদ্ধার কর; তুমি ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না।

(১২)

সুমতীর জ্ঞান হইয়াছে সংসারের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছে তাঁহার অগোচর কিছুই নাই; তাঁহার পিতার একমাত্র সম্বল, যাহা কিছু ঐ জোতটী তাহাও বন্ধক পড়িতে চলিল। আজ তিনি বড়ই বিষণ্ণ, তাঁহার সই মেনকা তাঁহাকে যত বুঝাইতেছেন, ততই তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, মেনকা তাঁহাকে বলিলেন,—"সই, তোর কোন চিন্তা নাই, ভগবান সমস্ত ঠিক করিয়া দিবেন।"

একদিন মধ্যাহ্নে হরিশ্চন্দ্র আসিয়া হরিনাথের হস্তে পাঁচ শত টাকার দুই খানি নোট দিল; এবং প্রণাম করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাঠাকুর, আপনি তাহা হইলে কবে কলিকাতায় যাইতেছেন? হরিনাথ বলিলেন,—"আর তো বিবাহের বিলম্ব নাই বাবা, তোমার কল্যাণে এতদিন পরে সুমতীর বিবাহ হইবে আশা হইল, তোমার উপকার এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পূর্ব্বে কখন ভুলিবে না। আগামী বুধবারে বিবাহ, অদ্য সোমবার, আগামী কল্য প্রাতের ট্রেণে কলিকাতায় যাইব।"

(১৩)

হরিনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন; দুই খানি নোটই তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন; উদ্দেশ্য একখানি ভাঙ্গাইয়া, অলঙ্কার, বরাভরণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি খরিদ করিবেন, অপরখানি কারেন্সি আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া পাঁচশত নূতন কলের টাকা লইবেন, কারণ তাহা বরকর্ত্তাকে পণ-স্বরূপ দিতে হইবে। প্রথমে একখানি নোট ভাঙ্গাইয়া অলঙ্কারগুলি খরিদ

করিলেন, পরে অপরাপর আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র সমস্ত দিন ধরিয়া খরিদ করিয়া, সন্ধ্যার সময় অবসন্নদেহে গ্রামস্থ কোন লোকের বাসায় রাত্রিযাপন মানসে উপস্থিত হইলেন। বক্রী নোটখানি বাসায় শয়নের পূর্ব্বে সাবধানে চাদরে বাঁধিলেন, এবং মস্তকের নিম্নে রাখিয়া শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন, প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সমস্ত জিনিষগুলি একজন মুটের মাথায় উঠাইয়া দিয়া বাসা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইচ্ছা গন্তব্য পথে করেন্সি আফিস হইতে নোটখানি ভাঙ্গাইয়া সেই দিনেই বাটী ফিরিবেন।

মুটে অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল, হরিনাথ পশ্চাতে, বাসা হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া নোটের কথা তাঁহার স্মরণ হইল, তৎক্ষণাৎ স্কন্ধদেশ হইতে চাদরখানি হাতে লইলেন, যে স্থানে নোটখানি বাঁধা ছিল সে স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নোট নাই; একবার দুইবার বহুবার দেখিলেন, কিন্তু কৈ নোটের কোন চিহ্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল না অকস্মাৎ, তাহার মস্তকে যেন কে দারুণ আঘাত করিল, সমস্ত জগৎ আঁধার দেখিলেন? মুটেকে ফিরিতে বলিলেন,—আবার বাসায় ফিরিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন; কেহই তাঁহার নোটের সংবাদ দিতে পারিল না; একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"হা ভগবান, তোমার মনে এই ছিল।" অগত্যা যাহা ছিল তাহাই লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

(১৪)

আজ সুমতীর বিবাহ; মেনকা ও হারাণ-চন্দ্র আজ বড়ই ব্যস্ত, বাহিরের সমস্ত ব্যবস্থা হারাণচন্দ্রের হস্তে, তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে সেই ব্যবস্থায় ব্যস্ত। আর অন্দরে মেনকা, আজ মেনকা বড় প্রফুল্লা, সদা হাসিভরা মুখখানি লইয়া সকলের সম্মুখে হাজির, যাহার যে বস্তু আবশ্যক মেনকা সকলের অনুরোধ রক্ষায় নিযুক্তা; সন্ধ্যার সময় হরিনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিছিলেন; তাঁহার অনুপস্থিতিতে যেন কোনপ্রকার ত্রুটী লক্ষিত না হয়, সে বিষয়ে মেনকা হারাণ-চন্দ্রকে উপদেশ দিয়া সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সকলেই হরিনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণীর মুখে আজ যেন কে হাসিরাশি মাখাইয়া দিয়াছে, সমস্ত কার্য্যের ভার তিনি মেনকার হস্তে ন্যস্ত করিয়া আত্মীয়া নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকগণকে অভ্যর্থনা এবং সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন।

বিবাহ-সভা হারাণচন্দ্রের মনোমত সজ্জিত হইলে, তিনি বরাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন; গ্রামের মধ্যে দশ বারটী ভদ্রলোক তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন; এবং হারাণচন্দ্র হাস্য-মুখে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রায় আটটা বাজিল, সভাস্থল আলোক-মালায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; হরিনাথ এখনো পৌঁছান নাই; প্রত্যেকেই বিশেষতঃ হারাণ-চন্দ্রবড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ঠিক সেই সময়ে দূরে বেহারা এবং সানাইয়ের চিরপরিচিত শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, সকলে বর আসিতেছে বলিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন; বরসহ বরযাত্রিগণ আসিয়া

পৌঁছিলেন, হারাণচন্দ্র অগ্রসর হইয়া সকলকে সাদরে সভাস্থলে আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন; বর সভাস্থলে আসীন; সভাস্থল কিয়ৎ কালের জন্য কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ, বরকর্ত্তা হরিনাথ বাবুকে খুঁজিলেন, বিবাহ-লগ্ন ৯॥টার সময়, মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। এমন সময় হরিনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সভাস্থল দেখিয়া বুঝিলেন, হারাণচন্দ্রের সুব্যবস্থায় তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কোন কার্য্যের ক্রটী হয় নাই, সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা-সম্প্রদানের শুভ লগ্ন আসিল; বরকর্ত্তার সম্মুখে সমস্ত দান-সামগ্রী রক্ষিত হইল, তিনি একে একে প্রত্যেকটী পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিতেছেন, দুইটী পৃথক আসনে পাত্র ও পাত্রী উপবিষ্ট, পুরোহিত পার্শ্বের আসনে অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত জিনিষ পরীক্ষার পর বরকর্ত্তা হরিনাথ বাবুকে পণের টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; ঠিক সেই সময়ে কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত সভামধ্যে সকলের নিকট বিবাহের অনুমতি চাহিয়া বরকর্ত্তার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন, বরকর্ত্তা বলিলেন,—"একটু বিলম্ব করুন।"

(১৫)

হরিনাথ বাবু বরকর্ত্তার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না; তিনি হাত যোড় করিয়া বলিলেন,—"আমি বড়ই বিপদ-গ্রস্ত টাকা......" বরকর্ত্তা রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"টাকার কথা বলুন। এখন বাজে কথার সময় নাই, কোথায় টাকা?"

হরিনাথ।—আমার কথা সমস্ত না শুনিলে, আমার বিপদ কি রকম গুরুতর আপনি বুঝিবেন না।

বরকর্ত্তা।—আপনার সমস্ত কথা শুনিবার সময় উপস্থিত আমার নাই; অগ্রে টাকা লইয়া আসুন, পরে সমস্ত শুনিব।

হরিনাথ বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন,—"টাকা চুরি গিয়াছে। আপনি আমায় কৃপা করুন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করুন বিবাহ হইয়া যাউক, কল্য আপনার টাকা যেখান হইতে পারি যোগাড় করিয়া দিব।"

বরকর্ত্তা।—সেটী হবে না, যদি টাকার যোগাড় এই মুহূর্ত্তে করিতে পারেন তবেই, নচেৎ বর লইয়া ঘর যাইব।

হরিনাথ বলিলেন,—"ভগবান ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?" তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না বরকর্ত্তার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—"আমায় রক্ষা করুন" তাহার পর সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

এত মিনতি, এত স্তুতি, এত করিয়াও বর-কর্ত্তার পাষাণ প্রাণে দয়ার চিহ্নমাত্র প্রকাশ হইল না, তিনি বরযাত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বর উঠাও, চল ফিরিয়া চল।"

সভাস্থ সকলে এবং হারাণচন্দ্র বুঝিলেন, পণের টাকা চুরি হইয়াছে, বিবাহ হইবার আর কোন উপায় নাই, হরিনাথ জ্ঞানশূন্য, হারাণ-চন্দ্র তাঁহার সেবায় মন দিলেন; ব্রাহ্মণের মস্তকে ও মুখে জল সিঞ্চন করিয়া তাঁহার জ্ঞান ফিরাইলেন। তখন একটী বালক আসিয়া

তাঁহাকে অন্দরে লইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, সম্মুখে সাশ্রুনয়নে মেনকা দণ্ডায়মানা, হস্তে একটী পিত্তল-নির্ম্মিত ঘটী।

মেনকা।—ব্রাহ্মণের বিপদ, কাতর প্রার্থনা, সমস্ত দেখিলাম, সমস্ত শুনিয়াই আমি আসিয়াছি, এই লও; আমার পাঁচশত টাকা ইহাতে আছে, শীঘ্র যাইয়া বরকর্ত্তাকে দাও, মানুষের ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ হইতে পারে না; আর ইহা অপেক্ষা দানের উত্তম সুযোগ পাওয়া সুকঠিন।

হারাণচন্দ্র স্থির, স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, ভাবিতেছেন,—মেনকা "মানবী" না "দেবী?" মেনকা আবার বলিলেন,—"যাও বিলম্ব করো না, এখনি বর উঠিয়া পড়িবে।"

হারাণচন্দ্রের আর বাক্য সরিল না, এতক্ষণ তাহাকে কে যেন কোন স্বর্গের ছবি তাঁহার নয়ন সম্মুখে ধরিয়াছিল, তিনি ঘটীটী হস্তে সভাস্থলে আসিয়া বরকর্ত্তার সম্মুখে তাহা ধরিলেন, এবং বলিলেন,—"টাকার যোগাড় হইয়াছে, টাকা গণনা পূর্ব্বক গ্রহণ করুন; বরকর্ত্তা ঘটীটী নাড়িলেন, ভিতর হইতে রজতখণ্ডের মধুর ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তাঁহার মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল; এবং বলিলেন,—"পুরোহিত মহাশয়, সম্প্রদান করুণ, আর বিলম্ব না হয়।" শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে সুমতীর বিবাহ হইয়া গেল। হরিনাথ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন; হারাণচন্দ্র বরযাত্রিদের আহারের বন্দোবস্তে ব্যস্ত; পাত্র-পাত্রী বাসর-ঘরে গমন করিয়াছেন, মেনকার আনন্দের সীমা নাই। আজ যে তাহার সইয়ের বর আসিয়াছে, তিনি বরের আচ্ছা করিয়া কর্ণমর্দ্দন পূর্ব্বক বলিলেন "এটা কি সইয়ের বিয়ে? না টাকার বিয়ে?" বর কর্ণে হস্ত বুলাইয়া মেনকার মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিলেন; মেনকা বলিলেন,—"ও সই, কাণে একটু তেল মাখাইয়া দে, এখনো যে অনেক বাকি?"

অদ্য সুমতীর শ্বশুরালয় গমনের দিন; হারনাথের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আজ আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ; মেনকা ও সুমতীর মাতা কন্যা পাঠাইবার আবশ্যকীয় বন্দোবস্তে ব্যস্ত; বাড়ীটী জনরবে মুখরিত; বরকন্যা গমনের পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদের প্রথা অনুযায়ী একটি গালিচার উপর বরকন্যাকে বসান হইয়াছে, গুরুস্থানীয় আত্মীয়স্বজন নিজ নিজ সাধ্যমত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যিনি যাহা দিতেছেন বরের হস্তে এবং কন্যার হস্তে তাহা প্রদান করিতেছেন; যিনি টাকাকড়ি দিতে না পারিতেছেন তিনি ধান্য ও দূর্ব্বার দ্বারা আশীর্ব্বাদ-কার্য্য সমাধা করিতেছেন। একে একে সকলের আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে অবশেষে মেনকা ধীর মন্থর গতিতে সুমতীর নিকট বসিল; এবং অঞ্চল হইতে জোড়া সুবর্ণ শঙ্খ বাহির করিয়া অতি ধীরে সুমতীর হস্তে পরাইয়া দিতেছেন, তাঁহার মুখে ঈষৎ হাসি; চক্ষের জলধারা গণ্ড বহিয়া মুক্তা-মালার ন্যায় একটীর পর একটী, তারপর একটী, পড়িতেছে; এ সময় তাঁহার হাস্যরোদন মিশ্রিত বদনখানি বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, শঙ্খ

পরাম হইলে পর, একটী কাগজের মোড়ক হস্তে করিয়া এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লোহিত চূর্ণ লইয়া সুমতীর সীমন্তে দিয়া বলিলেন,—"আজ সই সত্যি সত্যি আমায় ছেড়ে চল্লি" আর কথা কহিতে পারিলেন না, সুমতীর গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া আবার বলিলেন,—"সই আমি শূদ্র, গরীব, তোমায় আশীর্ব্বাদের ক্ষমতা আমার নাই, তবে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তোমার শাঁখার সিন্দুর অক্ষয় হয়; ইহার অধিক আমার কি ক্ষমতা আছে?" সুমতী সইয়ের কথায় বড় কাতর, তাঁহারও চক্ষুদুটী শুষ্ক ছিল না।

ঠিক সেই সময়ে হরিনাথ অন্দরে আসিয়া বলিলেন, —"মা মেনকা, একটু সত্বর সারিয়া লও, অধিক বিলম্ব হইলে পথে দারুণ রৌদ্রে সকলকেই কষ্ট পাইতে হইবে। মেনকা বলিলেন,—"বাবা ঠাকুর, বরকন্যাকে একটু জলযোগ করাইয়া দিতে পারিলেই হয়।" হরিনাথ সদরে আসিবার জন্য যেমন ফিরিলেন, সম্মুখে দেখিলেন হারাণচন্দ্র, বলিলেন,—"এস বাবা এস", হারাণচন্দ্র প্রণাম করিয়া বলিলেন "আপনি একটু অপেক্ষা করুন আপনার সহিত একটু কাজ আছে" এই কথা বলিয়াই হারাণচন্দ্র মেনকার নিকট গেল এবং দুই জনে কি কথা হইল, পরক্ষণেই হারাণচন্দ্র হরিনাথের সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"আপনাকে আমায় একটী ভিক্ষা দিতে হইবে, আপনি যদি স্বীকার হয়েন তবে আমি বলিতে সাহস করি।" হরিনাথ বলিলেন, "তোমায় আমার কি অদেয় থাকিতে পারে? বল তুমি কি চাও?" হারাণচন্দ্র নিজ স্কন্ধবিলম্বিত চাদরখানি হস্তে লইলেন, এবং চাদর হইতে একটী কাগজের পুলিন্দা বাহির করিয়া হরিনাথের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বেই আপনি স্বীকার করিয়াছেন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এখন আমার প্রার্থনা এই যে, এই দলিল লিখিত জোতটী যাহা আপনার কন্যা সুমতীর বিবাহ কারণ বন্ধক রাখিয়া এক হাজার মুদ্রা লইয়াছিলেন, উক্ত সহস্র মুদ্রা আমার স্ত্রী মেনকা দাসী তাহার "সই" সুমতী দেবীর শুভবিবাহের উপহারস্বরূপ মহাজনকে পরিশোধ করিয়াছে, এবং উক্ত জমির দলিলখানি আপনাকে ফেরৎ দিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছে; আমার স্ত্রীর এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।"

হরিনাথের হস্তে দলিল; তিনি নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, নিমীলিত নেত্রে একবার দলিলখানি দেখিলেন, দলিলখানি যে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির শেষ চিহ্ন, অন্ধের যষ্ঠি; দরিদ্রের ধন, ক্ষুধিতের অন্ন, তৃষিতের বারিবিন্দুস্বরূপ, তাহা তিনি ভাবিলেন, আর ভাবিলেন, ইহা ছাড়া হইলে তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। উদ্বেলিত প্রাণে একবার হারাণচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, সে মুখে সেইরূপ উদ্বেগশূন্য ভাব ছাড়া নূতনত্ব কিছুই ছিল না। হরিনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কম্পিতহৃদয়ে হারাণচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার, বোধ হয় ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল।"

কুমার দামোদর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভবসাধন রায়।

এক বৃদ্ধ একাকী বসিয়া কি লিখিতেছেন। তাঁহার লেখনী অনবরত চলিতেছে। এক একবার কি ভাবিতেছেন, আবার লিখিতেছেন। রাত্রিকাল, নির্জ্জন। বৃদ্ধ দ্বারের দিকে তাকাইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিন চারি পৃষ্ঠা লেখা হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন। যখন পাঠ শেষ হইল তখন একখানি কাগজে মোড়ক করিয়া শিরোনামা লিখিলেন,—

"প্রবল প্রতাপান্বিত—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল

বাহাদুর।"

দুই তিন বার শিরোনামা পাঠ করিয়া ডাকিলেন,—"ভজনরাম!" ধীর পদবিক্ষেপে এক জন ভৃত্য ঐ কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বলিলেন,—"এই পত্রখানি মহারাজার নিজ হস্তে দেওয়া চাই।" ভৃত্য কোন কথা না বলিয়া মাথা নোয়াইল। ভজনরাম বেশী কথা বলে না। বৃদ্ধ তাহার হস্তে পত্র দিলেন, সে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল।

ভবসাধন জাতিতে ব্রাহ্মণ, রাজা ধর্ম্মপালের মন্ত্রী। ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত রাজা কোন কার্য্যই করেন না। ভবসাধনের কূটবুদ্ধিতে, চাণক্য পরাজিত। ভবসাধন রায় এই রাজ্যের কর্ণধার। তিনি রাজাকে যে ভাবে চালান, রাজা সেই ভাবে চলেন। রাজা ধর্ম্মপাল যদিও বুদ্ধিমান লোক, তথাপি তিনি জানিতেন যে এই বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও রাজার মঙ্গল সাধন করিবেন, তাই তাঁহার প্রতি অসীম ভক্তি ও বিশ্বাস। অদ্য রাজা একটি গুপ্ত বিষয়ে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, সেই উত্তর রাত্রে একাকী বসিয়া লিখিয়া বিশ্বাসী ভৃত্য দ্বারা পাঠাইলেন।

রাজা তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া আছেন, কয়েক জন শরীর-রক্ষক অপর কক্ষে বিশ্রাম করিতেছে, এক জন বিশ্বাসী ভৃত্য কক্ষের দ্বারদেশে বসিয়া আছে, এমন সময় ভজনরাম তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাঠাইল। ভজনরামকে সকলেই চিনিত, দ্বার ছাড়িয়া দিল, সে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। রাজা ভজনরামকে দেখিলেই রহস্য করিতেন। তিনি ভজনরামকে বলিলেন,—"কি ভজনরাম, কেমন আছ? কি উদ্দেশ্যে আগমন?" ভজনরাম মস্তকের পাগড়ী হইতে লিপিখানি বাহির করিয়া পুনরায় অভিবাদন করিয়া রাজার হস্তে দিল। রাজা আবার হাসিয়া বলিলেন,—"ভজনরাম, তোমার কি কোন কথা নাই? এই পত্রখানি আমাকে দিলেই মুক্ত হ'লে?" ভজনরাম ঘাড় নাড়িল। রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী মহাশয় বেশ ভৃত্য পেয়েছেন, মূক বটে, বধির হ'লে আরও ভাল হ'ত।" রাজা ভজনরামকে নিকটে ডাকিলেন, ভজনরাম নিকটে আসিলে দেখিলেন তাহার মুখখানি বেশ চুল

চলে, রং খুব কালো, কিন্তু চক্ষু দুটি বেশ পটল-চেরা, লম্বা লম্বা কেশ পাগড়ীতে ঢাকা। বদনে কেশের কোন চিহ্ন নাই। অতএব ভজন-রামের বয়স ১৮।১৯ মনে করিলেন। ময়লা একখানি বসন পরিধানে, গাত্রেও একখানি চাদর, অপরিষ্কৃত। গলায় একগাছি তুলসীর মালা, তাহাতেই অনুমান হয় যে, সে বৈষ্ণব। রাজা মুখের দিকে দৃষ্টি করাতে ভজনরাম চক্ষু নত করিল। রাজা বলিলেন "তোমার মুনিবকে গিয়ে বল কাল ভোরে যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আজ আর পত্রের কোন উত্তর নাই।" ভজনরাম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রাজা পত্রখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, তার পর খুলিয়া পাঠ করিলেন ঃ—

"সে বিষয় অবশ্য কর্ত্তব্য, কিছুতেই অবহেলা কর্‌বেন না। এই সুযোগে না হ'লে আর হবে না। কাহারও কথা গ্রাহ্য কর্‌বেন না। এই স্থান জেলভুমি, পাপ পুণ্য বিচার আবশ্যক, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ক। অনেকে বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে, কেহ কেহ বা অন্যদিকে কথা বল্‌বে, কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করা দরকার।" রাজা ২।৩ বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রত্যুষে আমি গাত্রোত্থান কর্‌বো।" ভৃত্য যে আজ্ঞে বলিয়া চলিয়া গেল। রাজা সে রাত্রিতে আর অন্তঃপুরে গেলেন না, বাহিরের ঘরেই শয়ন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তুমি কে?

রাজা ধর্ম্মপাল শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা-দেবী শীঘ্র উপস্থিত হইতেছেন না। কতরূপ চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। তিনি বহুক্ষণ নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিলেন, কিন্তু দেবীর কৃপা হইল না। হঠাৎ দ্বারদেশ আলোকিত হইল, রাজা দেখিলেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। সুন্দরীর পরিধানে রেশমী শাড়ি, গলে ওড়না। সমস্ত শরীরে ফুলের অলঙ্কার। কর্ণে ফুলের দুল, গলায় পুষ্পহার, হস্তে পুষ্প বলয়, কোমরে পুষ্পের চন্দ্রহার। অপূর্ব্ব শোভা! এমন সুন্দরী কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ সময়ে এমন নির্জ্জন স্থানে, এ সুন্দরী কোথা হইতে আসিল? চারিদিকে প্রহরী, গৃহের দ্বারে সশস্ত্র রক্ষক, কক্ষের বাহিরে লোক, এ সুন্দরী কিরূপে রাজকক্ষে প্রবেশ করিল? তবে কি এ মানবী নহে? এ কি কোন দেবী না অপ্সরা? এইরূপ নানা প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইল। রাজা দেখিলেন, সুন্দরী গ্রীবাভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। একবার মনে হইল এ বুঝি স্বপ্ন। রাজা অচেতন অবস্থায় আসিলেন, মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না। তখন বীণানিন্দিত স্বরে যুবতী বলিল "রাজন্, এখনও সাবধান, কূটবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, জীবন হারাবে। আমি তোমাকে সাবধান কর্‌তে এলেম। তিন বার তোমাকে সাবধান কর্‌ব, এই প্রথম বার। যদি আমার বাক্য না শোন, রাজ্য নষ্ট

হবে, নিজে প্রাণ হারাবে।” রাজা দেখিলেন যুবতী ক্রমশঃ দ্বারদেশ হইতে অপসৃত হইতেছে। তিনি স্তম্ভিতের মত শয়ন করিয়া থাকিলেন। দেখিলেন ক্রমে সুন্দরী চলিয়া গেল।

তখন রাজার চৈতন্য হইল. তিনি লম্ফ প্রদানে উঠিলেন। কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুন্দরী, আর নাই, প্রহরীগণ বসিয়া আছে। তিনি একজন প্রহরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন যুবতী স্ত্রীলোক এসেছিল?” সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—“হুজুর আমরা কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পাই নাই। আমরা এস্থানে ব'সে আছি, কার সাধ্য বিনানুমতিতে প্রবেশ করে?” রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রধান ফটকে দেখিলেন, সমগ্র প্রহরীগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে প্রশ্ন করাতে তাহারা বলিল “হুজুর, কোন লোকই ভিতরে প্রবেশ করে নাই।” রাজা উত্তরোত্তর চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং নিজ কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষে তাহার যে বিশ্বাসী ভৃত্য শয়ন করিয়া থাকে, তথায় গেলেন। দেখিলেন ভৃত্য নিদ্রিত। তিনি তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন, তারপর যুবতী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সে অবাক্ হইয়া গেল, মনে করিল, রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছেন। দণ্ডায়মান হইয়া যোড় হস্তে বলিল “হুজুর, আমার এ কক্ষ দিয়া কেহ প্রবেশ করে নাই।” রাজা ঈষৎ হাসিলেন, তারপর তথা হইতে স্বীয় কক্ষে উপস্থিত হইয়া আবার শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাজা ভাবিলেন, এ সুন্দরী কে? এমন অনিন্দ্য সুন্দরী ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। আমার এই সুরক্ষিত কক্ষে কেমন ক'রে প্রবেশ কর্‌লে। প্রহরীরা এ সংবাদ কিছুই জানে না। তবে কি গুপ্ত দ্বার আছে? আমি ত কিছু জানি না। রাণীকে একথা বলা হইবে না। বৃদ্ধ মন্ত্রী কি এসব কিছু জানেন? তাঁকে গোপনে বল্‌তে হবে। অদ্য নিদ্রা যাই। আমাকে কিসের জন্য এত সাবধান কর্‌লে?” রাজা এই সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন, স্বপ্নেও সেই সুন্দরীকে দেখিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুমার দামোদর।

“মা, একবার এদিকে আসুন।”

রাজ্যেশ্বরী দেবী পুত্রের স্বর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন। কুমার প্রণাম করিলে মা বলিলেন—“বাবা, এতদিন কোথায় ছিলে? একবারও ত আমার নিকট এস নাই?” কুমার উত্তর করিলেন “মা, রাজকর্ম্মে মোটেই সময় পাই নাই। মামা, সর্ব্বদা নিকটে বসায়ে কাষ শিখাচ্ছেন। বিশেষতঃ, কুমারীদের বিবাহ আগামী মাসে সুসম্পন্ন হবে, তার উদ্যোগও কর্‌তে হচ্ছে।” রাজ্যেশ্বরী দেবীর মুখ প্রফুল্ল হইল, রাজা যে এখনও কুমারকে এতদূর যত্ন করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বুঝিলেন, ভাগিনেয়কে সিংহাসন দেওয়ার ইচ্ছা এখনও রাজার আছে। তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং

পুত্রকে নিকটে পাইয়া বলিলেন "বাবা, সর্ব্বদাই মাতুলের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাক্‌বে। তোমার ভগ্নীদ্বয়ের বিবাহ, যাহাতে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় তা কর্‌বে, লোকে নিন্দা না করে। তুমি এ রাজ্যের ভাবী রাজা, তোমার উপর সব নির্ভর। আমার বিশ্বাস কেহ কেহ তোমার শত্রুতাচরণ কর্‌বে, সেজন্য ভয় করো না। তোমার যিনি গুরুদেব তিনি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বেন। সর্ব্বদাই তার সদুপদেশ গ্রহণ কর্‌বে। এমন সাধু আজকাল ভারতে নাই। তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা।" কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, এইবার আপনার আদর কম্‌বে।" মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "আবার তোর কে মা এল?" কুমার বলিলেন "বনের মধ্যে এক মা পেয়েছি, তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাই। কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি অনিন্দ্য কান্তি! যেন বনদেবী বনের মধ্যে বিচরণ কচ্চেন। দেবী কি মায়াবী আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। স্বয়ং গুরুদেব তাঁকে সম্মান করেন। তিনিই আমাকে মায়ের নিকট নিয়ে যান। তিনি কে কেহই জানে না, সকলেই তাঁকে 'মা' ব'লে ডাকে।" রাজেশ্বরী দেবী এই বিবরণ শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি বলিলেন "আমার ভাগ্যে এ মাতৃ দর্শন ঘটবে না?" "ঘটবে না কেন? আমি যে সকলেরই মা।" এই কথা বলিতে বলিতে 'মা' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার অমনি প্রণাম করিলেন। 'মা' হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার ছেলেকে আমি নিয়েছি, আর তোমায় ভার বহন কর্‌তে হবে না। তোমার ছেলে বড় ভাল, এমন ছেলে তুমি যে গর্ভে ধারণ করেছ, ইহাতে তুমি সৌভাগ্যবতী। আর তোমার পুত্রের আদরের সুধাকে আমি নিয়ে এসেছি। বৎস, নিশ্চিন্ত হও, সুধা এখন আমার নিকট আছে, আর কোন ভয়ের কারণ নাই।" রাজেশ্বরী দেবী এই সব কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কুমারের মুখখানি সুধার কথায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহার মা কি মনে কর্‌বেন? তিনি বড় লজ্জিত হইলেন, চক্ষু দুটী অন্যদিকে ফিরাইলেন। রাজেশ্বরী দেবী 'মাকে' প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন, তিনি সেই রূপরাশি নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "নিশ্চয়ই কোন দেবী।" তখন চৈতন্য হইল, তিনি পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মা বলিলেন "দেবি, তোমার আর প্রণাম কর্‌তে হবে না। আমি বাহ্যিক আড়ম্বর ভালবাসি না। মোট কথা, তোমার গুরুদেব তোমাদের উপর খুব সন্তুষ্ট। তিনি দেব, তাঁহার সন্তোষে জগৎ সন্তুষ্ট, অতএব আমিও সন্তুষ্ট। আমি সর্ব্বদা নাচিয়া খেলিয়া বেড়াই, সংসারের কোন ধার ধারি না। অথচ সংসার আমারই। আমাকে সকলে 'মা' বলে, আমিও সকলকে 'মা' বলি। 'মা' ডাক্ বড় মিষ্ট। এমন সুমধুর ডাক্ পৃথিবীতে নাই, তাই 'মা' নাম এত ভালবাসি। ভগবানকে 'মা' বলে ডাকলে যত সন্তুষ্ট, আর কিছুতেই এত সন্তুষ্ট নহে। তোমার ছেলে

'মা' বলে ডাকে, আমি বড় খুসী। আজ তোমাকে দেখ্‌তে এলেম। রাজকন্যাদের বিবাহ, তোমার ছেলে খুব পরিশ্রম কচ্ছে। তোমার ছেলের বিবাহে আমি উপস্থিত থাকব, বৌ বরণ ক'রে ঘরে নিব। বৌ ত আমার কাছেই আছে, লক্ষ্মী স্বরূপিনী মেয়ে, তোমায় আর ভাব্‌তে হবে না। তুমি তাকে দেখ নাই, একদিন দেখ্‌তে পাবে।" তাবপর কুমারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"বৎস, আমি চল্‌লেম, তুমি নিশ্চিন্ত হও। সুধার জন্য তোমায় লজ্জিত হ'তে হবে না। তোমার মাতুল ও মা উভয়ে এক মত হ'য়ে তোমার বিবাহ দিবেন। এখনও সময় হয় নাই। সম্মুখে তোমাদের বড় বিপদ, সে বিপদ হ'তে উদ্ধার হওয়া কঠিন, যদি স্বয়ং মাধব রক্ষা করেন। তোমার গুরুদেব তোমার ভার গ্রহণ করেছেন, এমন গুরুদেব আর পাবে না।" দেখিতে দেখিতে দেবী চলিয়া গেলেন। তখন রাজ্যেশ্বরী দেবী বলিলেন "ইনি কে? দেবী না মায়াবী?" এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভ পরিণয়।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে গোপী-চাঁদের বিবাহ স্থির হইল, এবং ঢাকা সহর হইতে সুকুমারকে আনিতে লোক গেল। ঢোলে "ঢাকে" সহরময়, আজ্ঞায় আজ্ঞায় প্রতি বাড়ীর দোরে পত্রপুষ্প শোভিত দ্বার, সৈন্যদের সমাবেশ, অশ্বারোহিদের গতিবিধি, ভৃত্যদের ছুটাছুটি, সবই যেন বিবাহের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। দলে দলে ভিক্ষুক, সম্ভ্রান্ত লোক, অতিথি, ব্রাহ্মণগণ, রাজধানীতে আগমন করিতে লাগিল। রাজধানী যেন আনন্দে মাতোয়ারা। রাজা বলিয়া দিয়াছেন, সমগ্র প্রজারা বিবাহের দিন আহার পাইবে।

সন্ধ্যার পর বর আসিয়া পৌঁছিলেন, সঙ্গে কর্ম্মচারিবৃন্দ, সৈন্যগণ, ও ভৃত্যমণ্ডলী। রাজা ইহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাদের বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং আহারাদির সুবন্দোবস্ত হইল।

রাত্রি এক প্রহর গতে শুভ লগ্ন, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ আসন গ্রহণ করিলেন। বিবাহ কার্য্য যথাবিহিতরূপে সুসম্পন্ন হইল। রাজা দুই কন্যাই কুমার গোপীচাঁদকে অর্পণ করিলেন। কয়েকদিন খুব আমোদে রাজধানী মত্ত হইল, আবালবৃদ্ধবনিতা নৃত্যগীতাদিতে যোগদান করিল। কয়েক দিন পরেই কুমার গোপীচাঁদ স্ত্রী দুটিকে লইয়া নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। রাণী ময়নামতী পুত্রবধূ ঘরে বরণ করিয়া তুলিলেন, তাঁহার আর অনন্দ ধরে না, তিনি মনে করিলেন, এতদিনে পুত্র রীতিমত সংসারে আবদ্ধ হইল। কিন্তু এক চিন্তা দূর হইল না, পুত্রের বিপদ সম্মুখে, সন্ন্যাসী স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন। যদি এই পুত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সংসার ত্যাগ না করে তবে জীবন সংশয়। এই কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখ মলিন হইল। এই বৌদের দশা কি হইবে? বিবাহ না দেওয়াই উচিত ছিল, এই চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া বৃশ্চিকবৎ

তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের অধিক বিলম্ব নাই, কি যে হইবে ভাবিয়া আকুল হইলেন। বৌদের রূপে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ চিন্তা আসিয়া সে আনন্দের স্রোতে বাধা দিল। অবশেষে মনে মনে করিলেন "যা হবার হবে, সেজন্য ভেবে কি হবে? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হবেই, আমরা উপলক্ষ মাত্র। নির্ব্বোধের ন্যায় আর চিন্তা করব না। এখন বৌদের আদর করে সংসার আরম্ভ করি, যখন সংসার ভাঙ্‌বে, তখন বুঝা যাবে।"

রাজা মানিকচাঁদ পুত্রবধূদ্বয়ের মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। কিন্তু তিনি কাতর, অধিক আনন্দে যোগদান করিতে পারিলেন না। তিনিও হরিদাস বাবার মুখে পুত্রের বিপদের কথা শুনিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যে কি হইবে ভাবিয়া আকুল হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদযুগল ধরিয়া কাঁদিবেন স্থির করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের চিহ্ন।

সরস্বতী একটী আম্রবৃক্ষমূলে নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। সে নির্জ্জন স্থানই অধিক ভালবাসে, অন্তঃপুরে অধিকক্ষণ থাকে না। রাজান্তঃপুরের সকলের ধারণা সরস্বতী পাগল, অতএব তাহাকে কেহ কিছু বলিত না। সরস্বতী সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত। কখন অন্তঃপুরে, কখন উদ্যানে, কখন আম্র-কাননে, কখন বা বনের মধ্যে। সে কাহাকেও ভয় করিত না, কাহাকেও কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইত না, লজ্জা কি তাহা জানিত না। সে কোন সময় রাজ্যেশ্বরী দেবীর নিকট যাইয়া আব্‌দার করিত, কখনও বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া রাজকন্যাদ্বয়কে অস্থির করিয়া তুলিত। সরস্বতী বড় সরলা ছিল, তাহার নিকট বড়-ছোট ছিল না, সে সকলকেই সমান-ভাবে দেখিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সরস্বতী ভয়ঙ্কর মুখরা; কেবল এক স্থানে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না, সে কুমার দামোদরের নিকট। সে যতই চেষ্টা করিত, কিছুতেই কুমারের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না।

অদ্য সন্ধ্যার সময় আম্রকাননে বসিয়া কুমার দামোদরের বিষয় ভাবিতেছে। "বামন হ'য়ে চাঁদে হাত কেন? আমার ন্যায় লোকের সে আশা বৃথা। তবে আমার প্রাণ দিয়ে যদি কুমারের উপকার হয় তা কর্‌বো। আমার প্রাণের মূল্য কি? কুমারের কত মূল্যবান প্রাণ।" এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি উপস্থিত হইল। সরস্বতীর সে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে এই প্রীতিকর চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। দুটি একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশ খচিত করিল। বৃক্ষের নীচে বসিয়া সরস্বতী বুঝিতে পারিল না কত রাত্রি হইয়াছে। তথাপি সে উঠিল, ধীরে ধীরে রাজবাটী অভিমুখে রওনা হইল। এই আম্র-কানন হইতে রাজবাটী অনেক দূরে, মধ্যে একটী প্রান্তর, সরস্বতী নির্ভয়ে প্রান্তর পার হইতে লাগিল। অর্থাৎ সে একটী [illegible]

পাইল, অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি অশ্ব মৃতাবস্থায় পতিত আছে, নিকটে অন্য কেহ নাই। তখন সরস্বতীর সন্দেহ হইল, সে অনু-মানে এক দিকে চলিল। তাহার কোমরে যে একখানি অসি বস্ত্রে লুক্কায়িত ছিল, তাহা সে বাহির করিয়া হস্তে লইল এবং নির্ভয়ে প্রান্তর পার হইতে লাগিল। আর কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, একজন লোক অন্তিম দশায় পরিণত। সরস্বতী তাহার মুখের নিকট গিয়া বসিল, চিনিতে পারিল না, কারণ সে সময় অন্ধ-কার আকাশে শশাঙ্ক উদয় হয় নাই। সরস্বতী তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে হস্ত দিল, দেখিল একখণ্ড লিপি আছে, তাহা বাহির করিয়া লইয়া সরস্বতী আবার রওনা হইল। এ ব্যক্তির জীবনের আশা নাই, বোধ হয় দুই এক মিনিটের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিবে, অতএব আর তথায় অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিল। আরও কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি অশ্বের সরঞ্জাম পতিত আছে। তখন সরস্বতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কতক দূর গেলে অনেকগুলি অশ্বের পদ-শব্দ শুনা গেল, সরস্বতী তখন প্রান্তর পার হইয়া একটি বনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সরস্বতী এখন গাছের আড়ালে আড়ালে উঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিল। বনের মধ্যে অশ্বারোহী-দল প্রবেশ করিল। সরস্বতী সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিল একটি ভগ্ন অট্টালিকার নিকট [illegible], তারপর আর অশ্বারোহীদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না, হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। যে স্থানে ঐ লোকগুলি দাঁড়াইয়াছিল, সে স্থানে সরস্বতী গেল, কিন্তু কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, সরস্বতী অবাক হইয়া গেল। সে সেই ভগ্ন অট্টালিকার নানা স্থানে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশ্রান্ত হইয়া এক স্থানে উপবেশন করিল। সরস্বতী মনে মনে বলিল, একি? হঠাৎ ইহারা কোথায় লুকাইল? আমার চক্ষুর ভ্রম হইল। অথবা ইহারা মনুষ্য নহে?" তাহার মনে কিন্তু কোন ভয়ের সঞ্চার হইল না, সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হটাৎ সরস্বতীর তন্দ্রার আবেশ হইল, যাহাতে নিদ্রা না আসে সে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার দাঁড়াইল, একবার এদিক ওদিক পদসঞ্চালন করিল, কিন্তু নিদ্রার আবেগ ত্যাগ হইল না। সরস্বতী আবার বসিল, এবং বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। ক্রমে যেন তাহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল, সে মৃত্তিকার উপরেই শয়ন করিল ও নিদ্রিত হইয়া পড়িল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিল সে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে খট্টার উপরে শয়ন করিয়া আছে, ক্ষুদ্র একটি আলো মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-শয্যায়।

রাজা মানিকচাঁদ অন্তিম-শয্যায় শায়িত। রাজা ভয়ানক পীড়িত, বড় বড় সুচিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতেছে, কিন্তু জীবনের আশা

বড় কম। রাণী ময়নামতী চক্ষুর জল ফেলিয়া অন্য প্রকোষ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের বিবাহের পরই এই ঘটনা, পুত্র বিবাহিত হইয়া পিতার শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট, বিবাহের আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না। সভাসদ-গণ এক একবার আসিতেছেন, আবার চলিয়া যাইতেছেন, সকলেই বিষণ্ণ। অদ্য রাজবাটী যেন দুঃখভারে পরিপূর্ণ। রাজাও বুঝিয়া-ছিলেন আর অধিক দিন পৃথিবীর সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না, তাই তিনি পুত্রকে কতকগুলি সদুপদেশ দিলেন এবং বলিয়া গেলেন—এ সময়ে তোমার বড় বিপদ, সাবধান! আমার মৃত্যুতে অনেকে সুযোগ পাবে, শত্রুপক্ষ মস্তক উত্তোলন কর্‌বে। আর এক বিপদ তোমার সম্মুখে ঝুল্‌ছে, গুরুদেব তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কর্‌বেন। আমাদের এ পৃথিবীতে কোন হাত নাই। ভগবান যাহা কর্‌বেন—তাহাই হবে। আমার স্বর্গ গমনে কোনরূপ শোক করো না, সকলকেই এক দিন তথায় যেতে হবে, এতে শোকের কারণ নাই। আমারা সেই পরম পিতার নিকট যাবো, ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কি আছে? তুমি দৃঢ় হস্তে রাজ্য শাসন কর্‌বে, সর্ব্বদাই রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ কর্‌বে। তিনি বুদ্ধিমান লোক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হ'লে তোমার সুমঙ্গল হওয়ারই সম্ভাবনা। তুমি শোকে বিহ্বল হ'য়ো না, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ো না।" পুত্রকে উপদেশ দিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, বাহিরে অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অতএব অন্ধকার ঘনীভূত। কয়েক দিন পরিশ্রমে রাজবাটীর সকলেই ক্লান্ত ও নিদ্রিত। রাজা মানিকচাঁদ শয্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার আর নিদ্রা নাই। রাণী ময়নামতী পাদদেশে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন, এবং ঘন্টায় ঘন্টায় ঔষধ সেবন করাইতেছেন। কুমার গোপীচাঁদ এতক্ষণ থাকিয়া মাতার আদেশানুসারে অপর কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। পুত্রবধূদ্বয় এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, রাণীর কথামত অন্য গৃহে গিয়া গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘরে আর কেহই নাই। রাণী ক্রমাগত নিদ্রার সঙ্গে লড়াই করিতেছেন। ক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়া রাণীর শরীরও ভাল নাই, তিনি দাসদাসীগণকে রাজার নিকট রাত্রে আসিতে দেন না, নিজেই থাকেন। স্ত্রীর স্বামীসেবা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত—ইহা তিনি জানিতেন। অদ্য কিছু জোর করিয়া ঘুমকে বাধা দিতে হইতেছে। এরূপ তাঁহার কখনও হয় নাই। তিনি একবার উঠিয়া চারিদিকে বেড়াইলেন, আবার আসিয়া উপবেশন করিলেন। কিছুতেই নিদ্রার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না, একবার মৃত্তিকায় শয়ন করিলেন, মনে করিলেন অল্পক্ষণ শুইয়াই উঠিবেন, কিন্তু তাহা হইল না, তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগি-লেন। এই সময় রাজা একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তখনও রাজার জ্ঞান [illegible] ছিল। তিনি একখানি ছবির প্রতি [illegible] করিলেন, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"গুরুদেব। আর কত দিন এ পৃথিবীর দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বো, কবে আপনি এসে আমাকে মুক্ত কর্‌বেন। ঐ পদযুগল আমার মস্তকে না দিলে এ প্রাণ যে বহির্গত হবে না, আপনার আগমনের এত বিলম্ব হচ্চে কেন? আমি কি এতই পাপী যে আমার কর্ম্মসূত্র এখনও খণ্ডন হয় নাই? আসুন, দয়াময়. আমাকে উদ্ধার করুন। আমার কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই। আমি রাজ্য চাই না, স্ত্রী চাই না, পুত্র চাই না, ধন চাই না, জন চাই না, সকল বিষয়েই আমার নিবৃত্তি হইয়াছে, এক বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এখন হৃদয়ে জাগরূক, সে আকাঙ্ক্ষা আপনি আসিয়া পূর্ণ করুন। এই ত প্রকৃত সময়, একবার পদযুগল আমার মস্তকে দিন।" হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ হইল,—"বৎস। প্রস্তুত হও, তোমার সময় আগত।" এই শব্দে রাজার মন পুলকিত হইল, তিনি দেখিলেন হরিদাস বাবা মস্তকের নিকট দণ্ডায়মান। রাজা বলিলেন,—"গুরুদেব! আমার মস্তকে পদযুগল প্রদান করুন।" গুরুদেব বলিলেন— "সংসারের বাসনা তৃপ্তি হ'য়েছে? এখন চল, যেখানে শোক নাই, তাপ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, সদাই আনন্দ, সদাই প্রফুল্লতা বিরাজিত, এস বৎস, আমার কোলে এস, আর কোন বিষয় তোমায় ভাব্‌তে হবে না। তোমার উপযুক্ত পুত্র এখন সংসার করুক, তুমি পরম পিতার নিকট চ'লে এস।" সন্ন্যাসী পদযুগল রাজার মস্তকে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল। সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইল না, এই সময় রাজা সকলকে ফাঁকি দিয়া অন্তিম প্রযান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুধার হাসি।

চাঁদের হাসির সঙ্গে সঙ্গে সুধার হাসি মিশিয়াছে। আজ সুধা বড় প্রফুল্ল, সে তাহার মাকে পাইয়াছে, আবার নিজ বাটীতে আসিয়াছে। আবার সেই ক্ষুদ্র উদ্যানে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে আলো করিতেছে, অপেক্ষায় আছে সেই যুবক পুনরায় আসিবে। সুধা মায়ের কৃপায় মাকে পাইয়াছে, কত গল্প করিতেছে, কত আনন্দ করিতেছে। আবার হরনাথ আসিয়া জুটিল। হরনাথ বহুস্থান অন্বেষণ করিয়া সুধাকে না পাইয়া আবার এইস্থানে আসিল, আসিয়া দেখিল সুধা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। হরনাথ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আবার সকলে একত্র হইল, কিন্তু সে যুবক কোথায়? তাই আজ জ্যোৎস্নালোকে উদ্যানে দাঁড়াইয়া সুধা যুবকের অপেক্ষা করিতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল কিন্তু আশা পূরিল কই? তবে কি সে সুধাকে ভুলিয়াছে? তবে কি যুবকের কোন বিপদ হইল? এই সব চিন্তা তাহার হৃদয়ে উদয় হইল। সে ভুলিয়াছে, এই কথা মনে করিতে তাহার বড় কষ্ট হইল। এক বিন্দু অশ্রু তাহার নয়ন কোণে দেখা দিল। সুধা একটি অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া—অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় তাহার আঁচা

আসিয়া ডাকিলেন,—"সুধা!" সুধা চমকিয়া উঠিল। তাহার মা বলিলেন,—"সুধা, এত রাত্রি হইয়াছে, তবুও এখানে কেন? অসুখ হবে যে মা!', সুধা উত্তর করিল,—"না মা, অসুখ হবে না, আমার অভ্যাস আছে।" মা বলিলেন,—"সুধা, তোকে যিনি রক্ষা কর্‌লেন তিনি কে?" সুধা হাসিয়া বলিল,—"আমি কেমন করে তাঁকে চিন্‌বো। তিনি সকলের মা। আমি 'মা' বলে ডেকেছি, সকলেই তাঁকে 'মা' বলে। এমন সুন্দরী আমি আর কখনও দেখি নাই, এমন মিষ্ট কথা আর কখন শুনি নাই। এমন ভাবও আর কোথাও দেখি নাই। মা যথার্থই জগজ্জননী। সকলের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, কিন্তু সর্ব্বদাই হাস্যমুখ। তিনি না থাকলে আমার জীবন রক্ষা হ'ত না। সুধার মা এই সকল বিবরণ শুনিয়া জগন্মাতাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু তিনি কোথায়? যেখানে বিপদ, যেখানে দুঃখ, যেখানে কষ্ট, যেখানে শোক, যেখানে তাপ, যেইখানেই তিনি মাতৃরূপে উপস্থিত। তিনি ধনীর নিকট যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন না, কিন্তু যখন সে ধনী কষ্টে বা বিপদে পতিত হয়, তখন তিনি সেখানে যান। নিজের সুখ জ্ঞান নাই, নিজের কষ্ট জ্ঞান নাই, সর্ব্বদাই পরদুঃখকাতর। সুধার মাতা তখন ডাকিয়াও দেখা পাইলেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত ভক্তি হইল। সুধার মা তখন কন্যাকে ডাকিয়া গৃহের অভ্যন্তরে গেলেন। সুধা ভাবিলেন আর তিনি আসিবেন না, তিনি এ দুঃখিনীকে ভুলিয়াছেন, হয়ত তিনি এখানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন—ইহারা এস্থানে আর নাই, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, অতএব আর আসিবেন না। সুধা তাঁহার পরিচয় জানে না, কেমন করিয়া খবর দিবে? তথাপি সে দুঃখিত নহে, ভগবান যখন তাহাকে এত বড় বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই চরণে আশ্রয় দিবেন। সুধার মুখে হাসি দেখা দিল। সে জোড়হস্তে ভগবানকে প্রণাম করিল এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিল। ইহার পরই তাহার মনের কষ্ট দূর হইল, তাহার মনে হইল যেন তিনি তাহার অঙ্গুলি গ্রহণ করিয়াছেন। সুধার মাতা বলিলেন,—"মা, তোমাকে আজ এত অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন?" সুধা বলিল,—"মা, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির কথা ভাব্‌ছিলেম।" মা ও মেয়ের আর কোন কথা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য নষ্ট।

রাজা মানিকচাঁদের মৃত্যু হইলে রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাণী ময়নামতী শোকে ম্রিয়মানা হইলেন না, তিনি রাজ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কুমার গোপীচাঁদ রাজ্য পাইলেন। এই সুযোগে রাজা ধর্ম্মপাল ভবসাধন রায়ের পরামর্শ মত এই রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাণী দুর্গাবতী বড় লজ্জিত হইলেন, এই বিপদের সময় সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের রাজ্য আক্রমণ—বড় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। কিন্ত

রাণীর কথা কে শুনে? রাজা ধর্ম্মপাল সসৈন্যে গোপীচাঁদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং অনায়াসে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য দখল করিলেন। রাণী ময়নামতী পুত্র-সহ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রাজা ধর্ম্মপাল এই সিংহাসনে আরোহন করিয়া তাঁহার নিজ রাজ্য ইহার সঙ্গে যুক্ত করিলেন। রাজা ধর্ম্মপালের ব্যবহারে সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। প্রজারা মানিকচাঁদকে যেরূপ ভক্তি করিত, সেরূপ ভক্তি ধর্ম্মপালের প্রতি আসিল না। ধর্ম্মপাল ইহাদের মনের ভাব বুঝিয়া সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, ভক্তি না করুক—ভয় করুক—এই তাঁহার অভিলাষ হইল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র জামাতার এই রাজ্য হানির বিষয় শুনিলেন। এই অবিচারের কথা শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে একটা বিপদ ঘটিল—কুমার দামোদর কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। রাজা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুমারের কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। কুমার দামোদর সাহসী যোদ্ধা এবং বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ তিনি রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। এ সময়ে তিনি কোথায় গেলেন, রাজা ভয়ানক চিন্তিত হইলেন। তিনি রাজ্যেশ্বরী দেবীর নিকট স্বয়ং গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন খবরই পাইলেন না। কুমারের নিরুদ্দেশে রাজ্যেশ্বরী দেবীও বড় ভাবিত হইলেন। চারিদিকে লোক প্রেরণ করা হইল, কিন্তু সকলেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। রাজা অভাগিনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মায়ের প্রাণে সে সান্ত্বনা স্থান পাইল না। আর একটী বিষয়ের জন্য সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল সরস্বতীকে কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা ধর্ম্মপাল সিংহাসনে বসিয়াই ভব-সাধন রায়কে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, এবং তাঁহাকে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দিলেন। ভবসাধন রায় বলিলেন,—যে আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই, পুনরায় গোপীচাঁদ রাজ্যো-দ্ধারের চেষ্টা করবে। রাণী ময়নামতীও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সাহসী স্ত্রীলোক, রাণী কি করেন বলা যায় না। রাজা ধর্ম্মপাল একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে বৃদ্ধবয়সে মন্ত্রীর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজা প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, এবং কাহাকে কাহাকে পুরস্কারও দিতে লাগিলেন। রাজ্যের লোকেরা তাহাতে ভুলিল না। তাহারা গোপনে গোপনে গোপীচাঁদকে সাহায্য করিবে এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইল।

রাণী এক দিন নির্জ্জনে পাইয়া রাজাকে বলিলেন,—"এ কাজ কি ভাল হ'ল? ধর্ম্মে সহিবে না। ভগবানের রাজ্যে এখনও ন্যায় অন্যায়ের বিচার আছে। কোথায় তুমি গোপী-চাঁদকে এ সময় রক্ষা করবে, সে পিতৃহীন, তা না ক'রে তুমি তার রাজ্য নিলে, তাকে তাড়ায়ে দিলে, আমার ভগিনীকে নির্ব্বাসিত করলে। ইহার ফল ভোগ করতে হবে। আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সঙ্গে আমারও উত্থান-পতন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ✳ জনৈক

চক্র তুমি কি বুঝবে. সেই চক্রে তুমি ঘুরছ। আমি জানি আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তুমিই বা কি করবে।" রাজা বড় চিন্তিত হইলেন. তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"তোমার বুদ্ধি মত কি আমি চলবো? স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে চলে তার মত নির্ব্বোধ জগতে নাই। তুমি রাজ-রাণী হ'য়েছ, বসে বসে খাও, আমাকে তোমার বক্তৃতার দ্বারা বিরক্ত করো না।" রাণী শুনিলেন, আর কোন উত্তর করিলেন না। বুঝিলেন—'মরণ সময়ে বিপরীত বুদ্ধি।' নির্জ্জনে এক বিন্দু অশ্রু ফেলিলেন। বলিলেন,—"ভগবন্, আমার স্বামীর সুমতী দেও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দী কে?

সরস্বতী দেখিল ক্ষুদ্র একটি কক্ষে সে আবদ্ধ, তখন সে শয্যা হইতে উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। দ্বার বাহির হইতে বদ্ধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি বাতায়ন দুদিকে আছে, তাহাতে বড় বড় লৌহ শিক্ দেওয়া, সহজে বাহির হওয়ার উপায় নাই। সরস্বতী দেউলগুলি ভাল করিয়া দেখিল, কিন্তু পলাইবার কোন পথ দেখিল না। আবার আসিয়া শয্যায় শয়ন করিল। ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে পলাইতে পারে। রাস্তায় যে মৃত অশ্ব ইত্যাদি দেখিয়াছে, তাহারই বা অর্থ কি? সে ভগ্ন অট্টালিকায় ঘুমাইয়াছিল, এখানে তাহাকে কে আনিল? সবই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। সরস্বতী চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। এ কক্ষে বসিয়া দিবারাত্রি ভেদ করা কঠিন, সর্ব্বদাই অন্ধকার। জানালার ফাঁক দিয়া, একটু একটু আলো প্রবেশ করিতেছে। এ বাড়ী কি ভূগর্ভস্থ? সরস্বতী বুঝিতে পারিল না, তথাপি তাহার সন্দেহ হইল। কিন্তু সরস্বতীর মনে কোনরূপ ভয় হইল না। সে জানে তাহার কোন শত্রু পৃথিবীতে নাই, বিশেষতঃ তাহার অনিষ্ট করিয়া লোকেরই লাভ কি? সরস্বতী দেখিল তাহার আহার্য্য উপর হইতে রশি যোগে নামিয়া আসিতেছে। থালা ঘরের মেঝায় স্থাপিত হইল, রশিটি উপরে উঠিয়া গেল। সরস্বতী থালাখানায় নানারূপ মিষ্টান্ন, ফলমূল, পানীয়, দেখিতে পাইল। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, অতএব সে সবগুলি আহার করিল, তারপর আবার শয়ন করিল। সে নিদ্রার ভাণ করিয়া রহিল, কিন্তু কোন লোকই আসিল না। গৃহে একটী আলোক উপর হইতে ঝুলিতে লাগিল, তাহাতেই সরস্বতী অনুমান করিল—রাত্রি হইয়াছে। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিল—একটী গর্ত্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে। সে বুঝিল—এখন সে বন্দিনী। পলায়নের উপায় কি? এভাবে যে সে অধিক দিন জীবিত থাকিবে না—তাহা নিশ্চিত। বনের বিহঙ্গ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিলে যেমন ছটফট্ করে, সরস্বতীর পক্ষেও তাহাই হইল। ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া একস্থানে উপবেশন করিল। তাহার

বোধ হইল সে স্থানের ইষ্টক যেন সরিয়া যাইতেছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সরস্বতী হস্ত দ্বারা ইষ্টকখানি নাড়িল, ইষ্টক সরিয়া গেল। এইভাবে আরও তিনখানা ইষ্টক সরিয়া গেল,তখন একটী গহ্বর দেখা গেল। ভয়ানক অন্ধকার, নামিতে ভয় হয়; কিন্তু সরস্বতী নির্ভয়, তাহার প্রাণের মমতা নাই। সে মরিলে কাহারও ত কোন কষ্ট হইবে না, এবং তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের মূল্যই বা কি? সে প্রথমতঃ বাম পদ দিল, তারপর দক্ষিণ পদ দিল, তৎপর সমস্ত শরীর ঐ গহ্বরে প্রবেশ করাইল। একখানি ইষ্টক ধরিয়াছিল, তদবলম্বনে কতক্ষণ থাকা যায়? হস্ত শিথিল হইল, সে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া অচেতন হইল। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না, যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল সে অর্দ্ধেক জলে ও অর্দ্ধেক স্থলে পতিত আছে। যদি জলের মধ্যে সম্পূর্ণ শরীর পতিত হইত, তবে জীবনের আশা ছিল না। তারপর সে উঠিয়া বসিল, স্থানটি পুতিগন্ধময়। অধিক্ষণ এ অবস্থায় থাকিলে বাঁচিবার আশা নাই, এবং উপরে উঠিবারও উপায় নাই, তখন সে সাহসে নির্ভর করিয়া হস্ত দ্বারা স্থান নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে স্থানে জল ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে চলিল। যাইতে যাইতে একটি আলোক শিখা দেখিতে পাইল, সে শিখা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কতক দূর গিয়া দেখিল—ভয়ানক দৃশ্য! সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। একটি আলো জ্বলিতেছে, নিকটেই একটি নরকঙ্কাল ঝুলিয়া আছে। প্রথমতঃ সরস্বতী ঐটাকে পিশাচ মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিল, এখন নিকটবর্ত্তী হইয়া সে ভয় দূর হইল। নরকঙ্কাল এক একবার বায়ুতে কড়্মড়্ করিয়া শব্দ হইতেছে। সরস্বতী সে স্থানে বসিল, একদৃষ্টে মনুষ্যের পরিণাম দেখিল, এবং একবার সে বিষয় ভাবিল। এই সময় বড় বড় অক্ষরে সে স্থানে লেখা আছে—"মনুষ্যের পরিণাম দেখ, সাবধান হও।" ইহা দেখিয়া—এ কাহার বাটী, এ আলো কোথা হইতে আসিল, কে এ নরকঙ্কাল এভাবে রাখিয়াছে, কে বড় বড় অক্ষরে ঐ বিষয়টী লিখিয়া রাখিয়াছে, চিন্তা করিবার বিষয় বটে। সরস্বতী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতক দূর গিয়া দেখিল উপরে যাইবার সিঁড়ি, সে আনন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উঠিয়া দেখিল একটি বৃহৎ কক্ষ, তাহাতে তিনচারি জন লোক বসিয়া গল্প করিতেছে। এবার সরস্বতীর ভয় হইল, যদি ইহারা টের পায়, তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বধ করিবে। সরস্বতী সে কক্ষে প্রবেশ করিল না, অন্যদিকে যাইতে লাগিল। একটী ঘরের বাহির হইতে তালা বন্ধ. সরস্বতী সেই স্থানে দাঁড়াইল। সে স্থানে কোন প্রহরী ছিল না, সরস্বতী তালা খুলিতে চেষ্টা করিল। তাকাইয়া দেখিল একটি স্থানে কয়েকটী চাবি ঝুলিতেছে, সে ঐ সব চাবি আনিয়া তালা খুলিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল একটি লোক শয়ন করিয়া আছে। বোধ হইল সে ব্যক্তি নিদ্রিত।

সরস্বতী এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র একটী আলো এক কোণে জ্বলিতেছে কিন্তু বন্দী আলোর বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিয়াছিল, চিনিবার উপায় নাই। সরস্বতী ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে গেল, মুখে আঁধার পড়াতে চিনিবার উপায় নাই, বোধ হয় অপরিচিত, ইহার জন্য এত মাথা ব্যথাই বা কেন? সরস্বতীর কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয় সেকথা মানিল না, সে আলোর দিকে গিয়া একটু শব্দ করিল, বন্দী চকিতের ন্যায় মুখ ফিরাইল। সরস্বতী চমকিয়া উঠিল, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। দেখিল বন্দী স্বয়ং "কুমার দামোদর।"

শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ।

অপরের দ্রব্য।

সূর্য্যের কিরণ নিয়া চন্দ্রের বিভব।
হরির করুণা নিয়া ভক্তের গৌরব॥
দরিদ্রের অর্থ নিয়া ধনীর গরিমা।
একের জিনিষ নিয়া অন্যের মহিমা॥

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

গৃহ-লক্ষ্মী।

হাসি মুখে সদা বুকে প্রীতি লয়ে
গৃহ আলো করি রহে।
সুখ, দুঃখ, ধন, মান অপমান
কিছুই সে নাহি চাহে।
আধপেটা খেয়ে আপনার মনে
আপনার কাজ করে।
জানেনা কখন ক্রোধ কারে বলে
নারী বাঙ্গালীর ঘরে।
ছিন্ন মলিন বসনেতে ঢাকি'
আপনার দেহখানি,
তোষে অপরের মন সদা আহা
বরষি' মধুর বাণী।
মনে হয় যেন ছিন্ন বসন
উপরের আবরণ—
ভিতরে তাহার মনোহর বেশে
সজ্জিত আছে মন।
কভু প্রিয়া হয়ে স্বামীর সেবায়
পাত করে স্বীয় দেহ
ভগিনী সাজিয়া কভু আলো করে
রমণী পিতার গেহ।
তখন জননী 'দশভুজা যেন'
বক্ষে আপন ছেলে
দশদিকে যায় আপদ ঠেলিয়া
অসীম স্নেহের বলে।
আহারে বিহারে ত্যাগী শতগুণে
মানব তোমার চেয়ে
সেই—তবু তুমি দেবতা তাহার,
চরণ তলে সে শুয়ে!
সকলের সুখে সুখ মনে করে;
দুঃখ সকলের দুখে!
স্বার্থপরতা নাহি যায় লেশ
প্রীত সদা ত্যাগ-সুখে।
সেই বাঙ্গালীর গৃহের লক্ষ্মী
স্বরগের দান সেই।
ত্যাগে ও ধর্ম্মে ক্ষমা মহত্বে
যাহার তুলনা নাই।
শান্তি যেথায় চির বিরাজিতা;
প্রেম যেথা ভাসমান।
শত আনন্দের শত বাহু ব্যথা
যার বলে হয় ক্ষীণ!
চাহি না অর্থ, অপর সম্বল
দাও প্রভো এই বর
জনমে জনমে পাই যেন সদা
এমন মধুর ঘর।

শ্রীসুধীরেন্দ্র কুমার সান্যাল।

ESTABLISHED 130[illegible] B. S.

একবিংশ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৪। [১১শ সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমা[illegible]

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রী[illegible] গোস্বামী, এম্‌, এ।

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১।০ টাকা।

1918.

হাওড়া, ৩ নং [illegible] রোড, কর্মযোগ প্রেস হইতে শ্রী[illegible] সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলোচনার প্রধান পরিচালক

কলিকাতা পোস্তার রাজবাটীর বদান্যবর

কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর।

২৫নং দরমাহাট্টা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচনার লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহ রায় এম, এ বি, এল—১২৩২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ম্মযোগ প্রেস—হাওড়া। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র রায় বি, এল মণ্ডলা সি, প। শ্রীযদেন্দ্র মোহন ঠাকুর, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম কাব্যনিধি—পোঃ হালুয়া- ঘাট আড়াই আনীর কাছারী, ময়মনসিংহ। শ্রীযোগেন্দ্র মোহন বিশ্বাস, খাড়ুয়া—ময়মনসিংহ। শ্রীমনীষীমোহন রায় কলিকাতা। শ্রীগদাধর চক্রবর্ত্তী, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীতারিণীচরণ রায়, রামঠেঙ্গা, জলপাইগুড়ি। শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস, দুমকা। শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায় The Bower. Pan Bazar. Gouhati. শ্রীঅতুলাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকা, খুলনা। প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক, পোঃ নবদ্বীপপুর, নদিয়া। শ্রীবলাইলাল মুনসী, বাঁটরা।

নগদ ১০০৲ টাকা পুরস্কার!

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট গল্প, কবিতা, নক্সা, ব্যঙ্গ প্রবন্ধ রচনার জন্য—এই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। রচনা হাস্যোজ্জ্বল কিম্বা করুণ রসাত্মক অথচ মৌলিক হওয়া আবশ্যক—উহার মধ্যে সংক্ষেপে,

উপমাহীন কেশতৈল

নিরুপমা

নামক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কেশ-তৈলের কৌশলে উল্লেখ থাকা চাই। অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা বিজ্ঞাপনযুক্ত গল্প গৃহীত হইবে না। রচনা আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক। রচনা প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে না—যাঁহারা রচনা পৌঁছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন, তাঁহারা রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন। নমুনা ও পুরস্কার রচনার নিয়মাবলী /০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে—প্রেরিত হয়। নিরুপমা উৎকৃষ্ট চামিলী তৈলে প্রস্তুত অন্যান্য আধুনিক সুলভ কেশ-তৈলের মত ইহা মিনারেল অয়েল বা গন্ধহীন কেরোসিন তৈলে প্রস্তুত নহে। পরিমাণে ইহা অন্যান্য তৈলাপেক্ষা অনেক অধিক অথচ মূল্য ১৲ টাকা, ডজন ৯৲ টাকা, প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র। সন ১৩২৪শের "নিরুপমা পুরস্কার" নামক গল্প গ্রন্থ এখনও নিরুপমার ক্রেতাগণকে উপহার দেওয়া হইবে। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

সোল এজেন্ট—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৬৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৪ সাল।

বসন্ত-পঞ্চমী।

এস মাগো বীণাপাণি ! কনক-কমল দামে,
এস মা সারদারাণী ! এস মা গো বিশ্বরমে।
"বসন্ত-পঞ্চমী" আজি,—এস মা কমলেশ্বরি।
হৃদয়-পঙ্কজাসনে লইব তোমায় বরি'।
ফুটন্ত বাসন্তী মা গো,—শোভে চন্দ্র নীলাম্বরে,
এস মা বরদা দেবি ! রাখি পদ পদ্ম'পরে।
রাতুল চরণে মোরা দিব ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
অবিদ্যা নাশিতে দেবি, দেখ গো নয়ন খুলি।
দীনের অপূর্ব্ব সাধ পূরাও মা বেদরাণী,
বাসনা এ হৃদি-মাঝে পূজিব ও পা-দুখানি।
সিত-অব্জ আভরণে, এলায়ে কুন্তল-ভার,
শ্বেত রূপে উজলিয়া এস বঙ্গে পুনর্ব্বার।
মানস-বীণার তারে তোমার অমৃত-বাণী,
উঠুক বাজিয়া মাগো ! মাতাইয়া হৃদিখানি।
ভকতি-কুসুমে গাঁথা, সরোজ-আসনে বসি,
বিলাও করুণা কণা !—হৃদয়-তিমির নাশি।

মা তোমার আগমনে—পঙ্কজ-লাবণ্য-রাশি,
ফুটিয়াছে শত ধারে—কমলে চন্দ্রমা হাসি।
মা তুমি আসিবে বলে' এই হৃদি-সিংহাসন—
পাতিয়া রেখেছি যে গো—রাখ তায় শ্রীচরণ।
ফুটিয়া উঠুক মম এ হৃদয়-কোকনদ,
পরশিয়া আজি তব রাতুল-রাজীব-পদ।
মরম-মন্দার মাঝে এস মা সরোজরাণী,
বিতরি বিবিধ শান্তি—এস বিশ্ব-বিধায়িনী।
চন্দ্ররশ্মি-বিলেপিত ফুটন্ত-পঙ্কজ-দলে,
উজল কর মা বিশ্ব আশীষিয়া ভক্তদলে।
পূর্ণ ক'রে দাও হৃদি আবার স্বর্গীয় গানে,
নীরব চেতনা যেন কভু নাহি আসে প্রাণে।
পূজিয়া চরণ তব আজি পূত অশ্রুজলে,
সার্থক করিব নরজন্ম সেই পুণ্যফলে।
ধর মা গো সন্তানের ভক্তি-সিক্ত উপহার,
হেম-রত্ন কোথা পাব—ধর এই ফুলহার।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

অনাথ বালক।

দুর্গানারায়ণ বাবু যখন কর্ম্ম উপলক্ষে সপরিবারে সুদূর পশ্চিমে বাস করিতেছিলেন, তখন সেখান হইতে দেশে ফিরিবার সময় তাঁহার পত্নী রাজলক্ষ্মী একটী অনাথ, অভিভাবকশূন্য শিশুকে লইয়া আসিয়াছিলেন। এই বালকটীর প্রকৃত নাম লছমন প্রসাদ হইলেও তাঁহারা কিন্তু উহার ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মাখনলাল নামে অভিহিত করিতেন। উক্ত লছমনপ্রসাদ মাখনলাল নামেই বাঙ্গালায় পরিচিত হইয়াছিল। মাখনলাল যখন পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করে, তাহার দুই বৎসর পরে বা তাহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার মাতাপিতা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। সুতরাং উক্ত মাখনলালের লালনপালন করিবার কেহ ছিল না। এই সময় তাহার নিকটবর্ত্তী এক প্রতিবাসিনী এই শিশুটী আহার অভাবে মারা যাইবে বলিয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া আসেন। সেই সময়ে দুর্গানারায়ণ বাবু মাখনলালের জন্মস্থান হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত সীতাবাগ গ্রামে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় এই অনাথ শিশুটী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে ঐ সমস্ত কথা বলায়, তিনি ঐ শিশুটীকে বাটীতে আনিয়া লালনপালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৃহিণীর এইরূপ অভিলাষ, সুতরাং কর্ত্তা তাহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করিতে আর কাল বিলম্ব করিলেন না; বরং প্রার্থনা অনতিবিলম্বে পূর্ণ হইল। একদিন মধ্যাহ্নে সকলের আহারের পর রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী বাটীস্থ ঝি শ্যামলীকে সেই গ্রামে পাঠাইলেন। গ্রামটী তাঁহাদের বাসস্থান হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কর্ত্তা দুর্গানারায়ণ বাবু লছমন প্রসাদকে লইয়া আসিবার কথা তাহার বর্ত্তমান অভিভাবক বা আশ্রয়দাতাকে পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন। সুতরাং এখন ঝি শ্যামলী কর্ত্তার লিখিত পত্র লইয়া গেল এবং সেই অনাথ শিশুটীকে লইয়া আসিল।

রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর কোন পুত্রকন্যা ছিল না, সুতরাং তিনি এই শিশুটীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ এবং মমতা ছিল, তাহা যেন তাহার অজ্ঞাতসারে এই শিশুটীই সমস্ত অধিকার করিয়া লইল। ক্রমে শিশুটী বড় হইতে লাগিল। এখন সেই শিশুটী আর আধ আধ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে না, বাঙ্গালীর মত খাঁটী বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছে। সম্ভবতঃ আর কেহ বুঝিতে পারুন আর না পারুন, দুর্গানারায়ণবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, এ বালকটীকে কেহই হিন্দুস্থানী বলিয়া জানিতে পারিবে না, অধিকন্তু তাহার পুত্র বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে, কারণ তাহার আকৃতিরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যাহা হউক, সত্য সত্যই যখন তাঁহারা পশ্চিম হইতে সেই বালকটীকে লইয়া স্বদেশে আগমন করিলেন, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। ক্রমে মাখনলাল যখন চতুর্দ্দশ বর্ষে উপনীত হইল, তাহার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরেচ্ছায় দুর্গানারায়ণ বাবুর একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

বিধাতার আশীষ-কুসুম স্বরূপ এই পুত্রটীকে পাইয়া রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু তথাপি একদিনের জন্যও মাখনলালের প্রতি তাহার একটুও স্নেহের হ্রাস হইল না; বরং নিজ পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। মাখনলাল আসিবার পর হইতে তাঁহাদের সংসারে অনেক উন্নতি দেখা গিয়াছিল, সেই কারণে দুর্গানারায়ণ বাবু ও রাজলক্ষ্মী তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। মাখমলাল শিশুকাল হইতেই দুর্গানারায়ণ বাবুর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায় রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে "মা" এবং দুর্গানারায়ণ বাবুকে "বাবুজী" বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার নব কুমারের নাম রাখিলেন—অমিয়কুমার।

অমিয়কুমার মাখনলালকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিত, এবং সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই জানিত। যদিও কিছুকাল পরে পিতার মুখে মাখনলালের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি পিতামাতার গুণে মাখন দাদার প্রতি অমিয়কুমারের ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহারা এক বৃন্তে দুইটী পুষ্পের ন্যায় পরস্পর শোভা পাইতে লাগল।

* * * * *

দুর্গানারায়ণ বাবু ক্রমে অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিলেন এবং প্রবাস ত্যাগ পূর্ব্বক পেন্সন লইয়া দেশে ফিরিলেন, আশা, জীবনের শেষ কয়টা দিন এইখানেই কাটাইয়া দিবেন, তাহাই সেইমত মঞ্জুর হইল। দুর্গানারায়ণ বাবু স্ত্রীর সহিত মাখনলাল এবং অমিয়কুমারকে লইয়া বাটী আসিলেন। পাড়াপড়শী সকলেই দুর্গানারায়ণ বাবুর ছেলে দেখিতে আসিল, এবং দুটিকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। দুর্গানারায়ণ বাবু মাখনলাল ও অমিয়কুমারকে স্থানীয় বামনগর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক দিন এইরূপ আনন্দে কাটাইয়া দিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনয় হইবার সূত্রপাত হওয়ায়, তিনি মাখনলালকে আর বেশীদূর পড়াইবার আবশ্যক নাই বুঝিয়া তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া তিনি অমিয়কুমারের ভার তাহার উপর দিলেন, এবং যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যতে কোন কষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত অর্থাদি মাখনলালকে বুঝাইয়া তাহার রক্ষার সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ক্রমে দুর্গানারায়ণ বাবুর দিন ফুরাইয়া আসিল। তিনি একদিন হঠাৎ অমিয়কুমারকে ডাকিয়া মাখনলালের হাতে সঁপিয়া দিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। মাখনলাল এখন অকূল সমুদ্রে পড়িল। কারণ তাহার সাংসারিক বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কিন্তু দুর্গানারায়ণ বাবু নগদ অর্থ এবং ভূসম্পত্তি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সংসার-চিন্তার কোন কারণ ছিল না; তবে মাখনলাল তো ছেলে মানুষ! সে সংসারের বিষয় কি জানে? ইহা ভিন্ন সে দুর্গানারায়ণ বাবুকে তাহার "পিতা" এবং রাজলক্ষ্মী দেবীকে তাহার "মাতা" বলিয়াই জানিত। এ সংসারে তাঁহারা ভিন্ন হতভাগ্য মাখনের আর কে আছে!

অমিয়কুমারের শিক্ষার এবং সংসারের সমস্ত কার্য্যাদির তত্ত্বাবধানের ভার এখন মাখনলালের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং মাখনলাল উপস্থিত শোকে অধীর না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইল। অমিয়কুমার স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। নিকটে কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুল ছিল না। আর তখন প্রত্যেক জেলায়, এবং মহকুমায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ভিন্ন আজ-কালকার ন্যায় প্রায় গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হয় নাই। মাখনলাল উচ্চশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। সুতরাং অযথা কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই অমিয়কুমারকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিল, এবং তাহার থাকিবার সমস্ত স্থির করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বাটী আসিবার জন্য রওনা হইল।

(২)

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ধরাতল অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। দুর্গানারায়ণ বাবুর সম্মুখস্থ উদ্যানের নানাজাতীয় পুষ্প-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। দুর্গানারায়ণ বাবু কলিকাতা হইতে "হেনা" "গ্রাণ্ডিফ্লোরা" এবং চম্পক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃক্ষ আনিয়া স্বহস্তে রোপণ করতঃ এই মনোহর পুষ্পোদ্যানটি রচনা করিয়াছিলেন। আজ পূর্ণিমা রজনীতে সুধাংশুর স্নিগ্ধ ঘনায়মান কিরণ সম্পাতে এই পুষ্পোদ্যানটির শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী এই সময়ে উদ্যানের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। চন্দ্রের আলোকে, উদ্যানের শোভায়, এবং পুষ্পের সুবাসে তাঁহাকে অতীত স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর। রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী নানারূপ চিন্তাভারক্লিষ্টা হইয়া বিল্ববৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। প্রায় পাঁচ দিবস হইল স্নেহের পুত্র অমিয়কুমার মাখনলালের সহিত অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় গিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পান নাই; ইহাই তাঁহার বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তিনি কখনও একাকিনী নির্জ্জনে এই বাটীতে বাস করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, সেই জন্যই যেন তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তিনি সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইলেন। নিশীথিনী রাজলক্ষ্মীকে দারুণ উদ্বেগ-সাগরে রাখিয়া যথাসময়ে স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপনান্তে প্রস্থান করিল। অতি প্রত্যুষেই মাখনলাল বাটী পৌঁছিল, এবং তাহার প্রমুখাৎ শ্রীমান্ অমিয়কুমারের কুশলবার্ত্তা শ্রবণে মাতা উপস্থিত চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাখনলাল সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, এবং অতি যত্নে সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় বৎসরাধিক কাটিল।

সময়ে সময়ে অমিয়কুমার ছুটীতে বাটী আসে, এবং ছুটীর অবসানে আবার কলিকাতায় চলিয়া যায়। এইরূপে অমিয়কুমারের পড়াশুনা বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু দেখিলে বোধ হয় অমিয়কুমার এখন আর সে অমিয়কুমার নাই। মানব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা, এবং সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ

করিতে চেষ্টা করে, এবং রুচিও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অমিয়কুমার বাটী আসিলে মাখনের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তাহার নীরব জীবনটি অমিয়’র সাহচর্য্যে প্রফুল্লতর হইয়া উঠিত! অমিয় যখন বাটী আসিত, প্রতিবারই কলিকাতা হইতে নানারূপ উৎকৃষ্ট সুগন্ধ দ্রব্যাদি লইয়া আসিত। বিশেষ মাখন দাদা সুগন্ধ তৈল, এবং আতর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ভালবাসিত, সেজন্য প্রতিবার ঐ সকল দ্রব্যাদি আনিতে কখনও ভুলিত না। অমিয়কুমার যথা-সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সকলেরই আনন্দ আর ধরিল না! আজ মাখনলালের কি আনন্দ! শ্রীমান্ অমিয়-কুমার এককালে আরও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই বংশ উজ্জ্বল করিবে, ইহাই তাহার মনে মনে স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু বিধাতা কি নির্ম্মম! কি নির্দ্দয়! এইক্ষণে যাহাকে একটু সুখের আশা দিতেছেন, তৎপরেই আবার তাহাকে কঠোর দুঃখের শেলাঘাতে মর্ম্মাহত করিতেছেন। কোথায় পুত্র অমিয়কুমার শিক্ষিত হইয়া এক সময়ে তাহার মাতার দুঃখ দূর করিবে, এবং সৎপুত্রের মাতা বলিয়া তিনি গর্ব্ব অনুভব করিবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া হায়! একি হইল! বিধাতা যে সাধে বাদ্ সাধিলেন! হঠাৎ অমিয়কুমারের এক বন্ধু কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম করিলেন— “Come sharp, Amiya seriously ill”— মাখনলাল সহসা বাটীতে টেলিগ্রাম পাইয়াই কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া দেখিল এবং অমিয়র সংশয়াপন্ন অবস্থা ভাবিয়া বালকের মত একবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু বাটীতে বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? যাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হয়, তজ্জন্য সত্বর নিজেই কলিকাতা যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। সেই দিনই মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বেই মাখনলাল কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। কিন্তু সে কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে একটী বন্ধুর নিকট শ্রীমান্ অমিয়কুমারের অকস্মাৎ কলেরায় মৃত্যুর কথা শুনিয়া বজ্রা-হতের ন্যায় ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। হায়! হায়! কি হইল? আজ কি বলিয়া মাতা রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে এই নিদারুণ বার্ত্তা জানাইবে, আর তিনি একথা শুনিয়া হয়ত বাঁচিবেন না, এইরূপ ভাবিয়া মাখন অবিরল-ধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহার সেই এক এক বিন্দু অশ্রু যেন কত স্নেহ, কত ভালবাসা, কত বন্ধুত্বের পরিচয় দিতেছিল।

যাহা হউক মাখনলাল এখন কি করিবে, তাহা ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিলে বা কাঁদিলে তো তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না, এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া বাটী ফিরিল। কোন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও, উহা অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এস্থলেও তাহাই হইয়াছিল। রাজ-লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া উন্মত্ত এবং শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, এক্ষণে মাখনলালকে দেখিয়া ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মাখনলাল কাঁদিতে কাঁদিতে

মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "মা, আর এ ভাঙ্গাহাটে থাকবো না, চল, সেই নিত্যানন্দ-পুরী বারাণসীধামে গিয়া বাস করিগে।"

দুই চারি দিন মধ্যেই রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী মাখনলালকে সঙ্গে করিয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। দুঃখিনী বিধবা রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী শোকে দুঃখে শেষ বয়সটা মণিকর্ণিকার তীরে কাটাইতে লাগিলেন। মাখনলাল এখন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, আর মনের আবেগে সন্ধ্যার সময় মণিমর্ণিকার তীরে বসিয়া তন্ময় হইয়া গাহে, –

"অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা
আমি কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
আমার যা ছিল সকলি গেছে,
মিছে শুধু ঘুরে মরি।"

রাজলক্ষ্মী মাখনলালের পার্শ্বে বসিয়া নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, হইয়া গীত শ্রবণ করিতেন। এক এক সময় নিজের মনে সেই দারুণ শোক জাগিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ সে স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পুত্রশোক মুছিয়া ফেলিবার জিনিষ নহে। তথাপি সেইক্ষণে মনে মনে বলিতেন,—

"কর বিতাড়িত এ হৃদয় হ'তে
তাহার মুরতি খানি।
যদিও জীবনে ভুলিতে তাহারে
পারি না ধ্রুব জানি॥

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইত, সেকি! আমার প্রাণপ্রিয়তম পুত্র অমিয়কুমারকে আমি কেমন করিয়া ভুলিব? তাহার সেই মুর্ত্তিখানি এখনও যে আমার হৃদয়ে উজ্জলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সে যে হৃদয়ের পঞ্জর সম
সে যে গো মাথার মণি
দুদিনের তরে ভুলায়ে মোদের,
ত্যজেছে সে তনু খানি॥
দুদিনের তরে আসিয়ে সে যে
গেল চিরতরে (মোদের) কাঁদায়ে।
সে যে আর আসিবে না, আর ফিরিবে না,
আর না পড়িবে চরণে লুটায়ে॥

মাখনলাল মাতা রাজলক্ষ্মীকে সর্ব্বদাই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু যখন কিছু-তেই কিছু হইত না, তখন বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া বলিত—

হায় বিধাতঃ! এই কি বিচার।
দানি, যে রত্ন লইলে আবার।
হইলে কি ধন্য নিকটে সবার
হরিয়া সে রত্ন হইতে মোদের?

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

কুমার দামোদর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেবীর দেখা।

সরস্বতী কুমার দামোদরকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কুমারের এ অবস্থা কেন? আর বিলম্বের সময় নাই, অতএব কুমারকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কুমারও সরস্বতীকে দেখিয়া অবাক হইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার নয়নে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি ইঙ্গিত বুঝ

সরস্বতীর অনুসরণ করিলেন। সরস্বতী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, কুমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অন্ধকারে যাইতে যাইতে উভয়ে এক দ্বারের নিকট গেলেন, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। তখন সরস্বতী কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। ভিতর হইতে দরজা টানিল, খুলিল না। কি প্রকারে বাহির হইবে বুঝিতে পারিল না। সরস্বতী ধীরে ধীরে বলিল,—"কি উপায় হবে? দ্বার বন্ধ। এই স্থানেই কি আমাদের শেষ?" কুমার দামোদর বলিলেন,—"তুমি কোথায় ছিলে? কেমন ক'রে এলে?" সরস্বতী বলিল,—"সে অনেক কথা, এখানে তা বলা যাবে না। এখন উপায় কি?" কুমারও চিন্তিত হইলেন। হঠাৎ লোকের পদশব্দ শুনা গেল, উভয়ের ভয় হইল। কুমার সরস্বতীকে লইয়া এক কোণে লুকাইলেন, দুটি লোক ধীরে ধীরে ঐ স্থান দিয়া চলিয়া গেল। কুমার আবার বাহির হইলেন। সঙ্গে কোন অস্ত্র নাই, যদি কেহ আক্রমণ করে, আত্মরক্ষার অবলম্বন কি? সরস্বতী তাহার ক্ষুদ্র ছুরিকাখানি কুমারের হস্তে দিল, তাহাতে অনেক সাহস বৃদ্ধি হইল। এই স্থান কোথায়? কে আসিল? কেন উঁহাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে, সরস্বতীই বা কোথা হইতে আসিল, সেও কি বন্দিনী? এই সব প্রশ্ন কুমারের হৃদয়ে উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার মীমাংসা করে কে? কুমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, নানা স্থান ঘুরিয়া আবার দ্বারের নিকট আসিলেন। দ্বার ভাঙ্গা সুকঠিন, অতি দৃঢ় অথচ বেশী শব্দ হইলে সকলে টের পাইবে। কুমার বলিলেন,—"বাহির হওয়ার উপায় নাই, চল আবার কক্ষে গিয়া বন্দী হয়ে থাকি।" সরস্বতীর মন বুঝিবার জন্য এই কথা কুমার বলিলেন। সরস্বতী সগর্ব্বে বলিল,—"তা হবে না, আমি যাবোই, ইহাতে প্রাণপণ। বিশেষতঃ আপনাকে এ কষ্টে রাখা যায় না। আমার নিজের প্রাণের জন্য মমতা নাই, কিন্তু আপনার প্রাণ মূল্যবান, এ প্রাণ রক্ষা করা চাই।" সরস্বতী দ্বারে করাঘাত করিল, কেহই উত্তর করিল না। চারিদিকে কোলাহল ও আলো—কত লোক যাতায়াত করিতেছে বোধ হইল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কুমার দেখিলেন—বিপদ অবশ্যম্ভাবী, তিনি সরস্বতীকে এক পার্শ্বে রাখিয়া দাঁড়াইলেন। কত লোক আলো লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কুমার বুঝিলেন ইহারা হয় সরস্বতীর না হয় তাঁহার পলায়নের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছে, তাই অন্বেষণ চলিতেছে। কুমার সরস্বতীর জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন। তিনি সরস্বতীর হস্ত ধারণ করিয়া অন্ধকার রাস্তা দিয়া চলিলেন, সরস্বতীর তখন মনে হইল এসুখ যেন চিরকাল থাকে, যদি এ সময়ে মৃত্যুও হয়, তথাপি তাহার দুঃখ নাই। সরস্বতী কুমারকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে—সে ভালবাসা স্বার্থশূন্য—সে ভালবাসা স্বর্গীয়। সে কুমারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আজ এ বিপদেও সে প্রফুল্লচিত্ত।

যে ঘরে কুমার ও সরস্বতী আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে ঘরের উত্তর দিকে একটি দ্বার, সে

ঘরে করাঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল, উভয়ে সেই দ্বার দিয়া বাহির হইলেন। তাঁহারা অতি দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের পদশব্দ পশ্চাত পশ্চাত শুনা যাইতে লাগিল। কুমার বলিলেন,—সরস্বতী আবার ধরা পড়্‌বে, আবার বন্দিনী হবে। আমি ধরা পড়ার পূর্ব্বে একবার শেষ যুদ্ধ করে নিব। আমার প্রাণের মমতা নাই, এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সরস্বতী, এইবার তোমার কাছে শেষ বিদায় লইব। তুমি চিরকাল আমাকে ভ্রাতৃভাবে দেখেছ, আমিও তোমাকে ভগিনীর ন্যায় দেখেছি, এক সঙ্গে ভ্রাতা ভগিনী বিপদে ঝাঁপ দি। দুই জনে সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। একটি উচ্চ প্রাচীর দেখা গেল। কুমার তাহাতে উঠিলেন, সরস্বতীকে বলিলেন,—"এস ভগিনি, আমার বস্ত্র ফেলে দিচ্ছি, শক্ত ক'রে ধর, তোমাকে ধরে তুলি।" সরস্বতী বস্ত্রখণ্ড ধরিল, কুমার দামোদর তাহাকে অনায়াসেই টানিয়া উচ্চ প্রাচীরের উপর উঠাইলেন। অপর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন ভয়ানক গর্ত্ত—জলে পরিপূর্ণ। নিজে তথায় লম্ফ দিয়া নামিতে পারিবেন, কিন্তু সরস্বতী কেমন করিয়া নামিবে? কুমারের চিন্তা হইল। তিনি সরস্বতীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ভয় হচ্চে কি? এখন উপায়?" সরস্বতী বলিল,—"ভয় কাকে বলে জানি না। দুজনে ঝাঁপ দি।" তখন দেখিলেন একটি আলোক গর্ত্তের নিকট—মা তথায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তিনি বলিলেন,—"কুমার আর প্রাণনষ্ট করার প্রয়োজন নাই। যদি ঝাঁপ দেও, উঠবে না, এই গর্ত্তে নানারূপ বিষাক্ত জিনিষ আছে। তোমার জীবন অমূল্য, আমি যখন তোমার মা, তোমার আবার ভাবনা কি? তোমরা দুজনে প্রাচীরের উপর দিয়া দক্ষিণ দিকে যাও সেখানে সিঁড়ি পাবে, নেমে এস। উহারা তখন নির্ভয়ে সেই দিকে গেলেন, দেখিলেন একটি সিঁড়ি তথায় আছে, কিন্তু প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। মা বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, নেমে এস।" কুমার নির্ভয়ে নামিতে লাগিলেন। সরস্বতীও সঙ্গে সঙ্গে নামিল। প্রহরী কোন কথা বলিল না। মা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। কুমার আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মা বলিলেন,—"এস বৎস, আর ভয় নাই, কেহ কিছু বল্‌বে না। আমার সঙ্গে এস।" উভয়ে মায়ের সঙ্গে চলিল। কতক দূর গিয়া বলিলেন,—"বাবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই হবে। এ দস্যুর দল মাধবের বিরোধী, নিশ্চয়ই মাধব শাস্তি দিবেন।" তারপর সরস্বতীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, সরস্বতী মনে করিল তিনি অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছেন; বড়ই লজ্জিত হইল। মা বলিলেন,—"সরস্বতী তুমি সাবধানে চলো। তোমাকে এক উপদেশ দিচ্ছি—মাধবের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর, শান্তি পাবে, নতুবা অশান্তিতে তোমার জীবন অতিবাহিত হবে। এ পৃথিবীতে শান্তি ও অশান্তি দুটি ফুল, স্বকৃত উপায়ে এ দুটির সৃষ্টি। নিজের মনকে নিজে আয়ত্ত রাখ্‌তে হয়, পরাধীন কিছুতেই হবে না। দয়াময়ের অসীম দয়া, তিনি দয়া কর্‌তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তুমি আমার সঙ্গে চলো,

শান্তি পাবে, এখানে তোমার শান্তি নাই।” সরস্বতী কিছু বলিল না, মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। মা হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার এখনও বাসনা যায় নাই, তবে নিশ্চয়ই জান্‌বে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে না। এক দিন আমার নিকট আসিয়া কাঁদতে হবে। যাও, আরও কিছু দিন তোমার ভোগ আছে। কুমারকে বলিলেন,—“সত্বর রাজধানী যাও, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, তোমার বীরধর্ম্ম পালন কর। পাপীর শাস্তি বিধান কর, আবার আমার দেখা পাবে।” ইহার পর আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দস্যু ও মন্ত্রী।

বেলাবসান সময়ে এক জন পথিক নীরবে নদীর তীর দিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে বন, ক্ষুদ্র একটি রাস্তা নদীর ধার দিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা অবলম্বনে পথিক নির্ভয়ে যাইতেছে। একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল সূর্য্য অস্তাচলগামী, পথিক তখন দ্রুতবেগে চলিল। রাস্তায় ব্যাঘ্রের ভয়, সর্পও মধ্যে মধ্যে পড়িয়া থাকে, পথিক সে সব গ্রাহ্য না করিয়া চলিতেছে। একস্থানে কতকগুলি বৃক্ষের সমাবেশে স্থানটি অন্ধকার হইয়াছে, সূর্য্যালোক তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। সেইখানে পথিক কি সঙ্কেত করিল, সে শব্দের অনুরূপ শব্দ অদূরে হইল, দেখিতে দেখিতে আর একটী লোক বৃক্ষের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। পথিক বলিল,—“শাহ”, সে ব্যক্তি বলিল,—“ডাকু”, তখন উভয়ে মুখামুখী হইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইল। এক ব্যক্তি বলিল,—“আপনি এসেছেন ভালই, আমি আপনার আদেশ মত এতদূর এলেম।” দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—“এলে কি হবে? তুমি ত কৃতকার্য্য হতে পার্‌লে না? এত টাকা তোমাকে দিলেম, আরও পুরস্কার দিব অঙ্গীকার করিলাম, সেই সামান্য কাজটা আর সাধন কর্‌তে পার্‌লে না? তুমি ইচ্ছা কর্‌লে সব কর্‌তে পার, আমার বিশ্বাস, তুমি বিশেষ চেষ্টা কর না, অথবা অপর পক্ষে অধিক টাকা খেয়েছ।” প্রথম ব্যক্তি একটু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল,—“চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। আপনার উপদেশানুসারে আমি তাঁকে বন্দী করেছিলেম, এমন কি আমার দুই তিনটি লোক তাহাতে মৃত ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, ভয়ানক ক্ষতি। অনেক দিন থেকে সুযোগ খুঁজছিলেম হঠাৎ একদিন জান্‌তে পার্‌লেম তিনি মাঠ পার হ'য়ে যাচ্ছেন, অমনি আমার লোক ও আমি তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলাম। তিনি বীর-পুরুষ, তাঁকে আটক্ কর্‌তে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে ও অনেক ক্ষতিস্বীকার করিয়া অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করা গেল, মৃত্তিকার নিম্নে সেই বাড়ীতে রাখা হইল, তারপর তিনি কোথায় পলায়ন কর্‌লেন।” দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—“পলায়ন কর্‌লে কেমন করে? উপযুক্ত প্রহরী ছিল না? ইহাতে তোমার অসতর্কতা বুঝা যায়।” প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল,—“আজ্ঞে না, অসতর্কতা কিছুই নয়। যাঁহার কৃপায় তিনি মুক্তি পেলেন, আমরা সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করি, তিনি আমাদের সকলের

না। আমার দলের কেহই তার বিপক্ষতাচরণ কর্‌তে সাহসী হইবে না বা ইচ্ছা কর্‌বে না। অর্থ লোভই বলুন, আর ভয় দেখানই বলুন, কিছুতেই আমরা সেই আরাধ্যা মাতার বিরুদ্ধে যাব না। তাঁরই কৃপায় কুমার মুক্তি পেয়ে গেলেন।" পুরন্দর শাহ শুনিয়া অবাক হইলেন, মনে মনে বলিলেন—"এ স্ত্রীলোকটি আবার কে? সকলে তাঁকে 'মা' বলে কেন?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দেখ এবার যুদ্ধ বাঁধিবে, এই যুদ্ধেই কর্ম্ম শেষ হবে, আর কিছু কর্‌তে হবে না। কিন্তু তোমার উপর আমার বিশ্বাস আর নাই। তোমরা অর্থ পেয়ে কুমারকে ছেড়ে দিয়েছ। আমি সব খবর জানি।" দস্যু সর্দ্দার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আপনি আপনার অর্থ ফেরত লউন, আমরা কেহই মায়ের বিরুদ্ধে যেতে পার্‌বো না। পুরন্দর শাহ বলিলেন,—"মা কে?" দস্যু সর্দ্দার বলিল,—"তিনি কে জানি না, কখনও কখনও তাঁর দেখা পাই, আমরাও পবিত্র হই। দয়াময়ীর অসীম দয়া। আমরা দস্যু, তথাপি আমাদিগকে পদাশ্রয় দেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা, তিনি সব জানেন, সব কর্‌তে পারেন।" পুরন্দর শাহ অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি অর্থ ফেরত চাই না, আমার যদি দরকার হয় তোমাকে জানাবো।" এই বলিয়া তিনি বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমর।

তিস্তা নদীর ধারে দুই পক্ষ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান। রাজা ধর্ম্মপাল বহু সংখ্যক সৈন্য আনিয়াছেন, অপর পক্ষে রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাণী ময়নামতী স্বয়ং, কুমার দামোদর ও গোপীচাঁদ। রাজা হরিশ্চন্দ্র জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিতে আসিয়াছেন। রাণী ময়নামতী রণরঙ্গিনী বেশে হস্তীর উপর আসিয়াছেন। তিনি নির্ভয়, আজ হয় পুত্রের রাজ্য উদ্ধার কর্‌বেন, নতুবা সমর প্রাঙ্গনে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ভবসাধন রায় রাজা ধর্ম্মপালকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা যখন মন্ত্রীর উপদেশ শুনিলেন না তখন মন্ত্রী বলিলেন,—"মরণ কালে বিপরীত বুদ্ধি।" রাজা ধর্ম্মপাল বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজেই সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে আসিলেন। প্রাতঃকালে সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, প্রান্তরের উভয় পার্শ্বে দুই দলেই ছাউনী করিয়াছে। রাণী দুর্গাবতী বলিলেন,—রাজ্য ছেড়ে দেও,অধর্ম্মাচরণ করো না, তোমার নিজের রাজ্য নিয়ে তুমি সুখে থাক। আর যদি না শুন, ফল ভাল হবে না। ধর্ম্ম সব দেখ্‌ছেন। আজও চন্দ্র-সূর্য্য উদয় হচ্ছে, আজও ভগবান সব বিচার কচ্ছেন। আমার কথা শুন, নিজের সম্পত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাক?" রাজা আজ রাগ করিলেন না, হাসিয়া উত্তর

করিলেন,—"আমি তোমাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত কর্‌বো, আর অন্য পণ্ডিতের উপদেশ শুন্‌ব না।" রাজার এইরূপ বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া রাণী অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানকে ডাকিলেন, ভগবান তাহা শুনিলেন কিনা কে জানে। ধর্ম্মপালের উপর প্রজারা অসন্তুষ্ট, সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট, সভাসদেরা অসন্তুষ্ট, অতএব অনিচ্ছার সহিত সকলে যুদ্ধে নামিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর উদিত হইলে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং বাহিনী চালাইতে লাগিলেন, কুমার দামোদর দক্ষিণ ভাগে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। রাণী ময়নামতী হস্তী আরোহণে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিলেন। কুমার গোপীচাঁদ বাম ভাগ আক্রমণ করিলেন। রাজা ধর্ম্মপালও বীর পুরুষ, অসি হস্তে বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অনেক সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তিনি দেখিলেন ধর্ম্মপালের সৈন্যের নিকট তাঁহার সৈন্য দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই সব শিক্ষিত সৈন্য ধর্ম্মপাল অন্য স্থান হইতে আমদানী করিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সূর্য্যতাপে সকলেই ম্লান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, পিপাসার্ত্ত। তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেছে না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সৈন্য হটিয়া আসিতেছিল। ধর্ম্মপালের বীরত্বের নিকট কেহই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। কুমার দামোদর অমিতবিক্রমে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিয়া তাহাদের সৈন্যের এক ভাগ হটাইয়া লইয়া চলিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র মনে মনে ভাগিনেয়কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে একটি বর্শা তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সে বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, বর্শাগ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল এবং তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা ধর্ম্মপাল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক জন অশ্বারোহীর জিম্মা করিয়া দিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর হইল না, কেবল বিপক্ষ সৈন্যকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। এই সময়ে "জয় রাণী মায়ের জয়" বলিয়া সৈন্যগণ উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। সকলে দেখিল—অসি হস্তে স্বয়ং রাণী ময়নামতী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা। কুমার দামোদর ও গোপীচাঁদ দুই ভাগ পরাজয় করিয়া রাণীর সঙ্গে যোগদান করিলেন। রাণী অসি ও বর্শা হস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অবাক হইয়া এদৃশ্য দেখিতে লাগিল। রাজা ধর্ম্মপাল অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, নিকটবর্ত্তী বিপক্ষ সৈনিকের অসির আঘাতে ভূপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাজা ধর্ম্মপালের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। অদ্য রাণী ময়নামতী জয়ী হইয়া পুত্রকে হস্তীপৃষ্ঠে লইয়া রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। কুমার দামোদর মাতুলের

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন তাঁহার জীবনের আশা নাই। কুমার দামোদর বাষ্পাকুল লোচনে বলিলেন,—"আপনি পিতৃ-তুল্য, আপনি অন্নদাতা, ভগবান করুন আপনি আরোগ্যলাভ করুন। রাজা ধর্ম্মপাল নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে স্বর্গে গিয়াছেন।" রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি ভাগিনেয়ের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমার আর জীবনের আশা নাই। আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি, রাজ্যে গিয়া সুখ-শান্তিতে রাজত্ব কর। আমার কন্যাদ্বয়কে ও গোপীচাঁদকে আশীর্ব্বাদ জানাবে। আমি বেশী কথা বল্‌তে পাচ্ছি না। আশীর্ব্বাদ কর্‌রি তুমি সুখী হও। তুমি সাবধানে চল্‌বে, সতত ধর্ম্মে মতি গতি রাখ্‌বে। তোমার মাকে আমার জন্য শোক কর্‌তে বারণ কর্‌বে, আমি স্বর্গে চল্‌লেম। তোমরাও একদিন তথায় আস্‌বে, তখন আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" রাজা হরিশ্চন্দ্র আর কথা বলিতে পারিলেন না, প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কুমার কাঁদিয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন। এই সময় অন্তরাল হইতে কে বলিল—"কুমার, কাঁদছো কেন? সকলেরই ত এই পরিণাম। সকলকেই যে যেতে হবে।" কুমার দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমার সঙ্গে এস, শোক তাপ ভুলে যাবে।" কুমার সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

বিড়ম্বনা।

তৃষিত পরাণে চারিদিক পানে
ঘুরিয়া হ'লাম সারা;
লোকালয়-পথে ছুটিয়া ধাইতে
হইনু গো পথহারা!
যার কাছে যাই বিলাইতে মোর
এ দগ্ধ পরাণ খানি,
দেয় গো ফিরায়ে কঠিন হইয়ে
আমায় অভাগা জানি।
কতই লাঞ্ছনা সহিয়া সহিয়া
ঘুরি সদা প্রতি দ্বারে;
কে নেবে সঁপিতে এ দগ্ধ পরাণ
মায়ের চরণ 'পরে?
কত শত আশা সদাই ভাসিছে
এ' বিশ্ব-মরুর মাঝে;
পরাণ-আবেগে ছুটিয়া ধাই রে,
শ্রম করা হয় মিছে।
ইহ জগতের প্রতিদান সম,
বলিল গো একজনা,
এস না এদিকে ফিরে যাও ওগো
এ যে সব "বিড়ম্বনা"।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

ধর্ম্ম-সাধন।

আত্মাতে সকল গুণের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, আত্মা সকল গুণবীজের কোষ-স্বরূপ। এই কোষস্থ বীজ সমুদয় বপন করিতে হইলে ক্ষেত্রের আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেহরূপ ক্ষেত্র পাইয়াছি।

এই ক্ষেত্রে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়, ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। বীজস্থ শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ এই দেহে ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেহ যন্ত্র-সমষ্টি মাত্র। ডাল ভাত খাইয়া এই দেহ গঠিত হইয়াছে। আত্মা, ডাল ভাত প্রভৃতি ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করাইয়া দেহের গঠন ও বর্দ্ধন করান। অর্থাৎ আত্মার এরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ভুক্ত পদার্থ রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাতে পরিণত হয়। এ ছাড়া, শরীরে কতকগুলি নাড়ি আছে। তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি হয় (sensory) কতকগুলি দ্বারা শক্তি সঞ্চালন ক্রিয়া হয় (motor) আর কতকগুলি দেহের পুষ্টিসাধন করে (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না)। যন্ত্রের অসম্পূর্ণতা থাকিলে শক্তির বিকাশ হয় না। যদি যন্ত্রগুলি অসম্পূর্ণ থাকে বা বিকল হয়, তবে আমরা তাহাদের পূর্ণায়তন করিবার চেষ্টা করি; অসম্পূর্ণতা বা বিকলতা যাহাতে ঘুচে, তদ্বিষয়ে আমরা যত্ন করি। আত্মাতে শক্তির প্রথম স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সেই স্ফুরণ অতি কোমল, মৃদু ও সুক্ষ্ম। যখন সেই শক্তি স্থূল শরীরে বিকাশ হয়, তখন অপরে তাহা দেখিতে পায়। শক্তির বিকাশ দুই প্রকারঃ—প্রথম, আভ্যন্তরিক বিকাশ; দ্বিতীয়, বাহ্য বিকাশ। প্রথম অবস্থাতে সুক্ষ্ম দেহে, দ্বিতীয় অবস্থাতে স্থূল দেহে বিকাশ হয়। প্রথম অবস্থাটা কেবল নিজের অনুভাব্য; দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশমান, অপরেরও দৃষ্টির বিষয়ীভূত। আত্মা সদাই হা, হা করিতেছে,—কি যেন অভাব! এ হা হা,—এ অভাব, যেন সহজে মিটে না। আত্মা ব্যাকুল, আত্মা অতৃপ্ত। আত্মার দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে; দেখিবার শক্তি আছে, সেই শক্তির ক্রিয়া হইবে বলিয়া যন্ত্র আছে। সে যন্ত্র চক্ষু। আত্মা চক্ষু দ্বারা বহিঃস্থ বিষয় দৃষ্টি করিতেছে; বাহ্য বস্তুর রূপ দেখিতেছে। আত্মার দর্শন-শক্তি আত্মাতেই ফুটিল; আবার সেই শক্তি, চক্ষু-যন্ত্র দ্বারা বাহিরে বিকাশ হইল। দর্শন-যন্ত্র না থাকিলে বা সেই যন্ত্র বিকল হইলে, আত্মার দর্শন-শক্তি আত্মাতেই ফুটিয়া, আত্মাতেই মিলাইয়া যায়, বাহিরে বিকাশ পায় না।

আত্মা শুনিবে, তাই শুনিবার যন্ত্র কর্ণ। আত্মা কর্ণ দ্বারা বাহিরের শব্দ শুনিতেছে। আত্মার শ্রবণশক্তি আত্মাতেই ফুটিল; আবার সেই শক্তি কর্ণ দ্বারা বাহিরে বিকাশ পাইল। শ্রবণ-যন্ত্র না থাকিলে বা বিকল হইলে, আত্মার শ্রবণশক্তি আত্মাতে ফুটিয়া আত্মাতেই লয় পাইত, বাহিরে বিকাশ পাইত না। সেইরূপ আত্মার ঘ্রাণশক্তি আছে; ঘ্রাণ-যন্ত্র নাসিকা দ্বারা আত্মা বাহিরের দ্রব্যের গন্ধ আঘ্রাণ করে। আত্মার ঘ্রাণশক্তি আত্মাতে ফুটিয়া নাসা দ্বারা বাহিরে বিকাশ পায়। নাসা না থাকিলে বা উহা বিকল হইলে, আত্মার ঘ্রাণশক্তি আত্মাতে স্ফুরণ হইয়া আত্মাতেই বিলীন হইয়া যাইত, বাহিরে ফুটিত না।

জিহ্বা ও ত্বক্ সম্বন্ধেও এই কথা। অর্থাৎ আত্মার রসাস্বাদনের ইচ্ছা হইলে জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন হয়; স্পর্শনের ইচ্ছা

হইলে ত্বক্ দ্বারা আত্মা স্পর্শানুভব করে। যদি জিহ্বা ও ত্বক্ না থাকিত বা বিকল হইত, তাহা হইলে রসাস্বাদন-শক্তি ও স্পর্শন-শক্তি অন্তরে ফুটিয়া অন্তরে মিলাইয়া যাইত, বাহিরে সে শক্তির বিকাশ হইত না।

নানা কারণে অনেক যন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অনেকগুলি বিকল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক শক্তির আদৌ বাহিরে বিকাশ হয় না। সকল লোকের সকল যন্ত্র নাই; কাহারও বা কোন যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের মধ্যে জ্ঞানের এত প্রভেদ; সকলের জ্ঞান সমান নহে, সকলের সকল শক্তির বিকাশ হয় না।

ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কি কি আবশ্যক? ধর্ম্মসাধনের জন্য এই পাঁচটী জিনিষ চাইঃ—

(১) ক্ষেত্রের সংস্কার, (২) আহার-বিচার, (৩) সদাচার, (৪) ইন্দ্রিয়নিয়োগ শিক্ষা, (৫) সংযম। এখন এক একটীর পৃথক বিচার করা যাউক।

(১) ক্ষেত্রসংস্কার—যেমন ক্ষেত্র অপরিষ্কার থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, ফসল হয় না, ক্ষেত্রজাত আগাছা-পরগাছা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক, জল-সেচন প্রয়োজন, সেইরূপ দেহের সংস্কার করা আবশ্যক। অন্নপ্রাসন, উপনয়ন, ও বিবাহ এই তিনটী প্রধান সংস্কার। আজকাল সংস্কার নামমাত্র আছে। কলিতে ইংরাজী শিক্ষার দোষে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, সকলই বিশৃঙ্খল।

(১) উপনয়নটী কি? উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জীবন লাভ করিবার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় জীবন কৈ হয়? যাহার উপনয়ন হয়, তাহার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিবে ও সে ব্যক্তি উন্নতিমার্গে গমন করিবে। এখন সে উন্নতি কৈ হয়? উপনয়নে স্বতন্ত্র, অভিনব, উন্নত জীব সৃষ্ট হইবার কথা। তা কৈ হয়? হইবার মধ্যে হয়—যজ্ঞসূত্র গলায়। তাহাও কেহ কেহ বড় হইয়া পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ নিজের দোষে আপন গৌরব ও পদ-মর্য্যাদা হারাইতেছেন।

(২) আহার-বিচার—এখন আহারের বড় একটা বিচার করা হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে শরীর পুষ্ট হয়; অপুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে শরীর ক্ষীণ হয়। শরী-রের সহিত ধর্ম্মালোচনায় নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা যায় না। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে খাদ্যাখাদ্যের বিচার হইয়া থাকে। যাহাদের প্রকৃতি সত্ত্ব-গুণ-প্রধান, তাহাদের সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা; যাহাদের প্রকৃতি রজোগুণ-প্রধান, তাহাদের পক্ষে রাজসিক আহারই প্রশস্ত; আর যাহারা তমোগুণে পরিপূর্ণ, তাহারা কেবল তমোগুণ-বর্দ্ধক আহারে তৃপ্ত। যাহারা যে প্রকার দ্রব্য আহার করে, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ আহার্য্য দ্রব্যের গুণ প্রাপ্ত হয়। কাহারও প্রবৃত্তি মৎস্য, মাংস, প্যাঁজ, রসুন, সালগম, গাজোরে; কাহারও প্রবৃত্তি রুটি, লুচি, মিঠাই, মণ্ডা, রসগোল্লাতে; কেহ বা ছানা চিনি, ফলমূল, দুগ্ধ আহার করিতে ভালবাসে।

আবার গব্যঘৃত আতপান্নে কাহারও পরিতোষের সীমা নাই। কেহ টাট্‌কা সামগ্রী খাইতে ভাল বাসেন; কাহারও বাসী ও পচাতে তৃপ্তি। মোট কথা, অখাদ্যটা না খাওয়াই ভাল; আহার বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া উচিত। অখাদ্যে কেবল তমোগুণ বর্দ্ধিত করে; সুতরাং অখাদ্য-ভোজন ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ধরুন পঁ্যাজ,—ইহাতে গন্ধক আছে, তাই এটা এত দুর্গন্ধ। মলমূত্রে, নিশ্বাসবায়ুতে, ঘর্ম্মে এ দুর্গন্ধ থাকে। ইহা খাইলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়, সত্ত্বগুণের শক্তিকে প্রতিহত করে। তাই বলি যে খাদ্যে সত্ত্বগুণ বাড়ায়, তাহাই খাওয়া বিধি; আর যাহাতে তমোগুণ বাড়ায়—তাহা পরিবর্জ্জনীয়।

(২) আচার সম্বন্ধে দেখিতেছি সব ব্যভিচার। ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট; তাহাদের দেখাদেখি অপর জাতিরাও আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ ও পবিত্র আচারে থাকিলে ধর্ম্মসাধনের সহায়তা হয়। অশুচি ও অপবিত্র হইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেই জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে,—কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইবে;—জলশৌচের নিয়ম কি,—মৃত্তিকা-ব্যবহারের ব্যবস্থা কিরূপ। প্রস্রাবের পর অনেকেই জল লয় না। অন্য কিছু হউক আর না হউক অশুচি হইতে হয় ত—ময়লাটা শরীরে লাগে ত; ইহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্মের খাতিরে না হউক, স্বাস্থ্যের খাতিরেও ত পরিষ্কার থাকা উচিত।

(৪) ইন্দ্রিয়-নিয়োগের কথা—এ কথা সত্য যে, আমরা উঠিতে, বসিতে, চলিতে, জানি না। ইন্দ্রিয় আছে সত্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়া হইতেছে সত্য; কিন্তু কোন্ যন্ত্র কিরূপে কি ভাবে রাখিতে হয় বা ধরিতে হয়, তাহা কি আমরা জানি, না বুঝি? যন্ত্রগুলি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা সকলেই দর্শন-যন্ত্র ব্যবহার করি—দেখি সত্য; কিন্তু ঠিক দেখিতে জানে কয় জন? কেমন ভাবে চক্ষু রাখিলে দৃষ্টি করা হয়, বল দেখি ভাই! কাহারও বা সুদৃষ্টি, কাহারও বা কুদৃষ্টি। মনে কর, একটী পরমাসুন্দরী রমণী আপন শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতেছেন। সেই রমণীকে অনেক ভাবে ত দেখা যাইতে পারে। তুমি কুদৃষ্টিতে তাঁহার পানে দৃষ্টি করিলে,—বক্রদৃষ্টিতে দেখিলে, যেন রমণী তোমার ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্যা, এই ভাবে চক্ষু স্থাপন করিয়া অপাঙ্গবীক্ষণ করিলে। তোমার মনে পাপের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু যদি তুমি ইন্দ্রিয়নিয়োগ শিক্ষা করিতে, যদি দর্শনযন্ত্র স্থাপন করিতে জানিতে, তাহা হইলে সেই রমণীমূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যা এই অপবিত্র ভাবে দেখিতে না,—তোমার মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব উদয় হইত। তুমি পবিত্র চক্ষে দেখিতে—সেই রমণীর জগদ্ধাত্রী-ভাব, জগন্মাতা-ভাব;—দেখিতে, সেই আদ্যাশক্তিই বিশ্বপালন করিতেছেন। আহা, মরি মরি!!

(৫) সংযম—বাসনাকে যত সংযত করা যায়, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল। ইন্দ্রিয়গণ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে সুখের

প্রবাহে আমাদের বিবেক, বৈরাগ্য সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আবশ্যক। সংসারে থাকিলে ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যাঘাত ঘটে, একথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু কথাটা তত সারবান্ নহে। এ সংসার শিক্ষার স্থল। সংসারে থাকিয়া সংযম-শিক্ষা সুচারুরূপে হইতে পারে। আয়ের অনুরূপ ব্যয় করিতে হইবে, এ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই হয়। কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে হইবে, ইহা এই সংসারের শিক্ষা। দেখা যায়—যে ব্যক্তি যত্র আয় তত্র ব্যয় করে, তাহার কিছুই সঞ্চয় হয় না—সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র-পরিবার বড় কষ্ট পায়। ধর্ম্মপথে গেলে সঞ্চয় করাটা শিক্ষা করিতে হয়—ধর্ম্মে, অর্থ-সঞ্চয় নহে—তেজসঞ্চয়; তেজসঞ্চয় হইলে ক্ষয় হয় না। আমার এই আয়, আমাকে যে কোন প্রকারে হউক না, ঐ আয়ের ভিতরে চালাইতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে মনের একটা দৃঢ়তা জন্মে। সেটা সংযম শিক্ষার অনুকূল! এইরূপে সংসারে থাকিয়া অনেক প্রকার সংযম শিক্ষা করা যায়। ভোগের পদার্থ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও যে মানব ভোগবাসনা দমন করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত সংযমী। নির্জ্জন বনবাসী মুনি-ঋষির সংযম অপেক্ষা ইঁহার সংযম অতি উচ্চাঙ্গের।

এইগুলি হইলে, ধর্ম্মসাধনের অধিকারী হইলে, তাহার পর ভগবানকে আরাধনা করিবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ।

সমাজ কি ?

বা

সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনুষ্য কি ?—তাহাকে আমরা এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে একটী শীর্ষস্থানীয় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; সুতরাং সমস্ত জাগতিক পদার্থের সম্বন্ধে যাহা সত্য মনুষ্যের সম্বন্ধেও তাহাই সত্য।

"আপ্ত বচনের" ভূমি হইতে এবং বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির ভূমি হইতে পূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে জগৎ স্রষ্টা বা পরব্রহ্ম জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন নহেন পরন্তু জগতের আত্মা-স্বরূপ যাবতীয় জাগতিক পদার্থের মধ্যেই আছেন—এইটা তাহার বিশ্বাধীনতা (Immanence)। আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে তিনি এই জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যান নাই—অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত জগতের অনন্ত দেশ অনন্ত পদার্থের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—এইটা তাঁহার বিশ্বাতীততা (Transcendence)। তাঁহার এই নিত্য বিশ্বাধীনতা ও বিশ্বাতীততার ফলে তিনি একই বস্তুতে থাকেন ও থাকেন না। এই কারণে যদিও প্রত্যেক পদার্থের সত্তা তাঁহারই উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক পদার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম নহে। প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটী দিক আছে—একটী ভিতরের দিক, একটী বাহিরের দিক—একটীতে ব্রহ্মের

বিদ্যমানতা একটীতে ব্রহ্মের অবিদ্যমানতা। * প্রথমটীতে নাম, রূপ, দেশ, কাল প্রভৃতি উপাধির দ্বারা বিভিন্ন ও বহু। (১) যেমন, 'আলো' 'ছায়া'র কারণ হইলেও তাহারা বিভিন্ন—কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি রহিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থের ভিতরের দিকটী—অর্থাৎ ব্রহ্মের দিকটী বহির্দ্দিকের কারণ হইলেও তাহারা বিভিন্ন—কিন্তু অবিচ্ছিন্ন—ইহারা পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

উপরে সকল পদার্থের পক্ষে যাহা বলা হইল মানুষের পক্ষেও তাহা বলা যাইতে পারে। মানুষেরও দুইটী দিক আছে—একটী অন্তর্দ্দিক বা ব্রহ্মের দিক আর অপরটী বহির্দ্দিক বা জগতের দিক। প্রথমটীতে সে অসীম, দ্বিতীয়টীতে সে সসীম। এই অসীমতা ও সসীমতার বিচিত্র সমাবেশে মানুষ একটী বিরোধময় পদার্থ হইয়াছে—"Man is a contradiction in himself." মানুষের ঐ আত্ম বিরোধকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য দর্শনকারগণ "Higher self" ও "Lower self" এই দুইটী কথার ব্যবহার করিয়াছেন। (২) আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণও ঐ একই বিরোধ বুঝাইবার জন্য "পরমাত্মা" ও "জীবাত্মা" এই দুইটী আত্মার কথা বলিয়াছেন। তবে এটা কেহ মনে করিবেন না যে ঐ বিরোধটী একেবারে চরম, অর্থাৎ "Higher self" বা "পরমাত্মা" ও "Lower self" বা "জীবাত্মার" মধ্যে আদৌ মিল নাই। বস্তুতঃ দ্বিতীয়টী প্রথমটীর বিরূপ মাত্র। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে যে "তত্ত্বমসি" নামক সর্ব্ববিখ্যাত মহাবাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এ দুইটী আত্মার ভেদের মধ্যে অভেদ দেখাইতেছে। তৎ=পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; "ত্বং"=জীবাত্মা; "অসি"=হও—অর্থাৎ, "হে জীবাত্মা! তুমিই পরমাত্মা হও।"

পূর্ব্বে যে 'আলো' ও 'ছায়ার' দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এই পরমাত্মা ও জীবাত্মার পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। ঐ অসীম পরমাত্মারূপ আলো সসীম জীবাত্মারূপ ছায়ার আশ্রয় ও প্রকাশক।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মা একটী বৃত্তের (circle) কেন্দ্র (centre), যে বৃত্তের পরিধি (circumference), জগৎ আর সেই পরিধিস্থ অসংখ্য বিন্দু (points in the circumference), অসংখ্য জীবাত্মা। যেমন বৃত্তের কেন্দ্র না থাকিলে পরিধিস্থ কোনও বিন্দুর থাকা অসম্ভব, সেইরূপ 'পরমাত্মা' না থাকিলে 'জীবাত্মার' থাকাও অসম্ভব, কেন না, পরিধিস্থ বিন্দুর মত

* "ব্রহ্মের অবিদ্যমানতা" কথায় আমরা যেন চমকিয়া উঠি: কিন্তু এখানে চমকিবার কিছু নাই। বুঝাইবার জন্য ভাষায় এই কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে। অবিদ্যমানতা মানে অনস্তিত্ব নহে। পরে আলো ও ছায়ার উপমায় ভাল করিয়া বলা হইয়াছে।

(১) উপাধিকভেদবাদ। পাশ্চাত্য দর্শনের,—"Unity-in-plurality বা One-in-many.

(২) Kantএর "Homo noumenon" ও "Homo prensmenon" নামান্তর মাত্র।

'জীবাত্মার'ও নিরপেক্ষ সত্ত্বা (indipendent existence) বা স্বাধীন সত্ত্বা নাই। পরিধিস্থ বিন্দুকে থাকিতে হইলে বৃত্তের কেন্দ্রাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে আর 'জীবাত্মা'কে থাকিতে হইলে পরমাত্মাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। উহাদিগের এই সাপেক্ষ সত্ত্বা আমরা সাধারণতঃ সাপেক্ষ সত্ত্বা বলিলে যাহা বুঝি তাহা হইতে অন্যরূপ। পর্ব্বত নিজে স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, মাটীর উপর দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং এখানে মাটীকে পর্ব্বতের সাপেক্ষ সত্ত্বা বলিতে হইবে, যেহেতু উহা নিজের অস্তিত্বের জন্য মাটীর অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু পর্ব্বতের এই সাপেক্ষ সত্ত্বা এবং পরিধিস্থ বিন্দুর বা জীবাত্মার সাপেক্ষ সত্ত্বা তুল্যরূপ নহে। তাহার কারণ এই যে পর্ব্বত নিজের অস্তিত্বের জন্য যে মাটীর অপেক্ষা করিতেছে, সেই মাটী পর্ব্বত হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু; কিন্তু পরিধিস্থ বিন্দু যে কেন্দ্রের অপেক্ষা করে, বা জীবাত্মা যে পরমাত্মার অপেক্ষা করে তাহা উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র নহে। পরিধিস্থ বিন্দু যেমন একটী বিন্দু, বৃত্তের কেন্দ্রও সেইরূপ একটী বিন্দু এবং 'জীবাত্মা' যেমন চৈতন্যময়, 'পরমাত্মা'ও সেইরূপ চৈতন্যময়। উহাদিগের এই সাপেক্ষ সত্ত্বা আরও ভালরূপে বুঝিতে হইলে 'সূর্য্য-রশ্মির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যাপেক্ষী হইলেও তাহা হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। মনে হয় যেন ঐ একই অনন্ত আলোকপিণ্ড সূর্য্য নিজেকে ঐ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-বিভিন্ন রশ্মিতে বিতরণ করিয়া তাহাদিগের সকলের অস্তিত্বের ভার নিজের উপর লইয়াছে। একটী বৃত্তের কেন্দ্রও ঠিক ঐরূপ, নিজেকে স্বপরিধিস্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-বিভিন্ন বিন্দুতে বিতরণ করিয়া তাহাদিগের সকলকার অস্তিত্বের ভার নিজে বহন করিতে থাকে—পরমাত্মাও ঠিক ঐরূপ অসংখ্য সীমাবদ্ধ পরস্পর-ভেদিত জীবাত্মার মধ্যে আত্ম-বিতরণ করিয়া তাহাদিগের সকলকারই সত্ত্বা নিজেই পোষণ করিতেছে।

আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের প্রতি একবার অভিনিবেস সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পরমাত্মারূপী কেন্দ্র জগৎ-রূপী পরিধির প্রত্যেক বিন্দুতে স্বাধিষ্ঠান করতঃ উপাধির সীমার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। সুতরাং জীবাত্মা বলিলে শুধু ঐ উপাধির সীমা বুঝায় না। পরন্তু ঐ অসীম পরমাত্মার বিন্দু ও ঐ উপাধির সীমা উভয়কেই বুঝায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে উপাধি-কল্পিত-সীমা-বেষ্টিত অসীম পরমাত্মা-বিন্দুই জীবাত্মা। (৩)

এইরূপে জীবাত্মা বা মানবাত্মা অসীমতা ও সসীমতার দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া উহা তাহাদিগের একটী দ্বন্দ্বভূমি, যে দ্বন্দ্বভূমিতে ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় মানবজাতির সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের ঐ দ্বন্দ্বাভিনয়ের পুনরভিনয় করিয়া চলিয়াছে। একবার একটু ভাবিলেই ঐ অভিনয় কিরূপ তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) যে জিনিষের সীমা নাই, তাহার অংশও নাই। সুতরাং অসীম পরমাত্মা নিরংশ। কেবল ভাবার বুঝাইবার জন্য 'পরমাত্মা-বিন্দু' বলা হইল।

আমি এক মহাশ্মশানের উন্মুক্ত বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছি ; প্রতিপদে চরণদ্বয় নরাস্থিতে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে ; ভাবিলাম আমা'রও ত পরিণাম এই অস্থি ; হতাশে ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া পড়িলাম ; কিন্তু এই সময় হঠাৎ কে যেন আসিয়া বলিল—আমার পরিণাম ঐ অস্থি নয়, আমার পরিণাম নূতন জীবন ; আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া আবার চলিতে লাগিলাম—এই আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বই যে ঐ অসীম ও সসীমের দ্বন্দ্ব। আমি একমাত্র পুত্রের বিয়োগে শোকক্ষিপ্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতেছি ; বন, উপবন, গিরি, নদী, সমস্তই এক শূন্যময় মরুভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে ; আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে বা নিমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব ভাবিতেছি ; এমন সময় কে যেন আসিয়া বলিল,—পুত্র নাই বলিয়া কি ঐ বন, উপবন, গিরি, নদী কিছু নাই, ওরা যে আমার আছে, ওদের সঙ্গে যে আমি এতকাল বাস করিয়া কেমন যেন এক স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন আমি কেমন করিয়া কাটিয়া যাইব ; আবার সান্ত্বনায় শমিত হইয়া জীবনধারণে সমর্থ হইলাম—এই শোক ও সান্ত্বনার দ্বন্দ্বই যে সসীম ও অসীমের দ্বন্দ্ব। আমি দেখিতেছি আমাদের দুই ভ্রাতার মাঝে এক বিশাল ভূসম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারত্ব রহিয়াছে ; আত্ম-সুখ ভোগের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি আমার মনকে মাতাইয়া তুলিতেছে ; শেষে ভ্রাতার প্রাণ-সংহার করিয়া সেই প্রবৃত্তির সাধনে তৎপর হইয়াছি, এমন সময় কে আসিয়া বলিল,—ভ্রাতার জীবন কি বিষয় অপেক্ষা বড় নয় ? ত্যাগ কি ভোগের অপেক্ষা বেশী তৃপ্তিকর নয় ? আবার ভোগের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া ত্যাগের প্রবৃত্তির সাধনের জন্য উদ্যত হইলাম—এই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বই যে সসীম ও অসীমের দ্বন্দ্ব। মনুষ্যজীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার কুত্রাপি ঐ দ্বন্দ্বের বিরাম নাই।

এখন মানুষ চায় কি ? মানুষ চায় ঐ দ্বন্দ্বের চিরাবসান। কিন্তু যতদিন না জীবাত্মা তাহারই সেই উপাধি রচিত সীমার অবরোধ ভাঙ্গিয়া সেই অসীম পরমাত্মায় সম্পূর্ণরূপে লীন বা অধিষ্ঠিত হইতে পারে, ততদিন ঐ দ্বন্দ্ব কিছুতেই ঘুচিবে না। জীবাত্মার এই পরমাত্মার সম্যকভাবে অধিষ্ঠানের নামই স্বরূপে অবস্থান (কারণ পরমাত্মাই যে তাহার স্বরূপ বা নিজের আসল রূপ)—আর তাহার এই স্বরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। (৪) সুতরাং আমরা বলিতে পারি মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি।

যদি কেহ মনে করেন যে মুক্তি আমাদিগের দার্শনিক চিন্তার একটী মস্ত বড় সিদ্ধান্ত বটে কিন্তু তা বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ের কথা নহে, তাহা হইলে তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। যদি কেহ স্থিরচিত্তে সংসারের কর্ণভেদী কোলাহলের অন্তরালে বসিয়া কোন দিন তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ

---

(৪) "মুক্তিৰ্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবৎ (২ | ১০ | ৬)

অর্থাৎ,—"আত্মা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে আপন স্বরূপে অবস্থিত করে, তাহারই নাম মুক্তি।"

অন্তর্দ্দৃষ্টিকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন এক প্রবল চেতনা-স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, শুনিতে পাইবেন, সে আকুলভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে বলিতেছে,—"কোথায় অসীম চৈতন্যসাগর—কোথায় তুমি! তোমার ঐ অনন্ত-বিস্তৃত বক্ষের উপর আমাকে স্থান দাও, এ সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাকে মুক্ত কর।"

মুক্তির জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা যে মানবের ধর্ম্ম—না, আরও জোর করিয়া বলিলে বলিতে পারা যায়, মুক্তির জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতাই মানবতা। এমন মানুষ আছে কি, যার এই ব্যাকুলতা নাই! যখন উদার-উন্মুক্ত অনন্তের বক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহারী পক্ষী ক্ষুদ্র পিঞ্জরের ভিতর লৌহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়, তখন যখন সে আবার একবার সেই অসীম গগন-পথে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার ফলে পুনঃ পুনঃ পিঞ্জরের কাছে বাধা পাইয়া যাতনা পায়, সেই যাতনা কি সেই পিঞ্জর হইতে তার মুক্তির জন্য অস্থিরতা আরও বাড়াইয়া দেয় না? বাহ্যিক চাকচিক্যে পিঞ্জর তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে বটে, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? আমরাও ঐ পক্ষীর মত অসীম পরমাত্মার সীমাহীন চিদাকাশে অরুদ্ধ গতিতে উড়িতে উড়িতে এই সসীম ভৌতিক জগতে, সীমাময় দেহ-পিঞ্জরে কাম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যখন আবার একবার সেই অনন্ত-গগন-তলে উঠিতে চাই, তখন এই সীমাময় অবরোধ বাধা দিয়া যে যাতনা দেয়, সেই যাতনা কি সেই অবরোধ হইতে আমাদিগের মুক্তির জন্য অস্থিরতা বাড়াইয়া দেন না? বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে সে অবরোধ আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে বটে, কিন্তু সেই বা কতক্ষণের জন্য? শৈশবে যদিও ভুলিয়া থাকি, কৈশোরে ত থাকি না—কৈশোরে যদিও থাকি যৌবনে ত থাকি না—আর যৌবনে যদিও থাকি বার্দ্ধক্যে ত থাকি না। একদিন না একদিন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যায়—একদিন না একদিন মুক্তির জন্য এ ব্যাকুলতা, এ অস্থিরতা, পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠে। (৫)

এইবার আমরা ঐ মুক্তির প্রশস্ত পথ কোনটী তাহাই খুঁজিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ, বি, এল।

(৫) আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভোগের মধ্য দিয়াও আমাদিগের অনন্তমুখী পিপাসা সীমাহেতু সম্পূর্ণরূপে মিটে না বলিয়া আমরা বেদনা পাই এবং সময় সময় ঐ সীমার হাত হইতে মুক্তির জন্য এত ব্যাকুল হই যে ভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করি। যেমন, যদি কেহ তাহার প্রিয়জনের সহিত অনন্ত মিলন-সুখ ভোগ করিতে চায় কিন্তু যখন তাহা সেই প্রিয়জনের সীমাময় জীবনহেতু অতৃপ্ত রহিয়া যায়, তখন হয় ত সে এই সীমাময় সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহার হাত হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুলচিত্তে ভোগ-পথ ছাড়িয়া সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করে। এ জগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কবি-কুঞ্জ।

"বঙ্গবধূ।"

বাঙ্গালা দেশের বধূ তুমি বাঙ্গালা দেশের মেয়ে,
চোখের পরে স্বর্গ হেরি তোমার পানে চেয়ে,
তোমার শুভ্র শাঁখার সুরে,
দুঃখ জ্বালা যায়গো দূরে,
লক্ষ্মীমাতা হাসেন সুখে তোমার আঙ্গিনায়,
শান্তিধারা তোমার গৃহে সকল সময় বয়।
তোমার করুণ কণ্ঠস্বরে,
স্বামীর হিয়া আকুল করে,
বেণুর মত কোমল তানে ভুলাও স্বামীর প্রাণ ;
তপ্ত প্রাণের জুড়িয়ে জ্বালা, কর শান্তি দান।
তোমার মুখের মৃদু হাসি,
বর্ষে কি এক সুধার রাশি,
নিঃস্ব হলেও মহৎ সেগো সারা ধরার মাঝে ;
যাহার গৃহে এমন ধারা বঙ্গবধূ রাজে।
সাঁঝের বেলা প্রদীপ হাতে,
তুলসী তলায় সন্ধ্যা দিতে,
ধীরে ধীরে যাও গো তুমি ভক্তিরাশি নিয়ে,
হেরি মোরা লক্ষ্মী মাতায় তোমার পানে চেয়ে।
ভারত রামায়ণের গানে,
শৈব্যা সতীর উপাখ্যানে,
মনটি তোমার কর রত গৃহ কাজের পরে,
সতীর দুঃখ পাঠে তোমার চক্ষে বারি ঝরে।
বঙ্গ-গৃহের পালন তরে
(বিধি) ভার দিয়েছেন তোমার করে,
পালন কর বঙ্গ-গৃহ তোমার কোমল ভুজে ;
সদা যেন দেবের আশীষ মাথে তোমার রাজে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

অন্যের কর্ম্মফল।

(সংস্কৃতানুবাদ)

পাপ কার্য্য করে খল
সাধু তার পায় ফল।
জানকীরে হরিল রাবণ
পারাবার পরিল বন্ধন ॥

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

কেন ?

কেন মরণ তুষার ভেদিয়া (মোর)
উঠিছে নীরব কাতর শ্বাস ?
কেন উঠিছে রজনী উঠিছে দিবস
উঠিছে বরষ মাস ?
কেন জড়ায়ে জড়ায়ে ব্যাপিছে ভুবন
ঢাকিছে গগন দেশ ?
কেন মথিত করিছে হৃদয় আমার
কিসের তাহার দ্বেষ ?
কেন গরল আমার করিছে শিথিলে
কিসের কারণে হায় ?
কেন সিক্ত করিয়া সন্ধ্যা 'লালিমা'
কোমল কঠোর চায় ?
কেন জাগিছে জীবনে গম্ভীর স্বননে
গ্রথিত বেদনা সুর ?
কেন সে দৃপ্ত মহিমা রিক্ত গরিমা
সকলি করিছে চুর ?
কেন ভাজিয়া মলিন দীনতা আমার
দিতেছে কুসুম-রাশ ?
কেন সুখের স্বপন দেখায়ে আমারে
হাসিছে মৃদুল-হাস ?

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

প্রবাহিনী।

(১)

স্ফীত বক্ষে হাস্য মুখে কোথা যাও নারী।
কালের ভ্রূকুটী কত
উপেক্ষিয়া যুগ শত
কাহার উদ্দেশ্যে এত ঢালিতেছ বারি ?

(২)

ভীষণ প্রলয়ে কত সৃষ্টি বিবর্ত্তন,
কিন্তু তুমি সেই ভাবে,
চির কুলকুল রবে,
কালসঙ্গে নানারঙ্গে করিছ গমন।

(৩)

কত লীলা জান তুমি ওগো মায়াবিনি !
দিনে রবি সমুজ্জ্বল
রাতে তারা ঝলমল
তোমার প্রশান্ত বক্ষে হাসে নিশামণি।

(৪)

এই দেখি ধীর, স্থির, উদার, গম্ভীর
সুন্দর তোমার আস্য,
ক্ষরিছে মধুর হাস্য
বিলাইছ দুই করে স্নেহ জননীর।

(৫)

চেয়ে দেখি পরক্ষণে মূর্ত্তি সংহারিনী
পর্ব্বত প্রমাণ ঊর্ম্মি
অতিক্রমি বেলা-ভূমি
নিমজ্জিতে সমুদ্যত সমগ্র অবনী।

(৬)

বল দেখি কল্লোলিনি ! ভূধর নন্দিনি !
কার প্রেমে উন্মাদিনী
লুটায়ে হৃদয়খানি
হেন বেগে ছুটিতেছ দিবস-যামিনী ?

(৭)

কার তরে ফুটে ফুল তোমার সৈকতে ?
কুতুহলে ভরি ডালি
নিত্য তুমি ফুল তুলি,
কোথায় লইয়া যাও কাহারে পূজিতে ?

(৮)

কার তরে বহে বায়ু সৌরভে মাতিয়া ?
গাঁথি রম্য ঊর্ম্মিহার
বুকে লয়ে ভারে ভার,
কার পদ সেবিবারে যেতেছ ছুটিয়া ?

(৯)

সকরুণ সুরে গাও কাহার উদ্দেশ্যে ?
মধুর সঙ্গীত হেন ?
সপ্ত স্বরা বীণা যেন
অপ্সরার করে বাজে অমর নিবাসে।

(১০)

দেখা তুমি তাঁর কিগো পেয়েছ কখন ?
নিশিদিন নাহি গণি,
নাহি শ্রান্তি অনুমানি,
যাঁর পদ পূজিবারে এত আয়োজন।

(১১)

বল বল পাব কোথা তাঁর দরশন,
ভেসে গেলে তব স্রোতে
পাব কি মরণ পথে
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ব্রজের রতন।

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়।

ধনীর আদর।

কাঁচ বসান আংটী যদি রাজার হাতে দেখে
হীরা বলে সবাই তাহা আদর কোরে ডাকে।
চাষার হাতে সোনার বালা, দেখ্‌লে পরে সবে,
কেউ না করে আদর তাহার —পিতল বলে ভাবে,

শ্রীসুধীরেন্দ্র কুমার সান্যাল।

প্রেম।

প্রবাহিনী বহে যায় সাগরের পানে,
মিলাইতে দেহ তার বাঞ্ছিতের সনে।
সেইরূপ, হৃদি মোর চাহে অনিবার ;
পুলকে মিশিতে পদ-পঙ্কজে তাঁহার !

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

পূজা।

তোমার পূজা করিব আমি
এমন শকতি নাই,
তবু যা করেছি, আজি যা' এনেছি
তোমা হতে সব পাই।
আপন মানুষ এলে তুমি ঘরে,
অতিথি তোমায় বলি কেমন করে ;
তুমি যদি এলে, যেওনাকো চলে,
এস প্রাণে মিশে যাই !
লজ্জা বস্ত্র-সজ্জা-আবরণে,
বর্ণ ঢাকি' স্বর্ণ আভরণে ;
আপন জনে দিব কিগো ফাঁকি,
ছি ছি লাজে মরে যাই !
তবু যদি তুমি থাকো মান-ভরে,
এস—তব পূজা দিব ঘরে ঘরে ;
নয়নের জলে দিব ঢালি সখা,
তোমার পূজার ঠাঁই !
তোমার পূজা করিব আমি
এমন শকতি নাই !

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিদান।

কতকাল বঁধু তোমারে ভুলিয়া
শতদুঃখ বুকে নিয়েছি টানিয়া
সদা দিছ মোরে যাচিয়া যাচিয়া
শতেক স্নেহের দান
কিবা দিব প্রতিদান।
চিনেছি তোমারে এ জীবনে আর
কভু ভুলিব না আদেশ তোমার
যাপিব জীবন গাহি অনিবার
তোমার প্রেমের গান
এই দিছি মনে স্থান।
হৃদি-মন-প্রাণ সকলি তোমার
কি দিবার আছে বল না গো আর,
আছে মনে মোর বাসনা অপার—
সতত গাহিতে গান
লভিতে সুযশ মান।
যত যশোলিপ্সা বঁধু আজ হর
সে বাসনা দিনু চরণে তোমার
লহ বঁধু লহ এই উপহার
এই মোর প্রতিদান
দেহ তবে পদে স্থান।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা।

উক্ত ভাবদ্বয় সাধারণতঃ হিংসাবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া মানবকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করে। ধর্ম্মপথগামী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই দুই কলুষভাব দূরীভূত করিয়া মানস-সরোবরকে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল করা একান্ত কর্ত্তব্য। মনকে কলুষিত করিতে, তাহার কমনীয় ভাব বিদূরিত করিতে এমন শত্রু আর নাই; যাহারা সদাসর্ব্বদা উক্তরূপ দোষদুষ্ট হইয়া মনপ্রাণের মলিনত্ব সাধন করে—তাহাদের তুল্য পাপী আর নাই—রৌরবেও তাহাদের স্থান হয় না।

আমরা জানিয়া শুনিয়াও ইহার হাত এড়াইতে পারি না; পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা না করিয়া যেন আমরা তিলমাত্র থাকিতে পারি না। ইহা যেন আজকাল আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংক্রামক রোগরূপে পরিণত হইয়াছে। এমন স্থান বা এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা না করিয়া জলগ্রহণ করেন। আজকাল সমাজে যেন ইহার আধিক্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অপরাপর সৎকথা, সৎপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন যেন লোকে পরপ্রসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। কেন এমন হইয়াছে; কেন এরূপ ভীষণ পাপে আমাদের মন ক্রমশঃ মজিতে প্রয়াসী হইয়াছে? পূর্ব্বে ত কই এরূপ ছিল না, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা লইয়া ত পূর্ব্বে কই লোকে এত জল্পনাকল্পনা করিতে ইচ্ছা করিত না। সময় পাইলে পূর্ব্বে লোকে সৎকথা, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াই অতিবাহিত করিত—ভুলেও পরের মন্দ চিন্তা লইয়া কাল কাটাইত না। এখন যে এরূপ হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—আমরা প্রাণের উদারতা হারাইয়াছি, সকল কর্ম্মে হীনবল হইয়াছি, নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তাই পরের দেখিয়া হিংসা হয়—পরের উন্নতি দেখিলে প্রাণে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করি। হৃদয়ের সে প্রশস্ততা আর নাই—সে মহাপ্রাণতা নষ্ট করিয়া আমরা প্রাণকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া কাহার ভাল দেখিতে পারি না; তাই কেহ একটী ভাল কাজ করিলে বা কোন প্রকারে আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা করিলে সে আমাদের চক্ষুশূল হয়—আমরা নানা প্রকারে তাহার দোষ না দেখাইয়া থাকিতে পারি না। আমি যাহা করিতে পারি না—যাহা করিতে আমার শক্তি কুলায় না, অন্যে তাহা সম্পাদন করিল—যশোমণ্ডিত হইল; আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হিংসায় ফাটিয়া মরিলাম, নানা প্রকারে তাহার কুৎসা রটনা করিতে লাগিলাম; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের হৃদয়-পথের বিকাশ কম হইয়া গিয়াছে আমরা সকল সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি? আমি হয় ত একটা কাজ করিয়াছি; একটা ভাল কাজ আমার দ্বারা হয়ত হঠাৎ সম্পন্ন হইয়াছে; অপর দুই এক জন হয়ত তাহা পারিল না—অমনি তাহাদিগকে অতি হীন, অপদার্থ মনে করিয়া আমি তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিলাম; ইহা আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাহাকে অসমর্থ দেখিয়া তাহার

কার্য্যে বিরক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে; আজ তাহার দ্বারা যে কার্য্য হইল না, চেষ্টা করিলে কাল তাহার দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব তাহার জন্য মনে মনে অহঙ্কার বা নিন্দার ভাব কেন উদয় হয়? তুমি উচ্চ পদারূঢ় হও কিন্তু তাহার জন্য অহঙ্কৃত হইও না, লোক সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া তাহাদের নিন্দা করিও না, বরং তোমার সমান করিতে, মানুষ হইয়া মানুষকে মানুষ করিতে যত্নবান হও—তোমার মহত্ত্ব অটুট থাকিবে। নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা, সৎশিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলো, কেবল নিন্দা করিয়া, গল্প গুজব করিয়া বেড়াইও না; মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার উপায় জানিয়া তাহা প্রস্তুত কর, আহার কর, তবে ত পেট ভরিবে—নতুবা কেবল দোকান দেখিয়া তাহার গল্প করিয়া বেড়াইলে ফল কি?

যখনই পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা তোমার মনে উদয় হইবে, তখনই একবার নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অকর্ম্মণ্যতার বিষয় চিন্তা করিবে; দেহ-গেহের অর্গল মোচন করিয়া তাহার আবর্জ্জনা রাশির প্রতি একবার অপাঙ্গ দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে তুমি কি, তাহা হইলে আর পরনিন্দা-পরচর্চ্চা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না। পরের বিষয় লইয়া বৃথা কাল-ক্ষেপ না করিয়া আপনার বিষয় চিন্তা করিবে। আমাদের নিজের দেখিবার শুনিবার, করিবার ভাবিবার এত বিষয় আছে; এত দুর্ব্বলতা, এত সামর্থ্যহীনতা আমাদের ঘেরিয়া রহিয়াছে যে, তাহাতে সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত করিলেও যখন সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব, তখন পরের বিষয় চিন্তা করিয়া কাটাইবার আমাদের সময় কই?

আমরা পরের দোষ দেখিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে বড়ই উৎসাহিত হই কিন্তু নিজের যে কত দোষ, কত ভুলভ্রান্তি তাহা একবার ভুলেও দেখিতে চেষ্টা করি না বা তাহা সংশোধনের জন্য ভাবনা আদৌ আমাদের হয় না। কত দোষে যে নিজে মাটী হইয়া যাইতেছি; আমার অন্তরাত্মা যে কত বিষম দোষে মলিন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার জন্য ভুলেও না দেখিয়া, তাঁহার মালিন্য মুছাইবার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া পরের দোষ দেখিলে কি হইবে ভাই! আগে নিজেকে ঠিক কর, নিজের ঘর সামলাও, তারপর পরের জন্য চেষ্টা করিও, আগে নিজেকে সকলের প্রিয় করিতে যত্নবান হও, তার পর পরের ভালবাসা লাভে প্রয়াসী হইও। পরে তোমার মনের মত নয় বলিয়া তাহাকে নিজের মত করিবার জন্য তাহার নিন্দা কর কিন্তু ভাই তুমি এ জগতে কয় জনের মনের মত হইতে পারিয়াছ, কয় জন তোমার মহত্ত্বলাভে ধন্য হইতে পারিয়াছে? পরের নিকট ভালবাসা, পাইবার আগে পরকে ভালবাসিতে শিখ। পরের নিকট সৌজন্য পাইবার আগে আপনি সুজন হওয়া উচিত নয় কি? কোন কাজে নিজে অগ্রে মুগ্ধ না হইলে পরকে মুগ্ধ করা যায় না, আপনি না কাঁদিলে পরকে কাঁদান মহা দায়। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যতক্ষণ তুমি নিজে মুগ্ধ না হইয়া যাইবে, ততক্ষণ

অপরকে মুগ্ধ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। এ জগতে তোমার অপেক্ষা কাহাকেও ছোট দেখিও না; নিজেকে ছোট দেখ, অন্য বস্তু দেখিবার পূর্ব্বে তোমার দর্শনশক্তি কোনরূপে দূষিত হইয়াছে কি না, পরীক্ষা কর; তারপর কে ভাল কে মন্দ বিচার করিতে যাইও। নিজে হীন হইয়া সহস্র দোষ দুষ্ট হইয়া যে পরের নিন্দা, পরের চর্চ্চা বা পরের ছিদ্রান্বেষণ করে, তাহার তুল্য মহা পাপী আর নাই।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" এমন যে সত্য কথা, যাহার একমাত্র আশ্রয়ে মানুষ স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে—শাস্ত্র তাহাও বলিতে নিষেধ করিতেছেন,—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" —"অপ্রিয় হইলে, উদ্দ্বারা কাহার প্রাণে আঘাত লাগিলে কদাচ তাহা বলিবে না।" তবে কেন যে আমরা পরের নিন্দা করিয়া কালক্ষেপ করি—তাহা বুঝিতে পারি না।

এ জগতে মানুষ মানুষ হইতে আসিয়াছে, নিজের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতে পারি আমরা তাহার জন্যই মহামায়া কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই মায়ার সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তিনি আমাদের বিশ্বজননী আমরা সকলেই তাহার প্রিয় সন্তান, প্রত্যেকেই সহোদর এক ভাইয়ের দোষ হইলে অপর ভাইয়ের মাথাও হেট হইয়া থাকে। অতএব তাহার নিন্দা না করিয়া তাহার দোষের সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। জীবনের উদ্দেশ্য অনুসারে আমাদের সকলকেই কোন দুরারোহ পিচ্ছিল পথে যাইতে হইতেছে, এ অবস্থায় সকলকেই সদ্ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া উপরে উঠিতে হইবে। পরস্পর বন্ধুভাবে, প্রেম-ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়া মনের আনন্দে যাইতে না পারিলে অনতিক্রমণীয় সংসার সুমেরু উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। পরনিন্দা পরচর্চ্চা দ্বারা বিড়ম্বিত হইলে উত্থান অপেক্ষা পতনের সম্ভাবনাই অধিক। এক্ষেত্রে একান্ত মনে সকলে নিজ নিজ আত্ম-সম্মান, নিজ নিজ পদ মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়া নিজের ভাবনা ঠিক করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে ভবতারিণী মায়ের কৃপা-লাভ হইবে, তোমার ক্ষুদ্র শক্তিতে শক্তিরূপিণী মায়ের মহা-শক্তি সঞ্চারিত হইবে; তুমি অবহেলায় এই ভবাব্ধি উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চির ঈপ্সিত সেই আনন্দ-কাননে আনন্দময়ীর চরণ মকরন্দের সুধাপানে বিভোর হইবে—ভবের ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না—গোষ্পদের ন্যায় এই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া চির অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

সম্পাদক।

চাট্‌নী।

দশহারার দিন গঙ্গার ঘাটে কত লোকে কত কি স্তব স্তোত্র পাঠ করিতেছে। স্নানান্তে কেবলরামেরও ভারি ইচ্ছা হইল, সে অমনি গোছের কিছু একটা পাঠ করে। সম্মুখে রামেশ্বর ন্যায়রত্নকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "গঙ্গাদেবীরে কি কেইয়া ন্যাবা ন্যায়।"

রামেশ্বর।—কও, হে মা জাহ্নবী, আমি তোমারে নমস্কার করি। আমার পাপ

খাওাইয়া দাও।

কেবলরাম।—কি কইলেন, মা জাহ্নবী।

রামেশ্বর।—হাঁ, মা গঙ্গাদেবীর নামই ত জাহ্নবী।

কেবলরাম।—গঙ্গাদেবীর নাম জাহ্নবী। থামেন, থামেন।

কেবলরামের আর 'স্যাবা দেওয়া' হইল না; সিক্ত বস্ত্রেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ঘরে আছেন নি?"

"কে ডাহে" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কেবলরাম আভূমি প্রণতঃ হইয়া কহিল "একটা ব্যবস্থা লইতে আইচি।"

ভট্টাচার্য্য।—কও দেখি কি?

কেবলরাম।—আমার মাইয়ার নাম জাহ্নবী, আর মা গঙ্গাদেবীর নামও জাহ্নবী। আমি মা গঙ্গাদেবীরে স্যাবা দিতে পারি কি না?

সমস্যাটা কিছু কঠিন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুদ্ধির গোড়ায় ঘন ঘন নস্য প্রদান করিতে লাগিলেন। স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রমন্ত্রাদির পুঁথি পাঁথা যা ছিল, কিছু অনুসন্ধান করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেষে বহু গবেষণার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আইচ্ছা কেবলরাম!"

"কি কন?"

"তোমার যে মাইয়া জাহ্নবী, সে তোমার বয়ঃজ্যেষ্ঠা না কনিষ্ঠা?"

কেবলরামের এটা ত জানা ছিল না। সে প্রমাদ গণিল। কি করে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গৃহে গৃহিণীর কাছে গমন করিল।

"গৃহিণী গৃহিণী"

গৃহিণী।—কি কও

কেবলরাম।—তোমার যে মাইয়া জাহ্নবী, সে আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠা না কনিষ্ঠা?"

প্রশ্নে গৃহিণীর প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। তিনি সম্মার্জ্জনী হস্তে মিষ্ট আলাপ করিলেন "তবেরে পোড়া চোপা, আমি তোরে প্যাটে ধরছি না জাহ্নবী প্যাটে ধরছে।"

কেবলরাম অতঃপর গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিতে ক্ষান্ত হইল।

(২)

গৃহিণী পীড়িতা। কেবলকে কহিল "সরস্বতী পূজার কি কল্লা? আমি ত কিছু কত্তে পাল্লাম না।"

কেবলরাম উৎসাহের সহিত কহিল—"ভাব ক্যান্। আমার হাত আছে, পাও আছে মায়ের ইচ্ছায় ইট্টু ইট্টু বুদ্ধিও আছে। তুমি বৈসা বৈসা কাবল দ্যাখ; আমি কি করি উঠি"

কেবলরাম বাজারে হাজির, মুদির দোকানে গিয়া কহিল—"পূজার নৈবিদ্য চাই; কত পয়সা লাগ্‌ব?"

দোকানদার।—কত দিতে পারবা?

কেবলরাম।—দুই গণ্ডা।

দোকানদার দোকানের কানাচ হইতে একটা ছোট কদলী বৃক্ষ লইয়া আসিয়া কেবলকে দিল। কেবল রাগান্বিত, কহিল "কি আমারে বোকা বানাইছ! কলাগাছ নবিদ্যে লাগে!"

দোকানদার কহিল "আরে কলাইত নবিদ্যে লাগে। ঘরে নিয়া থোও, বড় বড় কলা জন্মাইব।"

কেবলরাম পূজার জোগাড় করিয়া ফেলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজা করিতে বসিয়াই

চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আরে, আরে, সর্ব্বাঃ নষ্টাঃ সর্ব্বাঃ নষ্টাঃ।"

কেবল সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "অইল কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুপিত। কহিলেন "এইটা কি? আচারভ্রষ্টাঃ অনাচারাঃ।"

কেবল সসম্ভ্রমে কহিল—"কান্. উনিইত অইলেন নবিন্ন। কলা ত বাজারে দ্যাখতে পাইলাম না। হেইযার লইয়া এনারে পূজা করতে আনচি। ঘরে লইয়া রাখেন কলা জন্মাইব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলাগাছ কুচান নৈবেদ্যখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—"অরে পাপাষ্ঠ; আমার লগে উপহাস কর্তে আছ। গাছ কুচা কুচা কর্চ ক্যান্? তোমার বিন্না অইচে, না ভগবতী পূজা কর্চ;—আমারে গরু বানাইচ।"

কেবলরাম হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন যে এমন হইল বুঝিতে পারিল না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

লেখক ও গ্রাহকগণের প্রতি।

সাময়িক পত্র পরিচালনে দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলেও আমরা দুর্গতিনাশিনী মায়ের কৃপায় ১৩২৫ সাল শেষ করিলাম। নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন কার্য্য-পরিচালনের অন্তরায় হইলেও আমরা সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছি। তবে কোনরূপ ক্রটী পরিলক্ষিত হইলে কৃপাময় গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ মার্জ্জনা করিয়া লইবেন—ইহাই প্রার্থনা।

আলোচনার উদ্দেশ্য মহৎ। নূতন লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে "আলোচনা" যতদূর উৎসাহ প্রদান করে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, দেশে আর কোন পত্রিকা তাহা করে না। যেমন লেখাই হউক, সংশোধন করিয়া তাহা "আলোচনায়" প্রকাশ করিয়া নূতন লেখকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করি। উৎসাহ পাইলে সকলের হৃদয়ই সৎসাহসে পূর্ণ হয়। আমাদের পত্রিকায় লিপিচালনা করিয়া অনেক লেখক এখন বড় বড় মাসিকে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। "আলোচনা"র উৎসাহে অনেকে লেখক হইয়া গিয়াছেন, এরূপ একখানি পত্রিকার দীর্ঘজীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয়, অতএব নবীন লেখকগণ ও গ্রাহক মহোদয়গণ সকলেই দয়া করিয়া এবার বার্ষিক সাহায্য সমথ পক্ষে ৩৲ টাকা করিয়া প্রদানে আমাদের সহায়তা করিবেন।

নবীন লেখকগণের প্রতি আমাদের আর একটী নিবেদন এই যে লিখিবার পূর্ব্বে পাঠের অত্যন্ত আবশ্যক; যত বেশী পড়া থাকিবে প্রবন্ধ তত ভাল হইবে. এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত, চেষ্টা করিয়া যাহাতে প্রবন্ধ ভাল হয়, উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—তাহার প্রতি লেখকের দৃষ্টি না থাকিলে লেখক কখন জনসমাজে সমাদৃত হইতে পারেন না। আমরা উৎসাহ দিতে পারি, সময় পাইলে সংশোধন করিয়াও পত্রস্থ করিতে পারি কিন্তু উন্নতির চেষ্টা নিজে না করিলে প্রবন্ধ ভাল হইবে কিসে? আজকাল দেখিতে পাই, আবর্জ্জনাপূর্ণ কবিতাই সকলে পাঠাইয়া দেন, তাহার না আছে ভাব, না আছে ভাষা, এরূপ কবিতা যে কত আমাদের হস্তগত হয় তাহার সীমা নাই। সকলেরই ইচ্ছা নাম প্রকাশ করিব কিন্তু তাহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে তাহাতে সুনামের পরিবর্ত্তে দুর্নামই উপার্জ্জন করা হয়। নাম একবার খারাপ হইলে আর ভাল হওয়া দুষ্কর, এইজন্য লেখার সময় একটু পড়াশুনা এবং সাবধানতা আবশ্যক। গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে কেহ চেষ্টা করেন না কেন বলিতে পারি না; তাহা কষ্টসাধ্য এবং অনেক পড়িতে হয় বলিয়া যা তা একটা পদ্য লেখা অনুচিত। এই জন্য নবীন লেখকগণকে লেখার সময় প্রবন্ধটী সাধ্যমত ভাল করিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি, তার পর আমরা দেখিয়া দিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ESTABLISHED 1293 B. S.

একবিংশ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৪। [১২শ সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১৷৹ টাকা।

1918.

হাওড়া, ৫ নং [illegible] ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগল কৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলোচনার প্রধান পরিচালক

কলিকাতা পোস্তার রাজবাটীর বদান্যবর

কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর।

২৫নং দরমাহাট্টা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচনার লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহ রায় এম, এ বি, এল—১২৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ম্মযোগ প্রেস—হাওড়া। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র রায় বি, এল মণ্ডলা সি, পি। শ্রীমহেন্দ্র মোহন ঠাকুর, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম কাব্যনিধি—পোঃ হালুয়াঘাট আড়াই আনীর কাছারী, ময়মনসিংহ। শ্রীযোগেন্দ্র মোহন বিশ্বাস, খড়গা—ময়মনসিংহ। শ্রীমনীষীমোহন রায় কলিকাতা। শ্রীগদাধর চক্রবর্ত্তী, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীতারিণীচরণ রায়, রায়ঠেঙ্গা, জলপাইগুড়ি। শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস, ডমকা। শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায় The Bower. Pan Bazar, Gouhati. শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকা, খুলনা। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া। শ্রীবলাইলাল মুনসী, বাঁটরা।

ভগবত্যাঃ শতনাম-স্তোত্রম্।

শৃণু মাতঃ প্রবক্ষ্যামি তব নাম শতাষ্টকম্।
যস্য প্রসাদ মাত্রেণ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
আদ্যা শ্যামা শিবানী চ কামিনী কালনাশিনী।
ভক্তিস্তুষ্টিঃ প্রভা মুদ্রা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
ঘোররূপা মহামায়া নিত্যা কালবতী জয়া।
জ্বলিনী তপিনী জন্যা মুক্তিরূপা ভবপ্রিয়া॥
ঘোরদংষ্ট্রা কুমারী চ বৃদ্ধা সন্ধ্যা যশস্বিনী।
মহাশক্তি বিশ্বমাত ভব্যা ধাত্রী কপালিনী॥
কলকণ্ঠী কম্বুকণ্ঠী আশা সিদ্ধি রুচিপ্রদা
অভয়া পার্ব্বতী বামা মানদ শুভদা সদ॥
রজোরূপা ত্রিনেত্রাচ জগদম্বা নলা সতী।
যোগমায়া শুভামাতা মাননীয়া ক্ষমাবতী॥
উদ্রতারা অপর্ণাচ সাধ্বী পুষ্টি মনোহরা।
চঞ্চলা শঙ্করী কৃষ্টা দেবমাতা বসুন্ধরা॥
ভবানী জননী সীতা করাল্পরূপা বিভূতিনী।
শক্তিদা ভক্তিদা পুষ্প অগ্নিরূপা তপস্বিনী॥
পদ্মাবতী তুঙ্গভদ্রা লক্ষ্মীরূপা সুতল্পিকা।
ব্রাহ্মণী সুন্দরী কাম্যা চণ্ডীরূপা সুভদ্রিকা॥
কুপটা বাসনা মেনা চিত্ররূপা করালিনী।
জগদ্ধাত্রী ক্ষমা মুদা সর্ব্বব্রহ্মস্বরূপিনী॥
প্রচণ্ডা বহুনা লীলা ঘটরূপা কৃশোদরী।
বর্ণরূপা সৃষ্টিরূপা ছিন্না গৌরী শুভঙ্করী॥
মহাকালী বীজরূপা ধীরা মংসা শুভাষিনী।
ললিতা পুরুষাঙ্গী চ জয়দা সর্ব্বমোহিনী॥
ইদং ভক্ত্যা পঠেৎ যস্তু তব নাম শতাষ্টকম্।
সর্ব্বাসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥
কারীসদা লভেৎ কাম্যং পুত্রার্থী পুত্রবান ভবেৎ।
ধনার্থী ধনবাংশ্চাপি জ্ঞানার্থী জ্ঞানবান সদা॥
মন্ত্রসিদ্ধি লভেৎ মন্ত্রী প্রাপ্নুয়াৎ শ্রীপদং ধ্রুবং।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি মহামায়া প্রসাদতঃ॥

রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর।

হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিত্যকর্ম্ম।

গুরু।—বৎস! কাল তোমাকে কর্ম্ম যে অবশ্য করণীয়, সাধকের অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন যে উদ্ধারের গত্যন্তর নাই, তাহা বলিবার সূত্রপাত করিয়া কেবলমাত্র তোমার প্রশ্ন অনুসারে ভোজন কার্য্যের বিষয়ই বলিয়াছি, ভোজন সম্বন্ধে যেরূপ আচার বিচার করিতে হয়—তাহা বোধ হয় তোমার বেশ বোধগম্য হইয়াছে?

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ। তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এক্ষণে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অবতারণা করুন। আমার বিশ্বাস ছিল এবং ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, ইহাতে কেবল কাদা ঘাটাই সার হয়—মাছ ধরা হয় না।

গুরু।—বাবা। মাছ ধরিবার জন্য পুষ্করিণীতে নামিয়া কাদা না ঘাঁটিলে কে কবে মাছ ধরিতে পারিয়াছে? কর্ম্ম করিয়া পাকা না হইলে হিন্দু বা জ্ঞানবান না হইলে সকল জ্ঞানের আধার স্বরূপ শ্রীভগবানকে কেমন করিয়া জানা যাইবে? গীতার প্রথমে যে স্বয়ং ভগবান কর্ম্ম করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শিষ্য—প্রভু। আমি শাস্ত্র বিষয় নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তবে যখন আপনি বলিতেছেন—তখন আমার কোন সংশয় নাই আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার শ্রেয়ঃলাভের জন্য করণীয় কর্ম্ম সকলের উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু।—বৎস। পূর্ব্বে যাহারা যথার্থ কর্ম্মী হইবার জন্য চেষ্টা করিতেন—তাহাদিগকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। চারিটী আশ্রমের মধ্য দিয়া কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ কর্ম্মী হইতে পারা যায় এবং ক্রমশঃ সেই সকাম কর্ম্ম সকল নিষ্কামভাবে আচরণের ক্ষমতা লাভ করা যায়। কিন্তু এখন আমাদের আশ্রম-ধর্ম্ম শিথিল হইয়াছে; কাজেই ঠিক আশ্রমোচিত কর্ম্ম আর অনুষ্ঠিত হয় না। তবে যতদূর সম্ভব এবং যেরূপভাবে কর্ম্মের আচরণ করিলে সহজসাধ্য হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

শিষ্য।—হা ঠাকুর। যাহা সহজে করিতে পারি এবং যাহার দ্বারা আত্মোন্নতি সাধিত হয়, তাহাই উপদেশ করুন।

গুরু।—দেখ বাবা। শরীরকে দৃঢ় করাই সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক, সহগুণ না থাকিলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ! সহ্য করিতে না পারিলে, আরাধ্য বস্তু লাভের জন্য পরিশ্রম না করিলে তাহার প্রাপ্তির আশা কোথায়? এ তো আর ছেলের হাতের মোয়া নয় যে কাড়িয়া খাইব

গুরু।—হাঁ বাবা। ক্রমশঃ সহগুণ লাভ করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। যাবতীয় কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল বিষয়ের সংযম শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। অতিরিক্ত কোন বিষয়ের ভাল নয়?

শিষ্য।—হা প্রভু। অতি শব্দই খারাপ, তা জানি, এখন কিরূপভাবে কাজ করিতে হইবে—বলুন।

গুরু।—বৎস। জীবনে আমাদিগকে তিন প্রকার কর্ম্ম করিতে হয়—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম। আজ কেবল নিত্য কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি:—

ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজা, হোম, দান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম, ভোজনও যে নিত্যকর্ম্ম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইবে। এই সময় গাত্রোত্থানের শুভ ফল সম্বন্ধে স্মৃতি বলিতেছেন:—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে যোত্তিষ্ঠেৎ স্বাস্থ্যো ব্রহ্মর্থমায়ুষঃ।
শরীর চিন্তাং নিষ্কৃত্য মৈত্রং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

বুদ্ধিকর্ত্তব্য পথ অনুসরণ করিবে। শরীর সবল এবং মন সুস্থ থাকিবে। তারপর শয্যার উপরিভাগে বসিয়া শিরোভাগে সহস্রদল পদ্মের চিন্তা করিবে, ভাল করিয়া চিন্তা করিতে পারিলে পদ্মের সদ্গন্ধ পর্য্যন্ত অনুভব হইবে। ঐ পদ্মে শ্বেতকায় গুরুচিন্তা করিয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত করতঃ "প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতলে প্রদান করিবে। তারপর প্রাতঃস্মরণ করিবে :—

"ব্রহ্মা মুরারী স্ত্রিপুরান্তকারী ভানু শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্র শনি রাহু, কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্। প্রভাতেষঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং আপদস্তস্য নশ্যন্তি, তমো সূর্য্যোদয়ে যথা; অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা, পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্; পুণ্যশ্লোক নলোরাজা পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোকাশ্চ বৈদেহি পুণ্যাশ্লোক জনার্দ্দন। জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্ম নচ মে নিবৃত্তি, ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।

তারপর ভগবানের দশাবতার এবং ভগবতীর দশাবতারের নাম উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ, গো; কিংবা অগ্নি দর্শন করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

শিষ্য।—প্রভু! ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কোন সময়?

গুরু।—বৎস! রাত্রি চারিটার সময় নিদ্রোত্থিত হইবে।* এই সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, ঋষিরা সকলেই এই সময় শয্যাত্যাগ করিতেন।

শিষ্য।—আহা প্রভু! তার পর?

গুরু।—তারপর মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবন ও স্নানাদি করিবে—যদি শরীরে শ্লেষ্মার আধিক্য হয়—তাহা হইলে স্নান না করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া পবিত্র গঙ্গাবারি স্পর্শ করিবে, অভাবে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুচী হইবে। তারপর প্রাতঃসন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া প্রাতঃভ্রমণচ্ছলে পুষ্পচয়ণ করিতে যাইবে।

শিষ্য।—প্রভু! প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন না করিলে কি কোন দোষ হয়?

গুরু।—বৎস! প্রাতঃকালে পুষ্পচয়নচ্ছলে এই ভ্রমণ স্বাস্থ্যলাভের বিশেষ উপযোগী—ইহাতে দুই কাজই হয়—স্বাস্থ্যলাভও হয় দেবোদ্দেশে পুষ্পচয়ন করাও হয়। সূর্য্যদেবের প্রথম উদয় সময়ে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিবে। এবং তাহাকে প্রণাম করিবে, ইহাতে চক্ষের জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল হয়।

শিষ্য।—গুরুদেব! এত প্রত্যুষে গাত্রোত্থান কি ভাল? শরীর অসুস্থ হইবে যে, ঠাণ্ডা লাগিবে যে?

গুরু।—বৎস! শরীরের অসুস্থতা নিবারণের জন্যই শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিয়াছেন এবং আমাদের আর্য্য ঋষিগণ সেই অনুসারে কার্য্য করিয়া নিরোগ এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে :—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্মধুনক্ত মুতোষসঃ মধুমৎ

পার্থিবং রজঃ ইত্যাদি।

প্রাতঃকালের সমীরণ মধুময়, জল এবং পৃথিবীর ধূলি, পুষ্পবৃক্ষ মধুময় হয়। মধু-বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ নাশক গুণসম্পন্ন। প্রাতে এই সকল স্পর্শ করিলে ত্রিদোষ নাশ হইয়া ত্রিবিধ গুণের সমতা প্রাপ্ত হয়—ঐ তিন গুণের সমতা রক্ষিত হইলে শরীর সুস্থ থাকে, মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে শৌচাদির সময় জল স্পর্শ করা এবং প্রাতঃসমীরণ গাত্রে লাগান বিশেষ উপকারী জানিবে। কত লোক এই প্রাতঃ-ভ্রমণে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল মুক্ত হইয়া সবল ও সুস্থকায় হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল, তুমি আচরণ করিলেই বুঝিতে পারিবে। উক্তরূপ আচরণ স্বধর্ম্ম, সদাচার, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায়—ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মানুষ যে অল্পায়ু হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শিষ্য। প্রভু! ধর্ম্ম জিনিষটা কি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কি করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়। আমাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিন।

গুরু। যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ। ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করে, ধর্ম্ম পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধারণ করে যে তাহাই ধর্ম্ম। যাহা হইতে আত্মোন্নতি ও পরম মঙ্গল সাধিত হয়—তাহাই ধর্ম্ম। যাহার দ্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে—তাহাই ধর্ম্ম। ইহার বিপরীত অধর্ম্ম। ধর্ম্মের দ্বারা সকল বস্তুর পবিত্রতা সাধিত হয়—অধর্ম্মের দ্বারা সমস্ত দূষিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম এই বিশাল বিশ্ব সংসারকে অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া ইহার কোন প্রকার ব্যত্যয় সাধিত হয় না।

শিষ্য। প্রভু। ধর্ম্মের লক্ষণ কি?

গুরু।—অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ, দানং দমো দয়া ক্ষান্তি সর্ব্বেষাং ধর্ম্ম-সাধনং। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ধর্ম্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম হইতেই সব পাওয়া যায়—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে কাম, আর ধর্ম্ম হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুমি জগতে যে কোন কার্য্য করিতে যাও, যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টা কর না কেন, তাহাকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, ঠিক ভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইলে ধর্ম্ম আশ্রয় তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। অধর্ম্মে যাহা সিদ্ধ তাহার ফল বেশী দিন থাকে না; অচিরে ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া তাহাকে অধঃপাতে ফেলিয়া দেয়। ভারত যে এত উন্নত হইয়াছিল, এত জগৎমান্য এবং তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যে এত বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল—ধর্ম্মবলই তাহার প্রধান কারণ, এখন যে এত অবনত, অপদস্থ; পদানত হইয়াছে, ধর্ম্মহীনতাই তাহার কারণ নয় কি?

ধর্ম্মই ঈশ্বর-লাভের একমাত্র উপায় এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিই সূর্য্যের ন্যায় তেজপ্রভাবসম্পন্ন। আমার বোধ হয় সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ এরূপ আছে, আমার ত অন্য শাস্ত্র গ্রন্থ কিছু জানা নাই; জানা হইলে বুঝাইয়া দিতাম।

শিষ্য।—হাঁ প্রভু! আমরা ইংরাজের পরম পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রেও পড়িয়াছি :—

For I say unto you, that except, your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and pharisees, ye shall in no case enter into the Kingdom of Heaven বাইবেল আরও বলেন,—Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their father.

গুরু।—তবেই বল দেখি বাপু! ধর্ম্ম ছাড়া, ধর্ম্মের উপদেশ ছাড়া কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্র আছে; কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া চলি কয় জনে? বাবা! অধার্ম্মিকগণের আশু উন্নতি দেখিয়া কখন মুগ্ধ হইও না, কখন অধর্ম্মে মজিও না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধর্ম্ম দ্বারা প্রথমে মানুষ বাড়িয়া উঠে বটে কিন্তু তাহার পরিণাম অতিশয় ভয়ঙ্কর, দেখিতে দেখিতে সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য।—সদাচারপরায়ণ না হইলে কি ধর্ম্ম হয় না?

গুরু।—না, স্মৃতিশাস্ত্র ইহা ভুয়োভুয়ো বলিয়াছেন। তস্মাদক্ষিণ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাচারবান দ্বিজঃ। সদাচারবান মানব দীর্ঘজীবী হয়--দীর্ঘজীবন লাভের শাস্ত্র সম্মত এমন সুন্দর উপায় আর নাই। সদাচারের অনেক গুণ, মনের মত সন্তান লাভ করিতে হইলে আচার সম্পন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ধন রক্ষা করিতে হইলেও আচারবান হওয়া বিশেষ দরকার। কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—

"আচারো পরমোধর্ম্ম আচারো পরমন্তপঃ,
আচারাদ্বর্দ্ধতেহ্যায়ুরাচারাৎ পাপসংক্ষয়।"

শিষ্য।—আচ্ছা ঠাকুর, আমরা অনাচারী হইয়াই কি এত পীড়ার আকর হইয়াছি।

গুরু।—অনাচারেই ত যত পীড়া আসিয়া যুটে, অনাচারী হইলেই সে অপরিষ্কৃত হইবে, আমরা যেরূপভাবে বিশুদ্ধ হইয়া থাকি, আচারবিহীন ব্যক্তিগণ কখন সেরূপ পারিবে না—বা তাহা গ্রাহ্য মধ্যে আনিবে না। এই জন্যই পীড়া হয়। পূর্ব্বে আমাদের এত রোগভোগ করিতে হইত না, নানা প্রকার ব্যাধির প্রকোপও দেশে ছিল না। যত অধর্ম্ম ও অনাচারের বৃদ্ধি হইতেছে, নানা প্রকার ব্যাধিও তত দেশকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তুমি অনাচার দোষটা পরিহার করিবে—তাহা হইলে আর পীড়া ভোগ করিতে হইবে না।

শিষ্য।—প্রভু! আপনার বাক্য বেদবাক্য রূপে প্রতিপালন করিব, তবে যাহা সাধ্যাতীত হইবে তাহার আর উপায় কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার পাদপদ্ম সদা-সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া আপনার উপদেশমত কার্য্য করিতে পারি, ভ্রমেও যেন আর কখন অধর্ম্ম সঞ্চয় কত্তে না হয়।

গুরু। বৎস! ইচ্ছায় সকল কার্য্য সাধিত হয়, মনোগত ইচ্ছা বলবতী হইলে কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে ভগবান সহায় হন। আজ আর নয়, আর এক দিন তখন সমস্ত বলিব।

সম্পাদক।

ঐতিহাসিক সমস্যা।

প্রকৃত ইতিহাসের একান্ত অভাব। কোন দেশেরই আদিম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের কথা—প্রকৃত ইতিহাসের একান্ত অভাব, ভাট ও চারণেরা ঘটনা সমূহ যে ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের ইতিহাস। এ দেশের রাজন্যবর্গ পূর্ব্বপুরুষদিগের যশোভাগ্যের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন। কেবল তাঁহাদিগেরই জন্য বংশাবলী বা যুদ্ধ-বিবরণ রচিত হইত, যাহা রচিত হইত তাহাও জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইত না, সেজন্য হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি লোপ পাইয়াছে। আবার কোন রাজবংশ লোপ পাইলে সে বংশের কীর্ত্তি-কলাপ আর গীত হইত না। অনেক রাজবংশের ইতিহাস পাওয়াই যায় না। পুরাণাদিতে কিছু কিছু বিকৃতভাবে পাওয়া যায় মাত্র। তাহাই এক্ষণে জাতীয় ইতিহাস। পুরাণ হইতে সত্য সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাও আনুমানিক। কিছু কাল পরে উঁহাদেরও অনেক কথা বাদ দিতে হইবে।

যে স্থান হইতে হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমান, ডেন বা জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি সমুদ্ভূত, তাহাদের আদি নিবাস কোথায়? এক্ষণে এক জন পণ্ডিত বলিতেছেন যে তাহারা বল্‌টিক সাগরের তটে বাস করিত। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সকলেই জানিত যে তাহারা সীমার মধ্যস্থলে ছিলেন এবং অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা সে কথা উড়াইয়া দিতে চান, আমরাও লর্ড ক্লাইভ বা পলাশীর যুদ্ধ উড়াইয়া দিতে পারি, পল মাত্র উদ্ভাসিত অসি (=পলাসি) ক্লীবগুণ যুক্ত (ক্লৈব) কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় স্বরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে ঐ সকল পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তের কোন আভাস পাই না। কারণ অতি পুরাকাল হইতে নানা জাতি নানা কারণে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, আর্য্যজাতি যে সিন্ধু-নদীর পূর্ব্বপারে বাস করিত এবং তাহাদেরই বংশ ক্রমে পঞ্জাব অধিকার করে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে অনার্য্য জাতির সহিত তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধের ফলে কয়েক দল শূদ্র নামে আর্য্য-সমাজভুক্ত হয়।

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। নিজ নিজ কল্পনা ও যুক্তি অনুসারে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছেন। রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এমন কি ব্যাসদেব বলিয়া কেহ ছিলেন একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, গুজরাটে তাঁহার জমীদারী ছিল। ব্যাসদেব কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না—বেদ সংগ্রহকারিদের সমষ্টিকে ব্যাসদেব বলা যায়।

যাহারা বলেন—কলিযুগে আর্য্য জাতি ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মতে খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যেরা পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের

মতে খৃঃ পূঃ ৩০০০ তিন হাজার হইতে খৃঃ পূঃ ২০০০ দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সত্য যুগ, খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত ত্রেতাযুগ। খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত দ্বাপরযুগ, তারপরে কলিযুগ। সরস্বতী নদীর নিকটে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে যে বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়—তাহা শিরোধার্য্য, এই সময়ে পঞ্জাবেরই এক একটী সমাজ এক একটী রাজ্যে পরিণত হয়, অনেক পরে সূর্য্য, চন্দ্র, যদু, কুরু প্রভৃতি রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। সত্য-যুগে জাতিভেদ ছিল না—একথা বলা যায় না, কারণ আর্য্য ও অনার্য্য নামে দুই জাতি ছিল, সে সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই, তবে কোন সময়ে রামায়ণ বা মহাভারত রচনার সূত্রপাত হয়, কোন্ সময়ে কল্পসূত্রাদির উৎপত্তি, পাণিনি কোন শতাব্দীতে ব্যাকরণ রচনা করেন বা কপিল দেব কোন্ সময়ে সাংখ্যদর্শন রচনা করেন ইত্যাদি অনেক কথার উত্তর দেওয়া যায় না।

শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেব-তত্ত্ব।

আমাদের এই পৃথিবী সৌর-জগতের মধ্যে একটী গ্রহমাত্র হইতেছে। এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে, এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা উচিত, কিন্তু আমরা পৃথিবীর অধিবাসী জীব বলিয়া পৃথিবীকে গ্রহ না বলিয়া চন্দ্রকে গ্রহ বলিয়া থাকি। সেইরূপ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহও চন্দ্রসহ পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যও এই কয়েকটি গ্রহ লইয়া একটি সৌরজগৎ ধরা হয়। এই সৌরজগতের আকার ডিম্ব সদৃশ গোলাকার বলিয়া এই সৌরজগৎকে আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড নাম দেওয়া হইয়াছে। যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই সেই সূর্য্য এবং ইহার চতুর্দ্দিকের উপরে উক্ত গ্রহাদি ও আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্র লইয়া আমাদের সৌরজগৎ অর্থাৎ আমাদের ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দেবী ভাগবত, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে বরং ধূলিকণার সংখ্যা হইতে পারে তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা করা যাইতে পারে না, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এতাদৃশ এত অধিক পরিমাণ ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে যে তাহাদের সংখ্যা অনন্ত কোটী বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের এক এক অধিপতি থাকার উক্তি দেখা যায়, আবার এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রহেরও এক একটি করিয়া অধিপতি আছেন। সাধারণতঃ ইঁহারা দেবস্থানীয় হইতেছেন।

প্রণববাদ নামক একখানি অতি প্রাচীন লুপ্ত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ ঋষি গার্গায়ণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন, স্বয়ং মহাদেব প্রণবার্ণব নামে একটি শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিয়া যান, সেই গ্রন্থ যখন মানব মধ্যে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ রাখা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল তখন ঋষি গার্গায়ণ উক্ত গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়া ও কাট-ছাঁট করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রচার

করেন। এই গ্রন্থখানি ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রচার ছিল, ক্রমে ইহার প্রচার বন্ধ হয়, প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহার ইংরাজিভাষায় সংক্ষেপ মর্ম্ম মাত্র প্রচার হইয়াছে, এই গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ দেখা যায়।

এক সূর্য্য সাত গ্রহ সহ—একটি ব্রহ্মাণ্ড, ইহার অধিপতিকে ঈশ্বর কহে।

এইরূপ সাত ব্রহ্মাণ্ডে—একটি জগত, ইহার অধিপতিকে হরি কহে।

এইরূপ এক সহস্র জগতে একটি বিশ্ব, ইহার অধিপতির নাম হর।

এইরূপ পোনের কোটী বিশ্ব লইয়া এক মহাবিশ্ব হয়, ইহার অধিপতির নাম পরেশ্বর।

উক্তরূপ দুই শঙ্খ পরিমাণ মহাবিশ্ব লইয়া এক লোক হয়, এই লোকের অধিপতি পরমেশ্বর।

এক মহাশঙ্খ লোক একত্র করিয়া একটি মহালোক হয়, ইহার অধিপতি একজন মহেশ্বর।

এক শত পদ্ম মহালোক লইয়া একটী সংসার হয়, এই সংসারের অধিপতিকে মহাবিষ্ণু আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এই সংসারের পর কিরূপ নিয়মে কার্য্য চলিতেছে, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। উক্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডাদিদেশকে এইরূপে বিভাগযুক্ত প্রকাশ করিয়া কাল অর্থাৎ সময় সম্বন্ধে যেরূপ বিধান দেখাইয়াছেন তাহাও এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বর্ষ, ত্রেতাযুগ ১২,৯৬,০০০ বর্ষ, দ্বাপর যুগ ৮,৬৪,০০০, কলি যুগ ৪,৩২,০০০ বর্ষ। এই চারি যুগে এক চতুর্যুগ। এইরূপ এক সহস্র চতুর্যুগে এক বিযুগ, সহস্র বিযুগে এক মহাযুগ ও সহস্র মহাযুগে এক কল্প হইয়া থাকে। শত কল্পে এক মহাকল্প, চতুর্দ্দশ মহাকল্পে এক চক্র, চতুর্দ্দশ চক্রে এক নিষ্ঠা, চতুর্দ্দশ নিষ্ঠায় এক মনুর কাল, দুই মনুতে এক মন্বন্তর হয়। চৌদ্দ মনুর কাল, অর্থাৎ সাত মন্বন্তরে এক মহামন্বন্তর হইয়া থাকে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যোগী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উন্নত জ্ঞানীগণ চরম জ্ঞান লাভ করিয়াও এক মহামন্বন্তর কাল ব্যাপী ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই মহামন্বন্তরের অধিকার এক মহাবিষ্ণুর। এইরূপ মহাবিষ্ণুর অধিকারের বাহিরে মহাব্রহ্মা, মহা শিব প্রভৃতিগণ আছেন কি না এবং তাঁহারা মহাবিষ্ণুর মত অপর কোন সংসার আখ্যায় সীমাবদ্ধ বিরাট, অতি বিরাট রাজ্যের অধিপতি রূপে বিরাজ করিতেছেন কি না, অথবা এই মহাবিষ্ণুর উপর অপর কেহ মহা-মহাবিষ্ণু আছেন কি না, তৎসম্বন্ধে এই বিরাট সংসার-ব্যাপী জীবগণের জ্ঞানলাভের কোন অধিকার নাই।

আমরা যতই উন্নতি লাভ করি না কেন, যতই সাধনা মার্গে অবস্থান করি না কেন, এই নির্দ্দিষ্ট সীমা ও নির্দ্দিষ্ট কালের বাহিরের জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। এমন কি আমাদের মুক্তিলাভ ঘটিলেও তাহা এই মহা মন্বন্তরের সীমা পর্য্যন্ত কাল ব্যাপী হইবে, এবং আমাদের দেশ অর্থাৎ স্থান হিসাবে এই সংসার নামক সীমাবদ্ধ বিরাট স্থানের বাহিরে যাইবার

অধিকার নাই ও বাহিরের স্থানের জ্ঞান লাভ বা উদ্দেশ লাভে আমরা বঞ্চিত।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ও তাহাদের কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড যে স্থানে রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ আমাদের শূন্য বলিয়া বোধ হয়, শাস্ত্রে এই স্থানকে কারণার্ণব বা কারণ-সমুদ্র বলা হয়। ইংরাজি মতে এই স্থানকে Space বলা হয়, এবং ইহা ইথার নামক পদার্থে পূর্ণ, অনেকে এই ইথারকে আমাদের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে মরুৎ নামক ভূতের প্রতিশব্দ মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ইথার মরুত নামক ভূতের প্রতিশব্দ হইতে পারে না। এই ইথারকে এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ভিন্ন নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল যে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অন্তবর্ত্তী শূন্যাকার স্থান কোইলন (Koilon) নামক মূল প্রকৃতিতে পূর্ণ, বিজ্ঞান সম্প্রতি এই কথা প্রচার করিতেছেন। কাজেই আমরা বুঝিলাম যে কোইলন, ইথার, কারণ-সমুদ্র যে নামই বলি না উহার অর্থ এই যে ব্রহ্মাণ্ড সকল যে স্থানে ভাসিতেছে তাহা অবিকৃত প্রকৃতিতে পূর্ণ।

ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে আমরা মাটী সংগ্রহ করিয়া থাকি, সেই মাটীকে বেশ করিয়া মাখিয়া নরম করিয়া কাদা করি। আমি কর্ত্তা মাটি মাখিয়া কাদা করিতেছি। মাটী এই জিনিষ লইয়া কাজ করিতেছি। সেইরূপ কর্ত্তার দুই অংশে একজন কর্ত্তা, তাঁহাকে পুরুষ বা চৈতন্য বা শিব আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি যে জিনিষ লইয়া কাজ করেন, তাহা প্রকৃতি, প্রধান, মহৎ কারণ, সমুদ্র প্রভৃতি আখ্যায় আমাদের শাস্ত্রে অভিহিত। এই প্রকৃতিকে লইয়া মাটী মাখিয়া কাদা করার ন্যায় কাজ করাকে, সৃষ্টির আদি বলা যায়, এই জন্য এই অবস্থার প্রকৃতিকে আদিতত্ত্ব বলা হয়, ইহার পরে বিকৃতি করায় প্রকৃতির যে অবস্থা হয়, তাহাকে অনুপাদকতত্ত্ব, তৎপরে আরও বিকৃতি করায় ব্যোমতত্ত্ব হয়, এই স্থানে রূপ অর্থাৎ প্রকৃতির আকার হইতে থাকে, ইহার পরে মরুৎতত্ত্ব, তৎপরে তেজঃ-তত্ত্ব, তৎপরে অপ-তত্ত্ব, তৎপরে ক্ষিতি-তত্ত্ব অবস্থায় সৃষ্টির শেষ হয়। এই ক্ষিতি-তত্ত্বে প্রকৃতি কঠিন (Solid) অবস্থার হয়। মাটী পুড়িয়া শক্ত কলসী হয়। তৎপূর্ব্বে অপ-তত্ত্ব অবস্থায় প্রকৃতি তরল (Liquid) অবস্থায় থাকে। তৎপূর্ব্বে তেজ-তত্ত্ব অবস্থায় প্রকৃতি বাষ্পের মত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থার কতকটা পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি-গোচর থাকে। ইহার পরের প্রকৃতির অবস্থা সকল আমাদের দৃষ্টির বাহিরের অবস্থা।

এই অনন্ত কারণ-সমুদ্রের কতক অংশ লইয়া আমাদের কথিত সংসার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংসারের অধিপতি মহাবিষ্ণু হইয়াছেন, তিনি এই সংসারের ভিতর ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ এই সংসারটী তাঁহার বিরাট শরীর, এই সংসারের অন্তর্গত মহালোক, লোক, বিশ্ব, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ইহার শরীরের অংশমাত্র, আমরা জীববৃন্দ সেই বিরাট দেহে অণু অপেক্ষা অণু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

হইলেও ঐ দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। বায়ু যেমন কোন স্থানে নাই এমন নহে, সেইরূপ মহাবিষ্ণুর দেহ কোন স্থানে নাই এমন স্থান নাই। মানব দেহে যেমন রস-রক্ত-মাংস, অস্থি, মজ্জা, নাড়ী, ধমনী প্রভৃতি অনেক রকম অবস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাই, সেই বিরাট মহাবিষ্ণুর দেহে সেইরূপ এক একটী ব্রহ্মাণ্ড, এক একপ্রকার জীবাদির অবস্থার প্রকারান্তর মাত্র।

বিজ্ঞান বলেন—আমাদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর দ্বারা গঠিত, এই অণু সকলকে সেলস্ (cells) কহে। আমাদের ভোজন দ্বারা এই অণু সকলের সৃষ্টি হইতেছে, এবং পরিশ্রম দ্বারা অণু সকলের ক্ষয় অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে; এইরূপে আমাদের দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে অণু সকলের মৃত্যু ও জন্ম হইতেছে। আমাদের দেহে এক্ষণে যে সকল অণু আছে, সাতবর্ষ পরে এই অণুসকলের একটীও থাকিবে না। সমুদয় নূতন অণুতে আবার দেহ পূর্ণ হইবে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত, এই জন্যই দেহ পবিত্র করিতে, অখাদ্য ভোজীদের দেহ পবিত্র হইতে, সাত বৎসর লাগিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়, আমাদের দেহে প্রতিনিয়তই যখন অণু সকলের মৃত্যু হইতেছে ও নূতন অণুর জন্ম হইতেছে, অথচ এই জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা আমাদের দেহের অবস্থান্তর বিশেষভাবে আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না, সেইরূপে সেই মহাবিষ্ণুর দেহে প্রতিনিয়ত আমাদের জন্ম-মৃত্যু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় দ্বারা তাঁহার বিরাট দেহের কিছুই ইতর বিশেষ অনুভব যোগ্য অর্থাৎ ধর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে না বলিয়া বেশ বুঝা যায় না কি?

এই মহাবিষ্ণু একটী দেব, এইরূপ শ্রেণীর অর্থাৎ লোক, মহালোক, মহাবিশ্ব, বিশ্ব, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির অধিপতি স্বরূপে পরমেশ্বর, মহেশ্বর, পরেশ্বর, হর, হরি, ঈশ্বর এই আখ্যাধারী অসংখ্য দেবতারও অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারিলাম। ইহারা সৃষ্টির অন্তর্গত লোক সকল শাসন জন্য কার্য্য করিতেছেন, সকলেরই কার্য্যের কাল ও বিধান রহিয়াছে ও সীমা নির্দ্দেশ করা রহিয়াছে। এইরূপে আবার ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর গ্রহগণেরও এক এক অধিপতি আছে, ইহারা নিজ নিজ অধিকারস্থ গ্রহের মধ্যে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ও গ্রহের স্থিতি পোষণ আদি করিতেছেন। এই যে গ্রহ সকলের নিয়মিত গতি আমরা দেখিতে পাই, এই অধিপতি দেবগণই সেই গতির চালনা করিয়া থাকেন।

আমাদের পৃথিবীর অধিপতি যিনি তাঁহাকে পৃথিবী অভিমানিনী বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি আছে, আবার অনেক স্থলে ইহাকে বিষ্ণু আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবী সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই কয়েকটী গ্রহের এক একজন অধিপতি আছেন। ইহাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নানা প্রকার নাম দেওয়া হইয়াছে, সাধারণতঃ ইহাদিগকে লোকপাল বলা হইয়া থাকে, ইহারা আমাদের সূর্য্যদেবের সপ্ত রশ্মিঘটিত সাত জন দেবতা ব্যতীত আর কেহই নহেন। ইহাদের উপর সেই সবিত্রীমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ

যাহার শরীর হিরণ্ময়, তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রধান পুরুষ। ইঁহারই অধীনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সাত গ্রহের অধিপতি লোকপালগণ সকলেই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত নারায়ণের (ঈশ্বরের) অধীন। ইহারা সূর্য্য মণ্ডল হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহা নিজ শরীরে পোষণ করিয়া সেই শক্তি গ্রহস্থিত জীবগণের সৃষ্টি স্থিতি, পোষণ কার্য্যে উক্ত মহাপুরুষের সঙ্কল্প মতে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতির কোন মাসিক পত্রিকায় সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী এই দেবতার সম্বন্ধে একটী সুন্দর টিপ্পনী বাহির হইয়াছিল, আমরা তাহা এস্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "সৃষ্টি বা মন্বন্তর কালে সূর্য্যদেব সৌর-জগতের হৃদয়-কমলে অবস্থিত হইয়া সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার জীবন স্রোত সঞ্চালিত করেন। মানব-দেহে রক্তের সঞ্চালন করিতে যেমন এক সেকেণ্ড লাগে, সেই সৌরমণ্ডলে সৌরপ্রাণ সঞ্চালন হইতে দশ বৎসর লাগে। তদুপরি এক বৎসর আদিত্য হৃদয়ের মধ্যস্থ যন্ত্রাদির মধ্যে সঞ্চালন করিতে লাগে। ইহাই তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ব্ল্যাভাটস্কির কথা। সূর্য্যের প্রাণ সঞ্চালন ১১ বৎসর, আর লয়স্থানে অব্যক্ত-ভাবে স্থিতি ১ বৎসর, সুতরাং ১২ বৎসরে সূর্য্যের যাহা হয়, আমাদের দেহে এক সেকেণ্ডে সেই সঞ্চালন হয়, ইহা হইতেই সূর্য্যের এক দিন হইতে আমাদের কত বৎসর লাগে—তাহা স্থির করা যায়। এই হিসাব মত আবার ব্রহ্মার এক দিন, ইন্দ্রের এক দিন, পিতৃগণের এক দিন প্রভৃতির পরিমাণ শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।"

উপরি উক্ত অধিপতি দেবতাগণ এক এক গ্রহ বা ব্রহ্মাণ্ড, বা অনেক ব্রহ্মাণ্ডের শাসন ও পালনের কর্ত্তারূপে কার্য্য করিতেছে না। ইহাদের অধীনে অসংখ্য অসংখ্য দেবতা নানা প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সকল দেবতাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, প্রজাপতি, সিদ্ধ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর দেবতা, ইহাদের উপরে লোকপাল ও লিপিকা। বিশ্বদেব, কামদেব, পিতৃদেব, কুমার প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেণী আছে।

দেবগণ যে কেবল সুখে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়ান—তাহা সত্য নহে, ইহারা এই বিশাল সংসার মধ্যে নানা প্রকার গুরুতর কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহারা সচরাচর ভূলোক ব্যতীত ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপঃলোক ও সত্যলোক এই ছয় লোকেই বাস করিয়া থাকেন, ভূলোকে তাহারা বাস করেন না, ইচ্ছা করিয়া বা মানবের আহ্বানে আসিয়া থাকেন মাত্র।

মানবের যেমন ভূলোকই সাধারণ বা মুখ্য বাসস্থান, সেইরূপ দেবতাদের মুখ্য বাসস্থান স্বর্গলোক। দেবতাদের মধ্যে যাহারা সাধন মার্গে উন্নত তাঁহারা মহ, জন, তপ ও সত্য-লোকেও থাকেন। আবার বিশ্বদেব, কাম-

দেব ও দেবযোনি অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর, পৈশাচ, গুহ্যক, বিদ্যাধর প্রভৃতি ভুবর্লোকে বাস করেন। যিনি যে লোকে থাকেন, সেই লোকের অনুরূপ পদার্থে তাঁহার দেহ গঠিত হইয়া থাকে। আমরা ভূলোকে থাকি, ভূলোক ক্ষিতিতত্ব, আমাদের দেহ ক্ষিতিতত্বপ্রধান অর্থাৎ কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত। যিনি ভুবর্লোকে থাকেন তাঁহার দেহ ভুবর্লোকের অপ্‌ তত্বের দ্বারা তরল পদার্থে দেহ গঠিত, স্বর্গলোকবাসীর দেহ তেজস্তত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ উজ্জ্বল বাষ্পীয় পদার্থে গঠিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল,
এফ-টি-এস্।

অনাদিলিঙ্গ গুপ্তেশ্বর।

ভারত সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান বিভাগানুসারে যাহা এখন "মধ্য প্রদেশ" বা Central Provinces বলিয়া বিখ্যাত তাহার সীমার মধ্যেই এই গড় মণ্ডল রাণী দুর্গাবতীর নাম ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। রাণী দুর্গাবতীর শৌর্য্যবীর্য্য অসীম ক্ষমতা ও আকবরের সহিত সংগ্রাম ও পরাজয় অনেকেই অবগত আছেন। এই গড়মণ্ডল গরীয়সী রাণী দুর্গাবতীর রাজধানী ছিল।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, আর সেই গরীয়সী রাজ্যেশ্বরী মহারাণী দুর্গাবতীও নাই, আর তাঁহার লোকবিশ্রুত রাজধানী গড়মণ্ডলও এখন ধ্বংশস্তূপে পরিণত, বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। যাহা এক সময়ে ধনজনপূর্ণ ছিল, শৌর্য্যবীর্য্য এবং প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ ছিল, যে গড়মণ্ডলেশ্বরীর গৌরবময় কীর্ত্তিগাথা তাহার সেনাপতি আসক খাঁ, সম্রাট আকবরের নামের সহিত চিরদিন বিজড়িত আজ সেই গড়মণ্ডল "গড়" বা "গড়হা" নামধেয় এক সামান্য গ্রামে পরিণত। সে গড়মণ্ডলের অতীতের ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু ছিল—সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। আছে কেবল এক শোক-গীতিমাখা করুণস্মৃতি। আজ বড় অনিচ্ছার সহিত সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে হইতেছে।

এই "গড়হা" "গড়া" বা গড়মণ্ডলের ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমান জব্বলপুরের অতি সন্নিকটে। যাহা এক সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজধানী ছিল, তাহা সামান্য গণ্ডগ্রামে পরিণত। কাল অতি নিষ্ঠুরের মত, অতীতের সেই সমুজ্জ্বল গৌরবময় স্মৃতিকে মুছিয়া দিয়া এখন তাহার স্থানে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রাখিয়া গিয়াছে।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কোন জরুরি সরকারী কার্য্যের জন্য আমায় জব্বলপুরে যাইতে হয়। সেই সময়ে আমি গড়মণ্ডলের অদূরে জঙ্গলের মধ্যে পরিভ্রমণকালে কোন স্থানীয় লোকে আমায় সন্ধান দিল—এই গড়-মণ্ডল হইতে তিন ক্রোশ দূরে রাণী দুর্গাবতীর প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী পাহাড় খুদিয়া নির্ম্মিত। প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাতন! এই পাহাড়গর্ভস্থ মন্দির বিরাজিত দেবতার নাম "গুপ্তেশ্বর অনাদি লিঙ্গ।"

কথাটা শুনিবামাত্রই একবার গুপ্তেশ্বরকে

দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ও আমার একটী বন্ধু—এক জন পথ-প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া পরদিনের নির্ম্মল উষায় এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

গুপ্তেশ্বরের মন্দির বাস্তবিকই দেখিবার জিনিস। প্রকাণ্ড পাহাড়ের গায়ে মন্দিরাকারে একটী স্থান কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই মন্দিরের দ্বার নাই। মন্দির মধ্যে কাশীধামের বিশ্বনাথ দেবের মত লিঙ্গমূর্ত্তি।

একজন ধনী মাবোয়ারী মহাজন এই পর্ব্বতবক্ষঃ মধ্যস্থ গুপ্তেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে একটী "নাটমন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বহুশত বৎসর কাল এই মন্দিরটী বনজঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এই নাটমন্দির নির্ম্মিত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। নাটমন্দিরের চারিপার্শ্বে কয়েকটী ঘর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ঘরে কেহই নির্দ্ধারিতরূপে বাস করে না। তবে কোন সাধু সন্ন্যাসী আসিলে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। কারণ সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। এই অনাদিলিঙ্গ গুপ্তেশ্বরের একজন পূজক আছেন, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। মহাদেবের নিত্য পূজা আর সাধু সন্ন্যাসীর খবর লওয়াই তাঁহার কাজ।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম,লোকটী অতি নিষ্ঠাবান, অতি সরল হৃদয়। তিনি বলিলেন—"রাণী দুর্গাবতী একদিন স্বপ্নাদেশ পান—"তোর ইষ্টদেবতা আমি, অনাদৃত ভাবে পড়িয়া আছি। শীঘ্রই আমার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দে।"

এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাণী বড়ই বিচলিতা হইয়া পড়েন। তিনি এই অনাদি লিঙ্গের সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠান। বহু অনুসন্ধানের পর জঙ্গলমধ্যে এই গুপ্তেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।

পুরোহিত ঠাকুর আরও বলিলেন—"রাণী পর্ব্বত-গহ্বর হইতে এই লিঙ্গমূর্ত্তিটী উঠাইয়া লইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও তাহা স্থানভ্রষ্ট হইল না। পাঁচ সাত হাত খননের পর দেখা গেল তখনও জমীর মধ্যে পাথরখানি অটলভাবে গাড়িয়া আছে। সুতরাং এ চেষ্টার বিরাম এইখানেই হইল।"

এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, চার পাঁচ পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা এই দেবমন্দিরের পূজকগিরি করিতেছেন। গুপ্তেশ্বরের সেবার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি আর কয়েকটী আম্র-কানন সমর্পিত আছে। এই পূজক ব্রাহ্মণ তাহাতেই অনাদিদেবের নিত্যসেবা চালাইয়া থাকেন।

মন্দিরের বাহিরে দুইটী কূপ আছে। এই কূপ দুইটীর নাম গঙ্গা-যমুনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কূপটী গঙ্গা বলিয়া খ্যাত—তাহার জল দুধের মত সাদা। দুই চারি গণ্ডুষ পান করিয়া বুঝিলাম অতি সুমিষ্ট, অতি স্নিগ্ধ। যমুনাকূপের জল—মিশ কালো খাইতে গঙ্গাকূপের জলের মত নয়

আগামীবারে গৌরীঘাটের কথা পাঠকবর্গকে বলিব। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা জব্বলপুর ভ্রমণে যাইবেন—তাঁহারা যেন

একবার এই অনাদিলিঙ্গ গুপ্তেশ্বরকে দেখিয়া আসেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ত্যাগ ও ভোগ।

মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে হইলে ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এ কথা হিন্দুশাস্ত্র পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছে। যদি পাশ্চাত্য মতে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ডারউইনের কথায় আমাদিগকে বলিতে হয় যে, মনুষ্যের মনুষ্যাকার প্রাপ্তিও এই ত্যাগ-ধর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। যাঁহারা ডারউইনের মতের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা এই কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্য সর্ব্বদাই ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে. পরম পিতা পরমেশ্বর তাহাকে যে মন দিয়াছেন, তাহা তাহাকে উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু ত্যাগ-স্বীকার ভিন্ন এ উন্নতি সম্ভবপর নহে।

ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা মনুষ্য বিপুল মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া ও মানসিক বল সঞ্চয় করতঃ দেবতার আসনও টলাইতে পারেন। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। সর্ব্বস্বত্যাগী, সংযমী, পুণ্যাত্মা ঋষিগণ যখনই কঠোর তপস্যায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তখনই ইন্দ্রদেবের মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে. ঐকান্তিক অনুশীলনের দ্বারা মানস রাজ্যে যে অদ্ভুত শক্তিলাভ করা যায়, তাহা আজকাল পাশ্চাত্য-দর্শনকেও ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে।

আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি—তাহা আমাদিগকে অহরহঃ ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; সেই প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নীরোধ, ভোগ-বাসনা ত্যাগের নামই সংযম। যাঁহার মনে এই সংযমের উজ্জ্বল বহ্নি জ্বলিতে থাকে, তাহার নিকট ইন্দ্রিয়-বাসনা সমস্ত ছারখার হইয়া যায়। তিনি ক্রমে ক্রমে মানবত্বের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকেন। আর যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ভোগের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া আপন-হারা হইয়া যান, তিনি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যত্বের নিম্ন স্তরে নামিতে নামিতে পশুত্বের সীমায় আসিয়া উপনীত হ'ন, তখন তিনি মনুষ্যাকারে পশু হইয়া পড়েন; আহার, বিহার, মৈথুন প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে পশুর আমোদ, ঠিক সেই সকল বিষয়ে তাহারও আমোদ হইয়া থাকে। তাই বলি ত্যাগে স্বর্গ, ভোগে নরক; ত্যাগে দেবত্ব, ভোগে পশুত্ব; ত্যাগ কার্য্য, ভোগ ত্যাজ্য। ত্যাগ ও ভোগের যথাক্রমে সারবত্তা ও অসারতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে। নিম্নে কয়েকটী দেওয়া যাইতেছে:—

"ইন্দ্রিয়াণাং নীরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসায় চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥"—

মনু ৬।৬০

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, রাগ দ্বেষাদির ক্ষয় ও প্রাণিমাত্রের অহিংসা দ্বারা মনুষ্য অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হয়।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

মনু ২ | ৯৪

অর্থাৎ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥

মনু ২ | ৯৯

সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয় দূষিত হয়, তদ্দ্বারা লোকের প্রজ্ঞাক্ষয় হয়। যেমন কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলেই তদ্দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়।

"রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টং
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়ণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥"

মহাভারত; বনপর্ব্ব ২১০ | ২৩

অর্থাৎ পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্বযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ পরমসুখে সন্তরণ করে।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

ভীষ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ যদি মন স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

"অর্থানামীশ্বরোঃ যঃ স্যাদিন্দ্রিয়ণামনীশ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়ণামনৈশ্বর্য্যাদৈশ্বর্য্যাদ্ ভ্রশ্যতে হি সঃ॥"

উদ্যোগপর্ব্ব ৩৩ | ১১৫৭

অর্থাৎ যিনি অর্থের অধীশ্বর, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর নহেন বলিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে চ্যুত হয়েন।

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈবকুর্ব্বন কারয়ন্॥"

গীতা—৫।১৩।

বশীভূতেন্দ্রিয় অনাসক্ত পুরুষ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করেন, আত্মা নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ-মন্দিরে বিরাজিত থাকিয়া কি স্বয়ং কিংবা অন্য দ্বারা কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না।

এইরূপ ত্যাগ ও ভোগ সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ আমরা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হই। ইহা ব্যতীত ত্যাগের যে সকল দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আজিও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কি কঠোর ত্যাগবলে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সাদরে বনবাস ক্লেশকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন, কি কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া পতিপ্রাণা সতী সীতাদেবী স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন, আর কি মহান্ সংযমের বলে বলীয়ান্ হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কখনও ভুলিতে পারিবে?

শ্রীরামচন্দ্র দেবতা, সীতা দেবী আর লক্ষ্মণও দেবতার আসন পাইয়া আসিতেছেন। এখনও শত শত নরনারী উঁহাদিগকে দেবদেবী জ্ঞানে উঁহাদের মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। আর ভরত, শত্রুঘ্ন—কৈ, তাঁহাদের মূর্ত্তি কেহ বড় একটা পূজা করে না? আমি বলি, রাম, লক্ষ্মণ সীতা দেবতার আসন পাইয়া আসিয়াছেন—ত্যাগের বলে, সংযমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে; আর ভরত, শত্রুঘ্ন—সে সম্মানটুকু হারাইয়াছেন, কেবলমাত্র ভোগের আবর্ত্তে পড়িয়া।

তার পর মহাভারতের কথা ধরুন। পাণ্ডবগণ যেরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছিলেন, কৌরবগণ সেরূপ পারিয়াছিলেন কি? তাই পাণ্ডবগণের কাহিনী এখন পর্য্যন্ত লোকের মন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাই তাঁহারা দেবতা, আবার তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ সংযমী যুধিষ্ঠির সকলের অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। কিন্তু ভোগপরায়ণ কৌরবগণের নাম করিলে লোকের মনে স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামানুজ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই ত্যাগ-ধর্ম্মের—এইরূপ সংযমের এক একটী অনন্ত দৃষ্টান্ত বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-লালসাকে পদদলিত করিয়া, স্বার্থের মোহন মন্ত্রে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া, ভোগের শত শত লোভনীয় পদার্থকে দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহারা মহাপুরুষ নামে আখ্যাত হইয়া শত শত লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। যদি তাঁহারা এইরূপ ত্যাগ-ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিয়া ভোগের একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়-বাসনা চরিতার্থ করিয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগকে পূজা করিত, কে তাঁহাদের জন্য অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রত্ন-সিংহাসন পাতিয়া রাখিত? কোন অতীতের কোলে তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া যাইত; তাই বলি, ত্যাগে স্বর্গ, ত্যাগে অমৃত, ত্যাগে অমরত্ব; আর ভোগে ঠিক তাহার বিপরীত।

ব্যষ্টিতে ত্যাগের যে মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়া থাকে, সমষ্টিতেও সেইরূপ। কথাটা একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলি। যে জাতি বা যে সমাজ যত ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিক্ষা করিয়াছে, যত বিলাস-বিমুখ হইতে—আত্ম-সংযম করিতে শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতি বা সে সমাজ জগতে তত উন্নতি করিতে, তত সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের ব্রাহ্মণ-জাতি এই ত্যাগ-ধর্ম্মের জন্য আজিও হিন্দুর নিকট পূজনীয়, আজিও শত শত হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট নতশির। ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে, তাহা সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ নিজের জন্য রাখিলেন কি?—রাখিলেন বেদাধ্যয়ন, রাখিলেন শাস্ত্রানুশীলন, রাখিলেন জপ, তপ, আর কঠিন তপস্যা। ইহা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সম্পদ্ অন্যান্য তিনটী বর্ণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এমন একদিন

ছিল, যখন ত্যাগের এই মহান আদর্শ সমগ্র ভারতকে—শুধু ভারতকেই বা বলি কেন—এই বিশাল ভূমণ্ডলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়া গিয়াছেন,—

"ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড়-দরশন,
ভারতের বেদ ভারতের কথা
ভারতের বিধি ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয, য়ুনানী-মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।"

এখন সে ব্রাহ্মণ নাই, সে বর্ণবিভাগ নাই, সে কঠোর তপস্যা নাই, কিন্তু নাই বলিয়া কি ভারত সে অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগের মহিমা এখনও ভুলিতে পারিয়াছে, এখনও সে পুরাস্মৃতি শত শত লোকের মাথা নোয়াইয়া থাকে। ত্যাগের এমনই মোহিনী শক্তি যে, শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কত ঘাত-প্রতিঘাত আসিয়া সমাজের উপর কত বিপ্লব ঘটাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আদর্শের স্মৃতি ভারত-গাত্র হইতে কিছুতেই মুছিয়া যায় নাই। ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ এই ব্রাহ্মণগণের যে সকল হতভাগ্য বংশধর ভোগের আবর্ত্তে পড়িয়া আজকাল হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে আত্ম-সম্মান নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে ত্যাগের সহিত ভোগের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু কোন কোন দার্শনিকের মত অনুশীলন করিলে বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের দার্শনিকদের মধ্যেও ভোগের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে চার্ব্বাকের নাম শুনিয়াছেন, তিনি একজন পরম ঋষি ছিলেন, কিন্তু তাহার ন্যায় ভোগের উপাসক হিন্দু ঋষিগণের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সুললিত কবিতায় চার্ব্বাকের কতকগুলি মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাহা কিছুকিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

ধর্ম্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচারে স্বর্গভোগ সেই ভোগ দেহ-যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু॥"

"ভেদ-জ্ঞান মহারোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়।
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয়॥"

"ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য॥"

পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যেও আমরা এইরূপ এক খাও দাও, স্ফুর্ত্তি উড়াও মতের পরিচয় পাইয়া থাকি। এপিকিউরিয়ান (Epicurean) মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন, Eat, drink and be merry এই সকল মতানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য

বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। তবে কি প্রবৃত্তি-মার্গের দিকে ধাবিত হওয়াই মানুষের শ্রেয়ঃ? আমাদের মনে হয়, এই সকল প্রবৃত্তি-মূলক মতেরও উদ্দেশ্য সংযম, বা নিবৃত্তি বা ত্যাগের দিকে মানবকে ক্রমশঃ টানিয়া লইয়া যাওয়া। প্রবৃত্তির একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, হিতাহিত বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যক নাই, ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে যেখানে লইয়া যাইতে চায়, সেইখানেই যাও, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা দিও না, অবশেষে তুমি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইবে, যখন ভোগে আর তোমার স্পৃহা থাকিবে না, তখন আবার স্রোত ফিরিয়া যাইবে, ঘাতের পর প্রতিঘাত হইতে থাকিবে, মন তখন স্বতঃই নিবৃত্তির দিকে ছুটিতে থাকিবে। এইজন্যই ইংরাজীতে একটী কথা আছে, Drink deep or taste not the Pierian stream. যদি ভোগ-বাসনা তোমার হৃদয়ে প্রবল থাকে, তাহা হইলে খুব বেশী রকম ভাবে ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, তাহা না হইলে এ পথে যাইও না। হয় প্রবৃত্তির উচ্চতম স্তরে উঠিতে হইবে, না হয় নিবৃত্তিমার্গ তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলে পরিশেষে কাম্যবস্তু লাভ হইবে। তাহা না করিয়া যদি তুমি ভোগ ও ত্যাগের সংমিশ্রণ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমার উন্নতি হইবে না তাহা হইলে মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে তুমি সমর্থ হইবে না। এইজন্যই উক্ত ইংরাজী প্রবচনের মধ্যে বলা হইয়াছে, taste not, অর্থাৎ পাপের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে না পার, তাহা হইলে ইহার আস্বাদন পর্য্যন্ত করিও না, নিবৃত্তি-মার্গই তোমার শ্রেয়ঃমার্গ। সুতরাং ভোগ-মতাবলম্বিগণও যে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, সে পথ দিয়া মনুষ্য আপনাকে পরিচালিত করিলে পরিশেষে ত্যাগের পথে গিয়া উপনীত হইবে। ভোগের পথ বড় সহজ পথ নয়, ইহাতে বিপদ অনেক। ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতে করিতে মানব যদি আপনাকে হারাইয়া বসে, যদি পাপের গভীর পঙ্ক হইতে উত্থিত হইবার শক্তি-সীমায় উপনীত হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার পশু-জীবন থাকিয়া যায়, অমরত্ব লাভ করা তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে না। আবার ত্যাগের পথেও মানবের বিপদ যে না আছে তাহা নয়। যে কখনও ভোগের মোহে মুগ্ধ হয় নাই, আজীবন ত্যাগের লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া জীবন কাটাইতেছে, সে যদি কখনও ভোগের মোহিনী শক্তির আবর্ত্তে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে আবর্ত্ত হইতে উত্তোলন করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য পুরাণে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অনেক আজন্ম সন্ন্যাসী কঠোর ব্রতাবলম্বী-ত্যাগী ঋষি ভোগের বস্তু সম্মুখে পাইয়া তাঁহাদের বিপুল সংযমলব্ধ তপস্যার ফল হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আকণ্ঠ পরিপূরিত ভোগের পর যদি হৃদয়ে ত্যাগের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা আর কখনও নির্ব্বাপিত হইবার নহে, তাহা মানবকে মোক্ষধামে লইয়া যাইবেই যাইবে।

কিন্তু ত্যাগের পর যদি ভোগ-বাসনার উদ্রেক হয়, তাহা মনুষ্যকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী করিয়া থাকে। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল এবং চন্দ্রশেখরের প্রতাপ এরূপ ভোগ ও ত্যাগের অদ্ভুত রহস্য প্রতিপাদন করিয়াছে। সুতরাং প্রাচ্য চার্ব্বাকের মত, কিংবা পাশ্চাত্য এপিকিউরিয়েন মত একেবারে কিছু নয় বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না; ইহার মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব এবং মানব-হৃদয়ের অতি গূহ্য রহস্য নিহিত আছে দেখিতে পাই।

সকল মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি (conscience) নিহিত আছে, তবে কাহারও ভিতর তাহা জাগ্রত, কাহারও ভিতর তাহা সুপ্ত। অতি বড় যে পাষণ্ড, নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, চৌর্য্য মিথ্যাপবাদ যাহার নিত্য সহচর, সেও পাপকার্য্য করিয়া এই বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা অন্তর্বিস্তর বিচলিত হইয়া থাকে; তাহার সুপ্ত বিবেক-বুদ্ধি প্রত্যেক পাপ কার্য্যের পর আবার জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে অনবরত ঘাত দিতে দিতে প্রতিঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়, সুপ্ত বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণ জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহা পরিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। নরহত্যাকারী ঘোর পাপী রত্নাকর এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা জগন্মান্য ঋষি বাল্মিকীতে পরিণত হইয়াছিলেন, ক্রোধান্ধ রূপ-সনাতন ভগবৎ প্রেমিক হইয়াছিলেন; চৈতন্যদেবকে নির্য্যাতন করিয়াপরম ভক্ত জগাই মাধাইও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, ঐশ্বর্য্যমদদৃপ্ত লালা বাবু "বাসনাতে আগুন দাও" এই কথা শুনিয়া ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া ত্যাগের পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, আজিও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অনেক বিপথগামী ভোগবিলাসী যুবক ভোগের ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া অবশেষে বিবেকবুদ্ধির তাড়নায় ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতেছে।

ত্যাগ ও ভোগে এইরূপ নিকট সম্পর্ক থাকিলেও ভোগ আমাদের কাম্য নহে, ত্যাগই কাম্য। ত্যাগের জন্যই ভোগকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। ভোগের আসনে ত্যাগকে বসাইতে পারিলেই মানবজন্মের সফলতা সম্পাদন করিতে পারা যায়। ত্যাগের আসনে কিন্তু আর ভোগকে বসান ঠিক নহে। যদি এপিকিউরিয়েন মত অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংযমবাদ (stoicismএ) পরিণত হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ভোগ লইয়া জীবন কাটাইলে চলিবে না, ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত হইতে না পারিলে মনুষ্যজীবনের সারসুখ অনুভব করিতে পারিবে না।

তাই বলি, ভোগে দুঃখ,—অনন্ত দুঃখ, ঘোর নরক, ভোগে পাপ, ভোগে পশুত্ব। আর ত্যাগে অপার আনন্দ, ত্যাগে অমৃত, ত্যাগে অমরত্ব, ত্যাগে অনন্ত স্বর্গ; ত্যাগে মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে পারে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল।

সহঃ সম্পাদক।

স্বাধীন দুহিতা।

(গল্প)

(ক)

মাষ্টার শশিভূষণ দরজার বাহির হইতে ডাকিল, "লবঙ্গ।"

লবঙ্গ দরজা খুলিয়া বলিল, "আসুন।"

মাষ্টার গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলের সম্মুখস্থ নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে ব'সলেন; লবঙ্গ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনমনে 'ডিক্সেনারির' পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ঘরটী ইংরাজী কায়দায় সাজান; মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধা অনেকগুলি বিদেশীয় ছবি সারি সারি দেওয়ালে লম্ববান। পাশে একটী বইভরা আলমারি। তাহা প্রায় ইংরাজী, বাঙ্গালা নভেলেই পূর্ণ।

এই কামরাটী খাস্ লবঙ্গলতার পড়িবার গৃহ ও বিশ্রাম ভবন। বাটীর একধারে অবস্থিত; কাজেই কেহ এদিকে বড় একটা আসে না। মাষ্টার নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রী লবঙ্গলতাকে পড়াইয়া আসেন।

চেয়ারে বসিয়াই মাষ্টার দেখিল টেবিলের নিকটস্থ বিছানার উপর "অনন্ত-মিলন" উপন্যাসখানি খোলা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিনও গৃহে প্রবেশ করিয়া এই বইখানি লবঙ্গলতাকে পড়িতে দেখিয়া মৃদু তিরস্কারের সহিত তাহা হইতে বিরত হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আজও আসিয়া বইখানা খোলা দেখিলন। মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া সে বহিটী হাতে করিয়া আনিলেন। যেখানে খোলা ছিল সেখানে একটা চিত্র ছিল। সেটার দিকে মাষ্টারের চক্ষু পড়িবামাত্র লবঙ্গলতা জোর করিয়া বহিটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। বাস্তবিক মাষ্টার ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। চতুরা ছাত্রী তাহা বুঝিয়া একটু অপ্রতিভের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া বেশ একটু বিরক্তির ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ লবঙ্গ, তোমাকে আমি কাল ও বইখানা প'ড়তে বারণ করে গেলাম, তবুও আজ তুমি ওটা পড়্‌ছিলে আমার কথা যে শুনবার দরকার করে না, তা না হয় তুমিই বুঝেছ—কিন্তু তবুও আমাকে দেখিয়ে তোমার ওখানা পড়া কতদূর সঙ্গত হচ্ছে, তা' যে তুমি বুঝতে পার না তা' নয়। তোমাকে যে আমি কত দিন থেকে বলছি, উপন্যাসের, বিশেষতঃ ও রকম উপন্যাসের শিক্ষাটা কত খারাপ!

ছিঃ—যাক্, যা অন্যায় তা' একবার বলে দিলেও কি বুঝতে পার না। ভারী ছেলেমানুষ তুমি!"

"ছেলেমানুষ" এ কথার উত্তরে মৃদুহাসির সহিত লবঙ্গ আরম্ভ করিল,—"মাষ্টার মশায়, উপন্যাস পড়লেই যে লোকে খারাপ হয়ে যায় এ কিন্তু আপনার ভারী অদ্ভুত ধারণা। আর একটা কথা হচ্ছে আমায় আপনি এত কচিখুকিটী ভাববেন না যে দুটো উপন্যাস পড়লেই আমার মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে—আর চাই কি আমি যার তার প্রেমে——"

বাধা দিয়া শশিভূষণ বলিলেন,—থাক, থাক, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। কচি খুকি নও—ভারী প্রবীণা তুমি। বাজে কথা যাক, আজকার কাজ আন।"

লবঙ্গলতা কোন কথা না বলিয়া একখানা খাতা ও "রয়েল রীডার নং ২" আনিয়া মাষ্টারের নিকট রাখিল "এই এক পাতা লিখা হ'য়েছে বুঝি ;—কি বিশ্রী লিখা। লিখার দিকে ত আদৌ মন নাই। দেখি পড়া কেমন তৈরি করেছ পাতা খোল।"

নির্দ্দিষ্ট পাতা খুলিয়া ছাত্রী শিক্ষকের হাতে দিল।

(খ)

বাঁকুড়া জেলার ময়নাগ্রামে বাবু শ্যামসুন্দর রায় সপরিবারে বাস করেন। শ্যামসুন্দর বাবু সুশিক্ষিত, প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার জমিদারীর মাসিক আয়ও বেশ। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন তখন ঘটনাচক্রে কোন ব্রাহ্মদুহিতার প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়েন এবং পরিশেষে স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর তিনি হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক আচার-ব্যবহার গুলির উপর হাড়ে চটা হইয়া গেলেন। তিনি বিশেষ পক্ষপাতী হইলেন স্ত্রীস্বাধীনতার।

বিবাহের দশ বৎসর পরে তিনি একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। এই কন্যাই তাঁহাদের দ্বিতীয় ও শেষ সন্তান। ইহারই নাম লবঙ্গলতা।

লবঙ্গলতার ১৩ বৎসর বয়সে হাওড়া জেলার বিখ্যাত ধনী ও প্রাচীন ব্রাহ্মপুত্র সুরেন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের সহিত বিবাহ হয়। সুরেন্দ্রমোহন তখন কলিকাতায় "সিটি" কলেজে বি-এ, পড়িতেছিলেন। বিবাহের কয়েক মাস পরে সুরেন্দ্র বি-এ পাশ করিলেন।

সুরেন্দ্রের পিতা রমাকান্ত বাবু শুধু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন সুতরাং ফল বাহির হইবার পর [illegible] দিনের মধ্যেই তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য পুত্রকে বিলাত পাঠাইলেন।

বিবাহের পর কয়েকদিন মাত্র একবার সুরেন্দ্র শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। সুরেন্দ্রের পিতা বড়ই কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুত্রকে বিলাত পাঠাই[illegible] বর্ত্তমান পড়াশুনা[illegible] জন্য তিনি তাহাকে 'ওদিকে[illegible]' আনিতে দিতেন না। সুরেন্দ্রও পিতাকে [illegible] ভয় করিত। এমন কি সুরেন্দ্র ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাইবার সময় ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও একবার লবঙ্গের সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারিলেন না।

বিলাত যাইয়াও সুরেন্দ্র শ্বেতাঙ্গিনী [illegible] মার্ব্বেলশুভ্র রূপ ও কুঞ্চিত সোনালী [illegible] বদ্ধ হইলেন না। লবঙ্গ সুন্দরী [illegible] প্রকৃতই লবঙ্গকে ভাল বাসিতেন [illegible] হইতে স্ত্রীকে ও শ্বশুরকে নিয়[illegible] পত্র লিখিতেন।

একবার সুরেন্দ্র লবঙ্গকে পত্রে ইংরাজী পড়িতে অনুরোধ করিয়া লিখেন। কথাটা ক্রমে মাতার কান হইতে পিতার কানে উঠিল। শ্যামসুন্দর বাবু এ কথার সারবত্তা বুঝিলেন। প্রকৃত পক্ষে ব্যারিষ্টার-জামাতার উপযুক্তা হইতে হইলে তাঁহার কন্যার ইংরাজী-শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা তিনি উত্তম রূপে বুঝিলেন।

পাড়াগাঁয়ে শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দূরের কথা শিক্ষক পাওয়াই কঠিন। তাহার উপর এরূপ সুদূরে সহর হইতে উপযুক্তা মহিলা কখনই অল্প বেতনে আসিতে চাহিবে না। এই সব নানা চিন্তার পর তিনি শশিভূষণকেই শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

শশিভূষণের পিতা হরিশ বসু বড়ই গরীব। মাসে ১২৲ টাকা বেতনে তিনি শ্যামসুন্দর বাবুর সেরেস্তায় গোমস্তাগিরি করিতেন। এই অল্প বেতন দ্বারা তিনি পুত্রকে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। আর খরচ যোগাইতে না পারিয়া পুত্রের পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য

হইলেন। যখন শ্যামসুন্দর বাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রকে ১৫৲ টাকা বেতনে লবঙ্গলতার শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চান, তখন বেচারী হরিশের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সানন্দে ও অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই হইতে শশিভূষণ প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে লবঙ্গলতাকে পড়াইতে আসিত।

দরিদ্রের সন্তান হইলেও শশিভূষণের চেহারা বেশ সুন্দর ছিল। গৌরবর্ণ একহারা শরীর, ও মাথার উপর কুঞ্চিত কেশগুলি তাহাকে বেশ মানাইত।

তাহার চরিত্রও বেশ সুন্দর। কখনও কুকথা মুখে আনিতেন না; কুসঙ্গে মিশিতেন না, কুপথে চলিতেন না। তাহার আর এক গুণ ছিল যে সে কুগ্রন্থের উপর হাড়ে চটা ছিলেন।

আর লবঙ্গলতা? তাহার চরিত্রও বেশ নির্ম্মল ছিল। এক্ষণে সে পূর্ণযৌবনা। কয়েক মাস শশিভূষণ তাহাকে পড়াইবার পর কি জানি তাহাকে লবঙ্গের চক্ষে কেন এত ভাল লাগিতে লাগিল। একবার এ কথাটা সে মনে মনে ভাবিত, আবার লজ্জায় নিজের মনে সে নিজেই মাটী হইয়া যাইত—না—না, তাহা কখনই হইতে পারে না; অসম্ভব একেবারে অসম্ভব। তবে তাঁহাকে মনে স্থান দেওয়া কেন? তাঁহার একবার জ্বর হওয়ায় কয়েক দিন তিনি আসিতে পারেন নাই, তাহাতেই বা লবঙ্গের এত ব্যাকুলতা কেন? এসব প্রশ্ন সুমতি তাহার মনে জাগাইয়া দিলেও কুমতি তাহার একটা না একটা উত্তর খাড়া করিয়া দিত।—'আহা, বেচারি নাকি বড় গরীব? তাহার উপর সহানুভূতি প্রকাশ করায় দোষ কি? ইত্যাদি—।' এইরূপে লবঙ্গ মনের ক্ষতগুলির আরোগ্যের উপায় না করিয়া সেগুলিকে চাপিয়া রাখিতে লাগিল।

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল লবঙ্গ ততই উন্মত্তা হইতে লাগিল। সে আর মনকে কোন রকমে স্থির রাখিতে পারে না। মাষ্টারকে একদিন না দেখিলে তাহার আর চলে না। সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না—এ সব কি হইতেছে।

(গ)

আরও কিছুদিন গত হইল। লবঙ্গ নাচার হইয়া নিজের মনের উপর আধিপত্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। একদম ছাড়িয়া দিয়া সে যেন অনেকটা ক্ষণিক শান্তি লাভ করিতেছে।

এইরূপে লবঙ্গ তাহার পাঠ্য "রয়েল রীডার" শেষ করিয়া ফেলিল। শশিভূষণ আবার তাহাকে নূতন বহি পড়াইতে সুরু করাইয়াছেন। পড়িবার সময় সে যেন কেমন কেমন ভাবে অজ্ঞান হইয়া মাষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিত।

শশিভূষণ কিন্তু তখনও অটল।

সেদিন তখন সন্ধ্যা। শরতের চাঁদ গগনে উঁকি মারিতেছে। চন্দ্র-কিরণ লবঙ্গের কক্ষের সম্মুখস্থ শেফালি গাছের উপর পড়িয়া সেটীকে রৌপ্য-কিরণ-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। লবঙ্গ দরজার সম্মুখে বসিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। এমন সময় বাহির হইতে শশিভূষণ ডাকিল,—"লবঙ্গ!"

"আসুন" বলিয়া লবঙ্গ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশিভূষণ বসিয়া Illustrated London Newsএর পাত উল্টাইতে লাগিল। সেখানা টেবিলের উপরই পড়িয়াছিল। লবঙ্গলতা যেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না, বলিল—"দেখুন দেখুন শরতের চাঁদের আলো কেমন গাছটার উপর পড়েছে। কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখুন?"

বহির পাতা হইতে মাথা না উঠাইয়াই সে সংক্ষেপে উত্তর দিল,—"হুঁ"।

লবঙ্গ এ উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আপনার কি কিছুই ভাল লাগে না? শরতের চাঁদ কেমন সুন্দর! সারা দুনিয়াটি প্রকৃতির নির্ম্মল বর্ষাস্নাত রূপে কেমন উথলে

উঠেছে, আর আপনি ও সব কি ছাই নিয়ে আছেন? এই শোভার ভিতর দিয়ে প্রেমের—"

"বই আন; আজ আমি বেশী দেরী করতে পার্ব্বো না।"

"আজ—আজ, আপনি যান্। আজ আমার শরীর বড় খারাপ, আজ পড়া থাক।"

"ওঃ, তা এতক্ষণ বল্লেই ত হ'ত। তবে আসি আমি আজ।" শশিভূষণ উঠিল।

তাহাকে যাইতে দেখিয়া লবঙ্গলতা বলিল,—"দেখুন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, বলবেন?"

"কি বলই না, অত হেঁয়ালির দরকার কি?"

"আপনার স্ত্রীর নাম কি? আমি তাঁকে একখানা বই উপহার দিব।"

"আমার বিবাহ হয় নাই। সে তখন দিও পরে, এত তাড়াতাড়ি কেন তার জন্য।"

"আচ্ছা নাই থাকুক, আপনার হবু-স্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই বইখানি আপনাকে দিলাম। আমার দিব্য এখানি আপনি নিন। ঘরে গিয়ে বরং একবার পড়ে দেখবেন।" এই বলিয়া লবঙ্গ কাগজে মোড়া একখানা পুস্তক শশিভূষণের হস্তে দিল। সে নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

* * *

শশিভূষণ আহারাদির পর রাত্রে নিজ নির্জ্জন কক্ষে গিয়া মোড়ক খুলিতেই—একখানা সুন্দর বাঁধানো বহি বাহির হইল। কি আশ্চর্য্য সেখানি "অনন্ত-মিলন।" এইখানিই লবঙ্গের আদরের বহি। তিনি ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বর্ত্তমান লবঙ্গের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছায় তিনি বইটার পাতা উল্টাইয়া চলিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একখানি চিত্রের নিকটে আসিয়া শশিভূষণ থামিয়া গেলেন। সেখানি মিলন-চিত্র। সেই চিত্রের নিম্নে "রমেশ ও সাবিত্রী" লিখিত ছিল। সেই মুদ্রিত অক্ষর গুলি কাটিয়া কে তাহার নিচে লাল কালীতে লিখিয়া দিয়াছে, "শশিভূষণ ও লবঙ্গলতা।" তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এত লবঙ্গের নিজ হস্তের লেখা। তার মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল! তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনো পড়াইতে যাওয়া দূরে থাক ওমুখো হইবে না।

তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা-পালনের পক্ষে শত বাধা উপস্থিত হইল। দুই দিন না যাইবার পরে দ্বারবান ডাকিতে আসিল। পিতা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অথচ তাঁহার মনের কথা বলিয়া কাহারো নিকট কৈফিয়ৎ দিবার উপায় নাই। কি বিপদ!

ফলে তৃতীয় দিন শশিভূষণকে আবার "পুনর্মূষিকো ভব" হইতে হইল।

(ঘ)

শশিভূষণের চরিত্রের তথাকথিত দৃঢ়তা থাকিলেও সে সম্পূর্ণ সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ। যৌবনকালে একেই ত ইন্দ্রিয় সকল প্রায়ই দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে, তাহার উপর আবার উত্তেজক দ্রব্য সংঘর্ষে আসিলে তাহাদিগকে দমন করা দেবতারও অসাধ্য হইয়া থাকে। তাঁহার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ ধারণ করিল। তিনি কয়েকবার লবঙ্গের শিক্ষকতা-কার্য্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সাংসারিক অভাব ও পিতার তিরস্কারের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কি যেন একটা আকর্ষণ-শক্তি তাঁহাকে লবঙ্গের দিকে টানিতে লাগিল।

তিনি প্রথম প্রথম লবঙ্গলতাকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কোমলতর চরিত্রের সংস্পর্শে তাহার চরিত্রও যেন কোমল হইতে লাগিল। ঘৃত অগ্নির মৃদু তেজে কতদিন ঠিক থাকিতে পারে? তিনি স্বপনেও ভাবেন নাই যে, যে লবঙ্গলতাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাহাকে এত বুঝাইতে হইতেছে—তিনি নিজেই শেষে তাহাতে মজিয়া পড়িবেন।

লবঙ্গ তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সে কেবল উপন্যাসেই তাহার জীবনের এতগুলা দীর্ঘ বর্ষ কাটাইয়াছে। কতকগুলা নভেলী প্রেমের ভাব তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বভাব-দুর্ব্বলা বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিগড়াইয়া দিয়াছিল। সে বর্ত্তমান সুখ-সাগরেই তাহার জীবন ভেলা ভাসাইয়া দিল। এখন বর্ত্তমানই তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আর ভবিষ্যৎ? এখন যে চিন্তায় তাহার আনন্দ,—যাহার ধ্যানে প্রাণ পুলকিত—সে চিন্তা, সে ধ্যান, ছাড়িয়া সে কোন্ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্ত্তমান সুখকে বিসর্জ্জন দিবে? কেই বা তাহাকে এ শিক্ষা, এ ত্যাগের মহিমা শিখাইযাছিল।

মানবচরিত্র যতদিন দৃঢ় ততদিন প্রস্তরের মত, কলুষিত হইলে তাহা জলের আকার ধারণ করে। সুতরাং নিম্নগামিনী লবঙ্গলতা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর পথে চলিতে লাগিল। যে মনকে সে নিজেই উন্মার্গগামী হইতে দিয়াছে, সে মন তাহার বাধা শুনিবে কেন?

বাধা দিবারও কেহ নাই—তাহাদের এ অবস্থায় কেহই বাধা দিবার নাই। শ্যামসুন্দর বাবু এগুলি বুঝিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। তাহার ধারণা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী-চরিত্র ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইতে থাকে; কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন না যে, অপাত্রে অকালে স্বাধীনতা প্রদানের কি বিষময় ফল! স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচার বা বেযাদবীর চূড়ান্ত নহে। স্থান-কাল-পাত্র ভাবিয়া স্বাধীনতার প্রয়োগই সুফলপ্রদ, অন্যথায় বিষের আকর।

এইরূপে তাহাদের পাপস্রোত অবাধ-গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল।

একদিন লবঙ্গলতা শশিভূষণকে বলিল,—"দূর ছাই! এরূপ গোপনে চোরের মত ত আর পারা যায় না; প্রাণের শশি! আমি ত তোমায় কতদিন থেকে বলছি, আজও মুক্তকণ্ঠে, এই নিশিথে, এই জ্যোৎস্না-পুলকিত আকাশ-তলে সমগ্র মানব-জগতের, সমগ্র সুন্দর প্রকৃতির অধীশ্বর জগদীশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি—তুমিই আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা, তুমিই আমার স্বামী! প্রাণের পবিত্র প্রেম প্রকাশের জন্য তবে কেন এ হীন গুপ্তভাব? কেন এ ঘৃণিত ছদ্ম? প্রাণের শশি, চল এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণের জ্বালা যুড়াই!" শশিভূষণ এ সব প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে বৃথা! লবঙ্গলতা যে তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়াছে, সাধ্য কি তাহাকে ছাড়িয়া পাশমুক্ত হয়।

* * * *

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন জমিদার-প্রাসাদে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লবঙ্গকে পাওয়া যাইতেছে না। আর জমিদার-গৃহিণীর ক্যাস বাক্স ভাঙ্গিয়া ৫০০০৲ টাকার নোট লইয়া কে চম্পট দিয়াছে!

অপরাহ্নে বজ্রাহত তরুর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণমুখে জমিদার শ্যামসুন্দর বাবু বসিয়াছিলেন। তারানাথ বাচস্পতি তাঁহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,—"ভায়া হে, আমরা মূর্খ মানুষ কি বুঝব বল। মেয়েকে ইংরিজি পড়াবার জন্য পুরুষ-শিক্ষক রাখবার দরকার কি? আমি মাঝে তোমাকে একবার এ কথা বলায় তুমি শুনলে না—বরং আমাদের অন্ধ ও কুসংস্কারপূর্ণ ধারণাকে অবজ্ঞা কত্তে লাগলে। আজ তাহার ফল দেখ।"

শ্যামসুন্দরবাবু ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"এ ব্যাপার আমি সহজে ছাড়ব নাকি! আমি কালই ওয়ারেণ্ট বার কচ্ছি!"

শ্রীমোহম্মদ খলিলর রহমান।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্।

একবিংশ বর্ষ।

১৩২৪।

কার্য্যালয়—

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড্, হাওড়া।

হাওড়া

৪নং তেলকলঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে

শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৪ সালের সূচীপত্র।

সমাপ্ত।